

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বক্তিক।

(২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)



শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা ১২

৪৮

মায়ের প্রার্থনা
মায়ের সন্তে কণা
আটের প্রকৃতি ও লক্ষ্য
কল্পনৌল গল্প
সত্যো আকোহণ
দিব্য-জীবন
শ্রীঅরবিন্দ ও মাহেশ্বের জংখমুক্তি
বিদ্রাঘতী (কবিতা)
সত্যো আবোধণ (চিত্র)

শ্রীমা

”

অনির্বাক
সোমনাথ মৈত্র
নিশিকান্ত
শ্রীমা

‘কল্পনৌল গল্প’টি (Conte Saphirin) যা লেখেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে,
ফরাসী দেশে—ভারতবর্ষে পদার্পণের আট বছর আগে।
গল্পটির মধ্যে বাক্য রয়েছে অধিমানস সৃষ্টির আদর্শ।

মূল্য—২২ টাকা

P30247

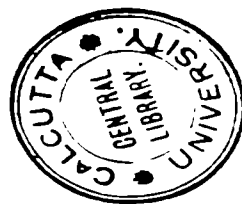
প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ রোয়াড়, কলিকাতা—১২।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পল্লিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বক্তিকণ

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৭)



শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা
প্রভা	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত
ভগবানে বিশ্রাম ৫৩য়া	শ্রীমা
যোগের প্রথম পাঠ	শ্রীঅরবিন্দ
উপনিষদের সাহিত্য-শ্রী	"
বয়স্কের বামনরাজ্য	শ্রীমা
মায়ের সঙ্গে কথা	"
দেবা-জীবন	অনির্বাণ

মূল্য—১২ টাকা

7-750



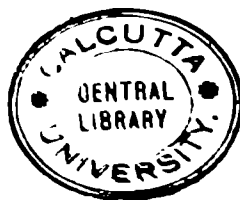
প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠশালার, ১৫ কলেজ রোয়ার, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পতিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বহিঃক।

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭)



7

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ কলেজ কোয়ার

কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা।	
ঝবি-দৃষ্টিতে মৃত্যু	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	
গল্প	শ্রীমা।	
মায়ের সঙ্গে কথা	"	
বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	৩৫
ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে কালিদাসের বিচার	"	৩৯
যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ	অনির্বাক	৪৫
আত্মার রসমত্তা (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	৫৪
প্রণাম (উৎসব-সঙ্গীত)	নিশিকান্ত	৫৫
অস্তরালে (কবিতা)	শ্রীরবি গুপ্ত	৫৬

মূল্য—২২ টাকা

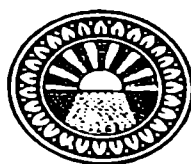
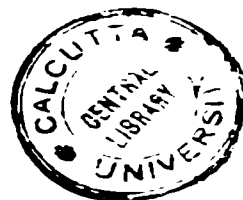
প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ রোয়াড়, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পতিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বক্তিকা

(২৪ নবেম্বর, ১৯৫৭)



1 /

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা ১২

১। মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা
২। জীবন-নাট্য	শ্রীমলিনীকান্ত ঙুপ্ত
৩। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
৪। ১৫ই আগষ্টের তাৎপর্য	"
৫। শিশুসঙ্গে শ্রীমা	"
৬। যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ	শ্রীঅনির্বাক

মূল্য—১২ টাকা

877-'57-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠশালার, ১৫ কলেজ রোড, কলিকাতা—১২
 শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, গুণ্ডিচেরী

1957

A Power greater than that of Evil
can alone win the victory. It is not
a crucified but a glorified body
that will save the world



১৯৫৭

অপশক্তির চেয়েও এক বৃহত্তর শক্তি শুধু এনে দিতে পারে বিজয়।
জগৎকে উদ্ধার করবে, যে-দেহ আত্মবলি দিয়েছে সে নয়, স্বমহিমায়
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সেই দেহ।

শ্রীমা





মায়ের প্রার্থনা

নাটক ৩, ১৯১৫। “কানোনার জাহাজে”

কঠোর নিঃসঙ্গতা... আর নিরন্তর তীব্র অনুভব যেন একটা অন্ধকারের নরকের মধ্যে আমাকে সোজা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জীবনে আর কোন মুহূর্তে, কোন অবস্থাতেই কখন বোধ হয় এমন আবেষ্টনের মধ্যে বাস আমি করি নি—আমার চেতনায় সত্য বলে জেনেছি যা-কিছু, আমার জীবনের সারভূত যা-কিছু তাদের এত সম্পূর্ণ বিপরীত। সময়ে-সময়ে সে অনুভব, সে বৈপরীত্য এত গাঢ় হয়ে ওঠে যে আমার অখণ্ড সমর্পণের মধ্যে একটা বিমাদের ছায়াপাত আমি বন্ধ করতে পারি না, আর অসুখ্যমানী প্রভুর সঙ্গে প্রশান্ত নীরব আলাপ মুহূর্তের জন্যে যে একটা প্রায় সানুযোগ আবাহনে পরিণত হয়ে যায়, তাও ধামিয়ে রাখতে পারি না।

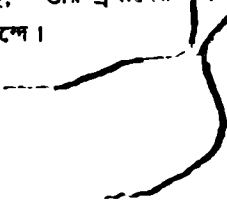
ভগবান, আমি কি করেছি যার জন্যে এমন আঁধার রাত্রির মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছ? কিন্তু তখনি আমার আশ্বাস খরতর হয়ে ওঠে...

সকল স্থলন থেকে এ আধারটিকে রক্ষা কর, ভগবান। তোমার কর্মের জন্যে—যাই হোক না তা—সে যেন হয়ে ওঠে অনুগত দৃষ্টিময় যন্ত্র।

বর্তমানে সে দৃষ্টি নাই—ভবিষ্যৎ এ রকম আবৃত হয়ে আর কখন ছিল না। মনে হয় চলেছি যেন একটা সমুদ্র অভেদ্য দেয়ালের দিকে। জাতি ও দেশের ভবিষ্যতের তুলনায় ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সংক্ষেপে যা-কিছু তা পরিকার দেখা যায় বটে, কিন্তু এ সব বিষয়ে কিছু বলা নিরর্থক—আগামী কানই তাকে সকলের চোখের সামনে, এমন কি একেবারে দৃষ্টিহীনের সম্মুখেও এনে ব্যস্ত করে ধরবে।

নাটক ৪, ১৯১৫

সেই একই কঠোর নিঃসঙ্গতা—তবে তা বেদনাকর নয়, বরং বিপরীত। তারই মধ্যে স্পষ্টতর প্রকাশ পেয়েছে সেই অসীম বিগত প্রেম যার মধ্যে সারা পৃথিবী ডুবে রয়েছে। এই প্রেমকে ধরেই ত সব-কিছু জীবিত ও জীবন্ত। তারই কল্যাণে গাঢ়তম অন্ধকারও হয়ে ওঠে স্বচ্ছ,—তার প্রবাহের পথ করে দেবার জন্যে,—আর তীব্রতম বেদনাও পরিণত হয় শক্তিময় আনন্দে।



গভীর সাগরের বুকে জাগ্রতের চাকার প্রতিটি আবর্তন আমাদের নিয়ে চলে যায় যেন আমার সত্যাকার নিয়তি থেকে দূরে, যে নিয়তি ভাগবত ইচ্ছানন্দে স্রষ্টৃতম প্রকাশ করবে তা থেকে সরিয়ে। প্রত্যেক প্রহর চলে যায় আর ভুবিয়ে দেয় যেন সেই অতীতের মধ্যে যা ছেড়ে ছিড়ে চলে এসেছি আমি—নিশ্চিত জ্ঞানি তবু, নবতর বৃহত্তর সিদ্ধির দিকেই আমার ডাক পড়েছে। আমার অন্তরায়ার জীবন বাহ্য কর্মাবলীর উপর অবাধ-শাসন স্থাপন করেছে, কিন্তু মনে হয় এর ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত যে-সব ব্যবস্থা তারই দিকে আমাদের পিছনে টেনে ধরতে চায় সব-কিছু। কিন্তু ব্যক্তিগত অবস্থা আমার বাহ্যতঃ যতই দুঃখের হোক না, চেতনা আমার এমন একটা লোকে স্থিরপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে সব দিক দিয়ে, সমগ্র আধার তাই শক্তির আনন্দের নিরন্তর অনুভূতি নাতে উন্নতিত।

আগামী কাল, স্থূল বাস্তব হিসাবে, অজ্ঞেয়, অভেদ্য; অতি কীণতম কোন আলো পর্যন্ত আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সমুখে ভগবানের নিদর্শন, ভগবানের সান্নিধ্য কিছুই ধরে দেখায় না। কিন্তু চেতনার গভীরে কি যেন অদৃশ্যের দিকে, পরম কোন সাক্ষী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বলছে তাকে “ভগবান, তুমি আমাদের গাঢ়তম অন্ধকারে ভুবিয়ে রাখছ—তার হেতু এই যে আমার মধ্যে তোমার জ্যোতি এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে এ অগ্নি-পরীক্ষা সে উত্তীর্ণ হবেই, তা তুমি জ্ঞান। তবে কি তুমি আমায় নির্বীচিত্ত করেছে তোমার নশাল-ধারী হয়ে এই নরকের ধূমপাকের মধ্যে নেনে যাবার জন্যে? তুমি বিবেচনা কর কি, হৃদয় আমার সমর্থ, কখন তা টনবে না, হাত আমার শক্ত, কখন তা কাঁপবে না? তবুও কিন্তু ব্যক্তিগত সত্যটি বোধ করে নিজে সে শক্তিহীন দুর্বল; তুমি যখন সান্নিধ্যে প্রকট থাক না, তখন সে নিজেকে নিঃস্ব বোধ করে—যারা তোমাকে জানে না, যারা তোমাকে হেলা করে, তাদের চেয়েও নিঃস্ব। একমাত্র তোমাকে ধরেই তার শক্তি তার সামর্থ্য। তবে যদি পুসী হয়ে তুমি তাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর, তা হলে তার পক্ষে কোন কিছু করাই কঠিন হবে না, কোন কর্তব্যই হবে না অতিমাত্রায় বৃহৎ বা ছোট। কিন্তু তুমি যদি সরে দাঁড়াও, তবে পড়ে থাকবে অসহায় শিশু এক, সে পারবে শুধু তোমার কোলের মধ্যে মিলিয়ে যেতে, ঘুমিয়ে পড়তে, এমন ঘুমে যেখানে নাই স্বপ্ন, নাই কোন-কিছু তুমি ছাড়া।”

মার্চ ৭, ১৯১৫

মনের মধুর নীরবতার দিন চলে গিয়েছে; কি শান্তিপূর্ণ, কি নির্ভল দিন সব। তার ভিতরে অনুভব হত সেই গভীর এষণা যখন তার সত্যের সব শক্তি নিয়ে আপনাকে সে প্রকাশ করত। কিন্তু এখন সে-এষণা আর দেখা দেয় না, কাজেই মন আবার

সক্রিয় হয়ে উঠেছে—বিশ্লেষণ করে, স্বপ্নখলিত করে, বিচার করে, গ্রহণ-বর্জন করে, আর যা-কিছু এই প্রসারিত ব্যক্তিত্বটির উপর এসে পড়ে তার স্পর্শে প্রতিনিয়ত সাজা দিয়ে চলে;—সে ব্যক্তিত্ব এত প্রসারিত যে এখন তার সংযোগ হয়েছে অতি বিপুল, জটিল, আলো-ঈশ্বরে নিশ্চিত—পৃথিবীর সব বস্তু যেমন তেমন জগতের সঙ্গে—মনে হয় এ যেন সব আধ্যাত্মিক স্বপ্ন-স্বস্তি থেকে নিব্বাসন; আর তোনার সব পরীক্ষার মধ্যে, ভগবান, এইটি হল সব চেয়ে ক্লেশকর। বিশেষভাবে, তোনার ইচ্ছাশক্তির প্রত্যাহার মনে হয় যেন তোনার পূর্ণ বিরাগের পরিচয়। প্রত্যাখ্যানের বোধ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই এখন বাহ্য-চেতনা এই যে নিঃসঙ্গ পড়ে আছে, তাকে দুঃখ এসে যাতে চিরকালের জন্য অভিভূত না করে বসে, সে জন্য দরকার হয়েছে অব্যাপ্ত বিখ্যাসের পূর্ণ উৎসাহ।...

কিন্তু হতাশ হতে চায় না সে, বিশ্বাস করে না এমন দুর্ভাগ্য কিছু হতে পারে যার প্রতি-কার নেই—আনত হয়ে সে অপেক্ষা করে, অনকো গোপনে প্রয়ত্ন করে, লড়াই করে চলেছে, আবার যাতে তোনার অখণ্ড আনন্দের প্রশাস তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে পূর্ণ করে তোলে। হয়ত বা তার প্রতিটি সামান্য প্রচেষ্টাই বিজয়ই পৃথিবীর পক্ষে সত্যাকার সহায় হয়েছে।

বাহ্য-চেতনা থেকে যদি নিষ্কাশিত হওয়া যেত চিরকালের জন্য, যদি দিবা চেতনার মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করা যেত...কিন্তু তা তুমি আনায় বারণ করেছ, সর্বদাই বারণ করছ। জগৎ থেকে পলায়ন নয়—মনিনতার, কদর্যতার তার শেষ অবধি স্বল্পে বহন করে চলতে হবে—ভগবানের সহায় থেকে বঞ্চিত হলেও দুঃখপাত না করে। রাত্রির কোনোর মধ্যে থাকতে হবে, চলতে হবে, দিক-যন্ত্র বিনা, আলো বিনা, আন্তর দিশারী বিনা।...

তোনার করুণা পর্যাপ্ত আমি ভিক্ষা করতে চাই না—কারণ, তুমি যা চাও আমার জন্যে, আমিও তাই চাই। আমার সামর্থ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এগিয়ে চলা, নিরন্তর এগিয়ে চলা, এক পায়ের পর আর এক পা দিয়ে—পথের ঈশ্বার যতই গাঢ় হোক, আর বাধাও যতই থাকুক। যাই ঘটুক না, ভগবান, তোনার নির্দেশ আমি বরণ করে নেব, ঐকান্তিক চিরস্থির প্রেমভরে। আর যদিই বা তুমি যন্ত্রটিকে অনুপযুক্ত বলে দেখে থাক, যন্ত্র ত আর তার নিজের নয়, সে তোমারই। তুমি তাকে নষ্ট করতে পার বা সন্মুক্ত করতে পার, কিন্তু সে ত আর তার নিজের জন্যে নাই, সে কিছু চায় না এবং পারেও না তুমি না থাকলে...

*

মার্চ ৮, ১৯১৫

নোটের উপর, একটা শান্তির, গভীর উদাসীনতার অবস্থা এখন—আধারের মধ্যে কোন অনুভব নাই, বাসনার বা বিরাগের, উৎসাহের বা অবসাদের, সুখের বা দুঃখের। জীবনকে সে দেখছে এটা দৃশ্যাবলির বত, সেখানে তার স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর।

সে দেখেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শক্তি সকলের সংঘর্ষ সব এক দিকে হল আধারেরই
অঙ্গ—সে-আধার তার সাময়িক ক্ষুদ্র-ব্যক্তিকে চার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে
—অন্য দিকে, তারা আবার এই ব্যক্তিকে থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ণ।

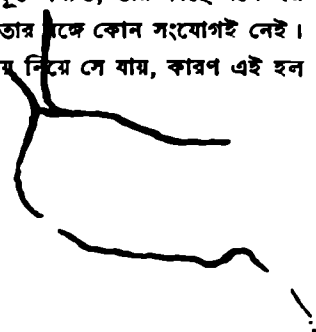
তবে সময়ে-সময়ে একটা বিপুল হাওয়া বয়ে যায় ; বেদনার, মর্মস্থদ নিঃসঙ্গতার, আধ্যা-
ত্মিক দৈন্যের হাওয়া—ভগবৎ-পরিত্যক্ত পৃথিবীর যেন এ আকুল আহ্বান। এ বেদনা
নীরব, ততই দিক মর্মস্থদ তাই, আনত অবিস্রোহী—সে বেদনার মধ্যে কোন ইচ্ছাই নাই
তাকে এড়িয়ে যেতে বা তা থেকে বের হয়ে যেতে, তার মধ্যে রয়েছে একটা অগ্নি মাধুর্য,
যাতে নিবিড়ভাবে নিশে আছে দুঃখ আর আনন্দ, এমন একটা জিনিষ, অগ্নি তার প্রসার,
মহান, গভীর—এত মহান, এত গভীর যে মানুষের ধারণার অতীত তা, এমন এক জিনিষ
যার গর্ভে রয়েছে ভবিষ্যতের বীজ।

নুনের, এপ্রিল ১৯, ১৯১৪

একটা অপরিহার্য প্রয়োজনের বলে আনাকে আবার অনুসন্ধিৎসা, আবার অন্তরাধার
সব প্রয়াসের এই সহচরটিকে আবার আবার হাতে তুলে গ্রহণ করতে হয়েছে।

বাহিরের সব অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, আবার যে আদর্শের স্বপ্ন ছিল স্থূল
কর্পারবলীর মধ্যে পর্যাপ্ত জীবন্ত হয়ে ওঠা, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। বাহ্য জড়ক্ষেত্রে
সিদ্ধির আনন্দ লাভ করবার সময় এখনো হয় নি। শারীর সত্তা আবার ভুবে গেল সেই মলিন
একাকার রাত্রির মধ্যে—তা থেকে মুক্তি আনি চেয়েছিলেন অকালে। গতাময় ভগবান,
তোমার ইচ্ছা সফল হল, সে রচনাকুশল মনকে এসে বলল : তুমি ধারণা করতে পার না
এই হল সত্তা, তবুও তাই ত হয়েছে। মন কিন্তু স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে নিল যে তার
তুলই হয়েছিল আর তোমার ইচ্ছা অনুসারে যা-কিছু ঘটে তাতেই পূর্ণ নতি স্বীকার করে নিল।
প্রাণসত্তাও সকল অবস্থাতেই স্থির ও তৃপ্ত। হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে একটা অশ্বোত্ত নির্মল শান্তি।
সমস্ত আধার তোমার বিধান, তোমার শাস্তি আলোকে পরিপূর্ণিত—তোমার প্রেমে অনু-
মৃত, অনুপ্রাণিত। তবুও বাহ্যঘটনা-ধারা যে একটা মিথ্যা, এ বোধ মুছে যায় নি ; আর
তার সমিচ্ছা সবেও শরীর এত গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে যে সে তার স্ব স্ব সামান্যতম
ফিরে আসতে পারছে না।

সত্তাটির সমস্ত পার্থিব জীবন, স্মরণ হতে আজ এই মুহূর্ত পর্যাপ্ত, তার কাছে মনে হয়
একটা অস্বাভাবিক স্বপ্নের নত, সে তা থেকে বহুদূরে যেন, যেন তার মধ্যে কোন সংযোগই নেই।
আর এই যে বাহ্যঘটনা তা ঠিক কলেরই নত, তাকে চালিয়ে নিয়ে সে যায়, কারণ এই হল



তার আস্তর সর্বস্বত্ব ইচ্ছা, কিন্তু এর উপর কোন আকর্ষণই নেই তার, বেশি আকর্ষণ বরং আশেপাশে অনুরূপ অন্য যন্ত্র সব যারা আছে তাদেরই উপর, কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রাপ্ত যন্ত্র, ভবিষ্য যন্ত্র, ভবিষ্য পৃথিবীতে উৎপন্ন হবে যে যন্ত্র তাদের উপর। তবু এই পৃথিবী তার কাছে পর হয়ে গিয়েছে; এক চিরন্তন নীরবতা ছাড়া আর কিছুই তার চেতনায় নাই তাই ত সব জীবন্ত রূপই তার কাছে মনে হয় দূরের প্রায় অবাস্তব জিনিষ। তার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয় কেউ কোন জিনিষ চাইতে পারে, কারণ জিনিষ বলে ত কিছু নাই—কিন্তু এক জিনিষ ছেড়ে আর এক জিনিষ পছন্দ করতে পারে—কারণ কিছুই ত আদৌ নাই। আবার এও দেখেছে, কোন কর্ত্ত করিতে অস্বীকারই বা যাবে কেন, সব কাজই যখন সমান অবাস্তব; সুতরাং জগৎ থেকে পলায়ন করবার প্রয়োজনও সে বোধ করে না—জগৎ বলে কিছু যখন নাই, তখন তা একটা ভারই বা হবে কেন, তার অস্তিত্ব এতখানি অনস্তি!

সব জিনিষটাকে মনে হয় একটা মহাশূন্য, হয়ত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আলোয় শান্তিতে, এমন এক বিশালতার যা সকল রূপ সকল লক্ষণ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ নাস্তি বটে, কিন্তু এমন নাস্তি যা বাস্তব, চিরকাল যা বর্ত্তে থাকতে পারে—কারণ তা আছে, যদিও তার মধ্যে রয়েছে নাই—এর চরম বিশালতা।...হায়, আনন্দের সামান্য কথা বলতে চেষ্টা করে সেই জিনিষ যা নীরবতাও প্রকাশ করতে অক্ষম।

অপটু বাক্য যে অবস্থাটি এইভাবে পরিস্ফুট করতে চায় তা কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হগে চলেছে—দিনের পর দিন যেমন যায়, সে অবস্থাও তেমনি হয়ে ওঠে আরো স্থির নিশ্চিত, আরো গভীর, বলা যেতে পারে আরো অব্যভিচারী। চায় নি, খোঁজে নি, কামনা করে নি তবুও আধার এই অবস্থার মধ্যে ক্রমে ডুবে গিয়েছে, নিজের চেতনা ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে, এক নির্ব্যক্তিক এমন চেতনার মধ্যে যা আর ব্যক্তিগত চেতনা নয়, যার অচল স্থিতি বাক্যাতীত, যার মধ্যে নিজেকে আর পৃথক করে পাওয়া যায় না।

মায়ের সঙ্গে কথা

প্রস্তোত্তর

প্রশ্ন : এই ভগংটা একবারেই অনাবিল আনন্দের রাজ্য হলো না কেন ?

উত্তর ভগবান ইচ্ছা করেই তাঁর সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর বিকাশ পাবার আদর্শে রচনা করেছেন, তা যদি তিনি না করতেন তাহ'লে প্রথম থেকে আমরা একটা অনড় অপরিবর্তনীয় একঘেয়ে বকম আনন্দের অবস্থাতেই থেকে যেতাম, তাঁর আর অদলবদল হতো না। কিন্তু একে ক্রম-বিকাশের ছন্দে ধাপে ধাপে ক্রমশ ফুটিয়ে তোলা চাই বলেই আপাতত এর পূর্ণ বিকাশকে আর ভগবানের সঙ্গে এর অভেদত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখতে হয়েছে,—সে-জিনিষ আর এ-জিনিষ যে একই এই পূর্ণ চেতনাকে ও তত্ত্বজনিত আনন্দকে আড়াল ক'রে রাখতে হয়েছে,—নতুবা ক্রমবিকাশের সূক্ষ্মতা নিলত না, প্রগতির সাফল্য কিছুই হতে পারত না।

একই অবস্থাতে স্থিতির ভাবেও ভগংকে গড়া যায়, সে এমন ভগং হবে যেখানে স্থানগত ও বিষয়গত হয়ে সবই থাকবে একসঙ্গে একভাবে, একটার পর একটা নতুন কিছু ফুটে ওঠার মতো অর্থাৎ সুনিদিষ্ট ছন্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে অভিযুক্ত হবার মতো কোনো কিছুই থাকবে না। তেমন ভগংতে সকল অবস্থাই হবে একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা ; কিন্তু তাতে এখনকার ভগংয়ের মতো কোনো বৈচিত্র্যই আমরা দেখতে পাবো না ; ক্রমে ক্রমে পাপড়ি নেনে ফুটে ওঠার মতো যে আশ্চর্য ব্যাপারটি আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই, সেই বিশেষ ক্রিয়াটি তাঁর থেকে একবারেই বাত হয়ে যাবে।

এই ক্রমবিকাশের আদর্শকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে যদি বলি যে ভগং ভগং মানেই ক্রমবিকাশের স্বল, এখানে সব-কিছুই ক্রমে ক্রমে খুলবে কিন্তু একবারেই সমস্তটা খুলে যাবে না, এমন কি আমাদের যে বোধোদয় তাও আসবে ক্রমশপ্রকাশ্য ভাবে,—তাহ'লে তাঁর থেকে এই কথাটাই বোঝা যায় যে এখনকার সমস্ত পরিণতিরও উত্তরোত্তর প্রগতি হতে থাকবে, অতীতে এখানে যতখানি পূর্ণতা এসেছে ভবিষ্যতে আবার তাঁর চেয়েও বেশী কিছু আসবে।

অতএব এখনকার ভগংতে সবারকম সম্ভাবনার রাস্তাই খোলা রইল।

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে বিশ্বভগংতে এককালে যাকে পরম স্মরণ, অনুপম, অত্যাশ্চর্য ও সুদীর্ঘ বলা চলত, এখনকার কালে তাকে আর তাই বলা চলে না।

আবার এখনকাল কালে যাকে পৰন স্থলৰ অভ্যাশৰ্চ্য ও হৃদিবা বলে নহে হচ্ছ, পৰবর্তী কালে তাও আর তাই নহে হবে না। এই ভাবেই দেখা যাবে যে এককালে যে সকল দেবতা সৰ্বশক্তিমান বলে প্রতিপত্তা হয়েছিলেন, পৰবর্তী কালের দেবতাদের কাছে তাঁরাও আর তেমন থাকবেন না, অপেক্ষাকৃত নগণ্য হয়ে যাবেন।

এর থেকেই বুঝে নিতে হবে যে আমাদের বিগ্ৰহগণ নিত্যস্থিতিস্থির জগৎ নয়, এ হলো এক নিত্য প্রগতিশীল জগৎ।

অতএব কেউ যদি পূৰ্ণের অবস্থাতেই গিয়ে পৌঁছয়, যদি তার চরম দিব্য লাভ হয়ে যায়, তাহ'লে এর ফলে তখনই তাকে এই বিগ্ৰহপ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। বুদ্ধ ও শব্দ প্রভৃতি মনীষীরা এ জিনিষটিকে এই ভাবেই বুঝেছিলেন। আপন আপন ধরনে তাঁরা এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে তুমি যদি চূড়ান্ত পূৰ্ণতার বা পূৰ্ণ দেবত্বের উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছতে পারো, তাহ'লে তাতেই তুমি অনভিব্যক্তির রাজ্যে বা নির্দাণের মধ্যে চলে গেলে।

আর অভিব্যক্ত জগতের মধ্যে যদি থাকতে চাও, তাহ'লে তোমাকে এগানকার এই ক্রমস্ফুরণধরী প্রগতির ব্যাপারটিকে যেনে নিতে হবে; তার কারণ জগৎ নানাই যা নিত্য গতিশীল। যদি তুমি সেই অচল অটল পূৰ্ণতার উপলব্ধি পেতে চাও তাহ'লে এই জগতের ক্ষেত্র থেকে তোমাকে সরে দাঁড়াতে হবে, কারণ তুমি এর মূল তথ্যই অনুগামী হইলে না।

এর মধ্যে কোনটি কান্য তা তোমার নিজেকেই বেছে নিতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বার বার এই কথাই বলেছিলেন “যখন তুমি অচল অনন্তের পূৰ্ণতাকে উপলব্ধি করতে চাও, তখন এষ্ট সোজা কথাটি ভুলে যাও যে তোমার যে-চেতনার দোলতে তুমি ও জিনিষ চাইছ সেই চেতনাকেও তুমি হারিয়ে ফেলবে।”

★

★

★

প্রশ্ন : ভগবানের কাজের বিরোধী এত বেশী শত্রু থাকে কেন ?

উত্তর : সজীব মানুষদের মধ্যে এত বেশী নিশ্চেতন মানুষ থাকে কেন ? ও প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নটাই আমার কাছে অধিক আশ্চর্যের। অচেতনার তরফের ক্রিয়ার হারাই এমন হয়ে থাকে; ভগবানের শত্রু হয়ে তাঁর কাজে বিরোধিতা করা মানেই অচেতনার কবলে পড়ে থাকা, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

★

★

★

প্রশ্ন : কিন্তু যে ভগবানের বৈরী সে প্রকৃতপক্ষে কিসের বৈরী ?

উত্তর : তা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে তার নিজেরই উপর। সাধারণত এই হয় যে তার নিজের মধ্যে ভগবান সহজে যে ধারণা লুকিয়ে রয়েছে তারই বিরুদ্ধে সে বৈরী হয়ে দাঁড়ায়।

সেইজন্যই এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে ভগবানকে যে-ব্যক্তি অস্বীকার করে বা অমর্যাদা করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভগবদ্বিগ্নাসী। কারণ সে যদি আপন অন্তরের গভীরে না জানতো যে ভগবান নিশ্চয়ই আছেন, তাহ'লে অনর্থক সে তাঁকে এমন বিশেষভাবে অস্বীকার করতে বা অমর্যাদা করতে যাবে কেন ?

ভারতের কিংবদন্তীতে আছে যে কোনো কোনো ভগবদ্ভক্ত পুত্র তাদাতাড়ি তাঁকে পাবার জন্য তাঁর সঙ্গে মিত্রতার বদলে শত্রুতা করতে চেয়েছে, কারণ সে জেনেছে যে আরাধনা করবার পথ না ধরে শত্রুতা করবার পথ ধরলেই তাঁকে অতি শীঘ্র কাছাকাছি পাওয়া যায়। এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র, এর থেকেই বোঝা যাবে যে—কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে কিছুমাত্র না ভাবে, অর্থাৎ ভগবান আছেন কি নেই তাই নিয়ে আদৌ কোনো মাথা না ঘামায়, সে থেকে যাবে তাঁর কাছ থেকে বিস্তর দূরে, কিন্তু কেউ যদি নাস্তিকতানে তাঁকে অস্বীকার করে কিংবা তাঁর নামে নিন্দার কথা বলে বেড়ায়, তাহ'লে সে আগবে ওর চেয়ে অনেক বেশী কাছে।

কেউ যদি এমন কথা বলে কিংবা লেখে “আমি বিশেষ বিচার ক'রে জোরের সঙ্গে বলছি যে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভগবানের কোনো অস্তিত্বই নেই, সে অস্তিত্ব মানুষের কল্পনার স্রষ্টি, —তাহ'লে তার থেকে এই কথাই প্রমাণ হবে যে এই প্রশ্নটি নিয়ে সে খুবই ভেবেছে, অর্থাৎ ভাবতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ তার ভিতরে ভিতরে এমন কিছু রয়েছে যার জন্য সে এ প্রশ্ন সহজে বিশেষ রকম কৌতুহলী। ভগবানের যে বৈরী কিংবা বিষেয়ী তার পক্ষে একথা আরো বেশী সত্য : তার কারণ নিতান্ত একটা অলীক ব্যাপারের বিরুদ্ধে কেউই কখনো শত্রুতা করবার হাঙ্গামা করতে যায় না।

মোট কথা শত্রুতাও হয়তো মিলনের একটা উপায়, সেই দিক দিয়ে ওর মাঝেও কিছু বিশেষত্ব রয়েছে ; অনেক সময় অন্যমনস্ক তৌনরা বলে ফেল “অনুক আনার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ শত্রু,” এটি নিতান্ত বাজে বলা না হতেও পারে। অবহেলার চেয়ে শত্রুতার মধ্যে অনেক বেশী নৈকট্য রয়েছে ; যাকে তুমি জানো না তার চেয়ে যাকে তুমি মানো না সে তোমার অনেক বেশী কাছে।

তাই বলে আমি তৌনাদের না-মানবার উপদেশ দিচ্ছি না ; এখানে শুধু এই কথাই বলতে চাইছি যে নিতান্ত অসাড় হয়ে থাকার চেয়ে রাগবিষেষের প্রকাশের মধ্যেও অনেকখানি প্রেমের লক্ষণ রয়েছে বলে জানবে। হয়তো সে প্রেম বিকৃত, বিসদৃশ, বিক্লপ এবং বিনুথ, কিন্তু তবু তার মধ্যে একটা আছে কিছু, একটা শিখা অনছে সেখানে।

বলতে গেলে, অচল অনড় নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও কিছু আছে, এমন কি একটা পাথরের চিবির সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা জড়তার মধ্যেও তুমি ঐ আলোকশিখার সন্ধান পেতে পারো, যাকে বলি ভগবৎসত্তার উপস্থিতির আলো। এ আলো তুমি সর্বত্র সব-কিছুর মধ্যেই

দেখতে পেতে পারো, আর তখন দেখবে যে তা এতটাই বৈচিত্র্যময় ও আশ্চর্য রকমে সঙ্গতি-পূর্ণ যে সেখানে তার অস্তিত্ব সর্বত্র সন্দেহের কোনো প্রশ্নই আসে না।

★

★

★

প্রশ্ন “যোগের পথে আলো” বইখানিতে এক জায়গায় রয়েছে “এই মুক্তি, এই পূর্ণতা ও পরিণতি যা কান্দা, তাও আমাদের নিজের জন্য নয়, তাও চাই ভগবানের জন্য” —এ কথার মানে কি?

উত্তর : এর মানে কোনো পরিণতিকেই তুমি তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক দিয়ে দেখবে না, সমস্তই চাই ভগবানের কাছে লাগবার জন্য, তার দ্বারা তাঁকেই যাতে অভিব্যক্ত করা যায়, যাতে ভগবানের সেবাতেই তা নিয়োজিত হতে পারে। তোমার নিজের লাভ হবে বলেই তুমি নিজেকে উন্নত ক’রে সুপরিণত ক’রে তুলছ তা মনে করা ঠিক নয়। তুমি যা কিছু চেষ্টা করছ তা ভগবানেরই কাজ অগ্রসর ক’রে দিতে, তাঁরই ইচ্ছাকে পূরণ করতে।

তোমার অস্তরের আত্মহার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত কামনার টান রয়েছে ও আনিষের ক্রিয়াগুলি নিশে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ভগবৎ-ইচ্ছার অভিনু বিকাশ নয়। এখানে তুমি আলাদা কিছু নও, ভগবানই হলো একমাত্র কথা; তাঁর ইচ্ছা, তাঁর অভিব্যক্তি, তাঁর ক্রমবিকাশ, এই নিয়েই সব কিছু। তুমিও সেই কারণেই, তুমিও তাই, সে ছাড়া তুমি অন্য কিছু নও। যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মধ্যে তোমার আনিষের ভাবটি লেগে রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ব্যক্তিভাবনা ওর মধ্যে উঁকি মারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জানবে যে তোমার যা হওয়া উচিত তা এখনও হতে পারো নি।

এমন কথা বলছি না যে একদিনেই তা হওয়া যায়, কিন্তু তাই হলো চূড়ান্ত সত্য।

আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কোনো একটা যোগের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই দেখবে যে কোনো কিছু ব্যক্তিগত কারণ থেকেই তারা এ পথে প্রবেশ করেছে : সে কারণ আছে নানাবিধ। হয়তো জীবনে তারা সুখী নয়, জীবনে তাদের বিতৃষ্ণা এসেছে, হয়তো তারা আরো বেশী জ্ঞানলাভ করতে চায়, আধ্যাত্মিক রাজ্যে বড়ো একজন হতে চায়, অন্যদের জ্ঞানদান করবার মতো ক্ষমতা চায়। যোগের পথ অবলম্বন করার পক্ষে এমনি সহস্র রকমের কারণ রয়েছে।

কিন্তু কেবল ভগবানেরই কাছে নিজেকে তাঁর হতে সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া, অর্থাৎ তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর যা খুশি তাই করিয়ে নিন, ঐ লক্ষ্যটি ধরেই আমি অবিচল ও বিশুদ্ধ হয়ে থাকবো —এ ভাব খুব কম লোকের মধ্যেই বেলে। অথচ এই হলো খাটি জিনিষ ; এই

মনোভাব থাকলে তুমি সরাসরি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, কোনোদিকে তুলস্বাস্তি হবার সম্ভাবনাই থাকবে না।

এ ছাড়া আর যাই উদ্দেশ্য থাকুক, তা অহংমিশ্রিত হবেই ; তার দ্বারা তুমি এদিক ওদিক অনেক ভ্রমণায় পৌঁছতে পারবে, কিন্তু আসল গন্তব্যো নয়। আর এই যে প্রত্যয়, যে আমার অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা, একমাত্র লক্ষ্য হলো ভগবানের কাছে চূড়ান্ত রকমে আত্মনিবেদিত হয়ে থাকা, যাতে তাঁতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ না রাখে, যাতে সম্পূর্ণ নিঃশেষে আমি তিনি হয়ে যাই, আমার ব্যক্তিগত কোনো প্রতিক্রিয়া সেখানে যেন আদৌ কোনো স্থান না পায়,—এই হলো সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মনোভাব। এই মনোভাবটি নিয়ে থাকলে তুমি জীবনের পথে এবং কর্মের পথেও সকল দিক বাঁচিয়ে অবাধে অগ্রগর হতে পারবে, সকল বিপত্তির হাত থেকে নিরুত্তি পেয়ে তুমি সোজা চলে যেতে পারবে, এমন কি যেখানে নিজেই নিজের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্রায় সেখানে তার হাত থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

বাস্তবপক্ষে তোমরা নিজেই নিজের সব চেয়ে নারাত্মক শত্রু, নিজের আশিষ ভাবটির চেয়ে প্রবল শত্রু আর কিছুই নেই।

★

★

★

প্রশ্ন আমরা না হয় ভগবানের অভিযান্ত্রিক যন্ত্ররূপ হয়েছি কিন্তু এই গঙগোলের পৃথিবীর মধ্যে নিজেকে তিনি অভিযান্ত্রিক করতে এত ইচ্ছুক কেন ?

উত্তর সেই কারণেই তো তিনি এই গঙগোলের পৃথিবী স্রজন করেছিলেন, এ ছাড়া তার অন্য কোনো কারণ নেই।

এই পৃথিবী তাঁর থেকে আলাদা কিছু নয়, তাঁর থেকে অন্যরকম কিছু নয়। এও স্বয়ং তিনি, কিন্তু এ হলো তাঁর বিকৃত রূপ, এই বিকৃতিকে শুধরে একে তাঁর সত্য রূপে ঝুটিয়ে তুলতে হবে, মূলে যা ছিল তাতেই আবার একে ফিরিয়ে নিতে হবে, অদিব্য জিনিষ থেকে একে দিব্য জিনিষে পরিণত হতে হবে।

★

★

★

প্রশ্ন কিন্তু তাহ'লে তিনি আমাদের থেকে এত তফাৎ কেন ?

উত্তর তফাৎ ? তিনি মোটেই তা নয়, বাছা। তোমরা তাই মনে কর বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, তিনি সর্বদাই রয়েছেন তোমাদের সন্তার ভিতরকার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। তিনি না থাকলে তোমরা মোটে থাকতেই না, এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যও তোমাদের অস্তিত্ব থাকত না। সে কথা অবশ্য তোমরা জানতে পারছ না, কারণ তোমরা রয়েছ স্বাস্থির নাগর মধ্যে ডুবে। নিজেকেই তোমরা ছানো না, যে বস্তুটিকে আমি বলে জান করতে থাকো সে বস্তুই তোমরা নও।

প্রশ্ন : তাহ'লে কী আমরা ?

উত্তর : ভগবান, তোমরাও ভগবান ।

কিন্তু এ কথা উপলব্ধি করতে হলে তোমাদের সত্য চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করা দরকার । তাতে হবে তোমাদের চেতনাটির এক আমূল পরিবর্তন-বিপ্লব, এক সম্পূর্ণ ওলট-পালটের ব্যাপার, যা নিকি সেকেন্ডের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে, আবার তা হবার জন্য অনেক বছর, এমন কি অনেক শতাব্দী, অনেক জন্ম-জন্মান্তরও লেগে যেতে পারে ।

যখন তোমার মধ্যে এই উপলব্ধিটি আসতে শুরু করবে যে এখন তুমি নিজেই যা জানো ঠিক তাই তুমি নও, আবার প্রকৃতই যে কোন বস্তু তা নিজেই তুমি জানো না, তখন এই ধরনের প্রশ্ন তোমার মনের মধ্যে জাগবে :

“তাহ'লে যাকে এতকাল আমার আমি বলে এসেছি সেটা কোন বস্তু ? যাকে বাস্তবরূপে আমি বলে ভাবছি তা যদি হয় ঋষি মরীচিকা, তাহ'লে আসল আমি কী ?”

এই অনন্ত প্রশ্নটিই উত্তরোত্তর তোমার মধ্যে প্রবল হয়ে ক্রমশ অতি তীব্র ও চরম হয়ে উঠবে । তখন সকল কিছুকেই তোমার আশ্চর্য ও অদ্ভুত বলে মনে হতে থাকবে, কোনোটিই যেন সত্য নয়, তোমার আনিদ্য ভাবনাটিও অতি অসম্ভব ।

“এই আমি তাহ'লে কোন জিনিষ ?”

অতঃপর এই চিন্তাই যখন একাগ্র হয়ে অতিনাশ্রয় প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন আসবে পরিবর্তনের সময়, ঐ ভাব চলতে চলতে হঠাৎ সেই পরিবর্তনটি এসে যাবে । তখন একটি মুহূর্তের মধ্যেই সব কিছু বদলে যাবে । অমনি তখন আসল সত্যটি তোমার জানা হয়ে যাবে, তুমি স্বয়ং দেখবে জানবে এবং বুঝবে যে তুমি যাকে নিতান্তই বাস্তব বলে জানতে তা কতই অসম্ভব ।

সেই পরিবর্তনের পরম মুহূর্তটি কবে আসবে তার জন্য হয়তো তোমাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এমন কি শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে । কিন্তু যদি তোমার আত্মহার বেগ বাড়িয়ে দাও, তাহ'লে ক্রমশ তার চাপ এত বেশী বেড়ে উঠবে আর ঐ প্রশ্নটির ব্যাকুলতা এত বেশী তীব্র হয়ে উঠবে, যে তারই ফলে একদিন একটা নতুন কিছু তোমার চেতনার মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করবে । বাইরে অবস্থান ক'রে ভিতরের দিকে চাওয়ার বদলে তুমি একেবারে ভিতরের দিকেই গিয়ে পড়বে, আর যেমনি নিজের অশ্রমহলে প্রবেশ করেছ অমনি দেখবে যে তোমার সব কিছুই সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে গেল । যে সব জিনিষকে মনে হতো সত্য, স্বাভাবিক, সহজ, সরল, নিঃসন্দেহে বাস্তব, সমস্তই তখন দেখবে যেন উদ্ভট, অদ্ভুত, অসম্ভব, একেবারে কিস্কৃতকিম্বদন্তি ।

তখন তুমি আসল গভাবন্ধর স্পর্শ পেয়ে গেছ, যা শাস্ত্রত সৌন্দর্যময় তারই দেখা পেয়ে গেছ, সে জিনিষ আর তোমার দৃষ্টি থেকে কখনই মুছবে না।

এই পরিবর্তন যখন এসে গেছে তার পরে আবার তুমি তোমার বাহ্য চেতনাতে ফিরে যেতে পারো, অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারিক সংস্পর্শ থেকে তাদের অন্ধ অজ্ঞানতার আওতার মধ্যে ঝানকটা নেমেও যেতে পারো। তবু তার ভিতরেও তোমার মাঝে ঐ জিনিষটি সদা-জাগ্রত হয়ে থাকবে—যে জিনিষ চিরজীবন্ত, যে শিখা চিরনিকম্প, যে চেতনা চিরজাগ্রত ; এবং তার পরে ঐ জিনিষই তোমার অন্তরের সর্বত্র তার শেখপ্রাপ্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে, আর তোমার এই অন্ধতা চিরদিনের জন্য হুচে যাবে।

আর এই যে অপূর্ব অনুভূতিটি তুমি লাভ করবে তা হবে একেবারে সুস্পষ্ট, একেবারে নিঃসন্দেহ, পুরোপুরি রকমে পাকাপোক্ত।

অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করে, “কেমন ক’রে আমি বুঝব যে আমার চৈতন্যস্তার নাগাল পেয়েছি ?” কিংবা, “কেমন ক’রে জানবো যে ভগবানের নাগাল পেয়েছি ?” কিন্তু ঐ অনুভূতি একবার যার এসে গেছে, সে তখন আর কোনো প্রশ্নই করে না। সকল প্রশ্নই তখন খেনে গেছে, যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে। কেমন ক’রে হলো সে প্রশ্নও আর নেই।

তার যা কিছু হবার ছিল তা হয়েই গেছে।

★

★

★

প্রশ্ন : এক এক সময় আমার মনে হয় যে এই বুঝি আমি সেই অপূর্ব অনুভূতি বর্ধার্থই পেয়ে গেলান, কিন্তু তার পরেই দেখি যে কে সেই, আবার আমার আগেকার মানুষী চেতনাতে ফিরে আসি। কেন এমন হয় ?

উত্তর : তার কারণ এখনও হয়তো তুমি নিজের মধ্যে দুটো ভাগ রেখে দিয়েছ। ওরই একটি ভাগ তোমার অগ্রগামী ভাগটিকে অনুসরণ করতে অসম্মত হচ্ছে, সে এখনও রয়েছে নিজেকেই আঁকড়ে, যেখানে রয়েছে সেখান থেকে একটুও নড়তে চায় না, যেমন ছিল তেমনই থাকতেই সে ইচ্ছুক। ঐ ভাগটাই তোমাকে বার বার নীচের দিকে নামিয়ে আনে।

তোমার ভিতরের ঐ অনিচ্ছুক অংশটি ধম্কে দাঁড়ায়, অথবা বিলম্ব করতে থাকে ; আর তুমি তখন তাকে তোমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে বাধ্য না ক’রে যেখানে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানেই তাকে ছেড়ে দাও। সে স্থলে তুমি নিজের চোখ বন্ধ করে থাকো, নিজেকে অন্ধ ক’রে দাও, আর ঐ দুর্বলতা, ঐ ক্রটি, ঐ দোষটুকু যে তোমার রয়ে গেছে তা দেখেও দেখতে চাও না। নিজের বধ্যকার দোষটুকু নিজের চোখে দেখতে তোমার বিপ্রী লাগে, তাই তাকে

তুমি যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে চাও। কিন্তু অমন ক'রে এড়িয়ে চলো বনেই সেটি আরো বেশী ক'রে টিকে থাকে, কিছুতে যেতে চায় না।

উটপাখির মতো ঐভাবে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে কোনো নাত নেই, একদিন তোমায় ওর মুখোমুখি হতেই হবে। নইলে যখন তুমি চরন কানোয়ার কাছে গিয়ে পৌঁছবে, তোমার ভিতরকার উৎকণ্ঠ অংশটি যখন তাকে প্রায় ছুঁই ছুঁই করতে থাকবে, তখন এই সব দুর্বলতার পিছানগুলি লেগে থাকলে কিছুতেই তুমি তাকে ছুঁতে পারবেনা।

তোমার সমস্ত ভ্রমিটুকু একদিন তোমায় সাফ ক'রে ফেলতেই হবে; নইলে এমন চক্রাকারে তুমি কেবল ঘুরপাক খেতেই থাকবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনি মহরগতিতে সানান্য একটু ক'রে এগিয়ে চলবে নাত্র, শেষে চলে যাবার সময় এসে পড়লে তখন বলতে বাধ্য হবে, “এবারে তো কিছু হলো না, আসচে বারে হবে।” যখন তুমি কিছু জানলে না, বুঝলে না, বোঝবার কোনো চেষ্টাও করলে না, সে হলো আলাদা কথা—এমন তো কত লোকের বেলাতেই হচ্ছে, তারা জন্নাচ্ছে, বেঁচে থাকছে, নাত্র যাচ্ছে, আবার জন্নাচ্ছে, আবার বাঁচছে, আবার মরছে, অনিদিষ্ট কাল ধরে তাদের এই ভাবেই চলছে, এ-সকল প্রশ্ন তাদের মনেই আসছে না। কিন্তু একবার যখন তুমি এর আশ্বাস পেয়ে গেছ, যখন জানতে পেরেছ যে জীবন বলতে যথার্থই কি ব্যাপার বোঝায়, যখন তুমি আপন অস্তিত্বের ভিতরকার কারণটি আবিষ্কার করতে পেরেছ আর তাকে সার্থক ক'রে তোলবার চেষ্টাতেও রত হয়েছ, তখন আর অমন গতি তোমার ভালোই লাগবে না, ওকে তোমার বিভীষিকা বনেই মনে হবে।

সব সময় সচেতন থেকে যথাসাধ্য নিজের কাজ সেরে নাও। প্রবাদে যে বলা হয়, “আজকের মধ্যে যা করা সম্ভব কালকের জন্যে তা ফেলে রেখো না, ও কথার প্রকৃত অর্থই হলো তাই। আজকে মানে তোমার এই বর্তমান জীবনের মধ্যে। এই জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, উপলব্ধ রয়েছে, আবার এমনি সুযোগ সুবিধা মিলতে হয়তো কত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। স্মরণ্য যতটা পারো নিজের কাজ গুছিয়ে নাও, তার জন্য যতখানিই বেগ পেতে হোক, কিন্তু বৃথা সময় একটুও নষ্ট করো না।

আর যখনই তুমি খোলা চোখে নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় পাবে, তোমার মধ্যে যে সব প্রতিবন্ধক রয়েছে তার থেকে নিজেকে যখনই ঢেকে রাখতে চাইবে, তখনই জানবে যে নিজের পথে তুমি নিজেই দেয়াল তুলে দিচ্ছ; এগিয়ে যেতে হলে ও-দেয়াল তোমাকে নিজের হাতেই ভাঙতে হবে।

নিজের কাজ নিয়ে এখনই লেগে যাও, সোজাসুজি চোখ চেয়ে গাননাসামনি হয়ে সব কিছুকেই ভালো করে দেখে নাও। যে বাড়িটা তোমাকে গিলতেই হবে তা খুব কটু বলে যেন তার উপর চিনি মাখাতে যেওনা। বস্তুত যত কিছু দুর্বলতা, যত কিছু কুংগিত ও কুটিলতা

তোমার নিজের মধ্যে রয়েছে তা সমস্তই কাঁট। আছেই তো এ সব কাঁট জিনিস, কিন্তু রয়েছে তোমার মধ্যে। প্রতি পদে, প্রতি মিনিটে তার দিকে তোমায় চোখ খুলে রাখতে হবে—আর তা যদি না করো, যদি নিজেকেই বন্ধন করে সেগুলিকে কাটিয়ে যেতে চাও, থাকে বলে “নিজের মনকে চোখ ঠাণ্ডা, তাই’লে নিজের সঙ্গে অমন বন্ধনই চিরদিন ধরে চলতে থাকবে।

তার পর যে কথা বলছিলাম, তুমি হয়তো এক উপলক্ষের মুখে এসে পৌঁছেছ, আলোটি প্রায় ঠোঁড়ের মুখে এসে তোমার জ্ঞানশীর্ণ আসন হয়ে উঠেছে, হঠাৎ দেখলে যে একটা কিছু তখন তোমাকে নীচের দিকে টেনে নামিয়ে দিলে। এমন অবস্থা ঘটলে অনেকে বিলাপ করতে বসে, মাথায় হাত দিয়ে বলে, “হায় রে আমার কপাল, আবার সেই জিনিসই হলো।”

ওগুলো নিতান্তই দুর্বলতার কথা। যা হয়েছে তা হয়েছে, তখন তোমায় আপনার মধ্যে খোঁজাখুঁজি চেয়ে দেখতে হবে, জোর করে স্পষ্টভাষায় বলতে হবে, “আমার নিজেরই মধ্যে কোথায় কোন কোণে লুকিয়ে আছে কোন হীনতা, কুটিলতা, ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা, দুঃবুদ্ধি, তাতেই এই পুরণো আগু পেরিয়ে নতুন আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যেতে আনাকে আটকাচ্ছে? কোন সে তুচ্ছ, হীন, বিকৃত এক উঁয়েনি অতি নারায়ক কনিকীটের নতো আমার পানক ফলটিকে ঢেকে রাখছে, যাতে তার সম্মান আমার না মেলে? কোন সে জুর প্রতিবন্ধক, তাকে যেমন করেই হোক আমার হৃদয়ে বের করা চাই।”

যদি তোমার ঐকান্তিকতা থাকে তাই’লে সেই প্রতিবন্ধকটিকে তুমি ঠিকই হৃদয়ে বের করবে, নিশ্চয়ই তাকে উৎপাটিত করে ফেলবে।

★

★

★

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “যোগের পথে আলো” বইখানিতে লিখেছেন “এই যোগের পথ অন্য সব যোগের চেয়ে অনেক দূরপ্রসারী এবং অনেক দৃষ্টি, তাই যদি তুমি চৈতন্যপুরুষের দিক থেকে নিশ্চিত আহ্বান পেয়ে না থাকো আর যদি এর শেষ সীমা পর্যন্ত যাবার মন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে না থাকো, তাই’লে এ পথে তোমার মোটে পা দেওয়াই উচিত নয়।” এমন কথা কেন?

উত্তর : তার কারণ আছে। তোমার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সদিচ্ছা থাকতে পারে, দিব্য উপলক্ষের দিকে তোমার জীবন উন্মুখ হতে পারে, তোমার মধ্যে আত্মনিবেদনের ভাবও থাকতে পারে, দিব্যকর্ম করতে তুমি অল্পবিস্তর উৎসুকও হতে পারো; কিন্তু তাতে আর এই যোগ করাতে খুবই তফাৎ।

শ্রীঅরবিন্দের এই যোগ করা মানে পূর্ণভাবে রূপান্তর হতে চাওয়া, তাতে তোমার জীবনে ঐ একটিনাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর কোনো কিছুই থাকা চলবে না।

যখন তুমি বলবে, “আমি যোগ করতে চাই,” তখন কেমন পথ তুমি নেড়ে নিচ্ছ সে কথা আগে ভালো ক’রে বুঝতে হবে। যারা আমার কাছে এসে বলে যে তারা এই যোগের পথে আসতে চায়, তাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত নিয়তি রয়েছে এমন দেখতে না পেনে আমি বলি, “আগে বেশ ক’রে ভেবে দেখ, যথার্থই এ পথে তুমি আসতে চাও কিনা, তোমার অস্তরের মধ্যে স্থির জেনেছ কিনা যে তুমি এই উদ্দেশ্য নিয়েই জগতে এসেছ; সে বিষয়ে আগে নিঃসন্দেহ হও।”

তার কারণ এ পথ সহজ নয়। এ পথে চলতে অনেক বেশী সময়ের দরকার, অনেক বেশী ধৈর্য থাকা দরকার, যথেষ্ট পরিশ্রমে সহ্যশক্তি আর অধ্যবসায় আর সংস্কার আর সংস্কার থাকা দরকার। যদি এই সকল গুণ তোমার মধ্যে আছে বলে জানা থাকে তবেই এ পথে পা বাড়ো। আর এ কথাটি জেনে রাখো যে এ পথে একবার পা দিলে তখন আর অব্যাহতি নেই, এ পথে ঢুকে আর কিস্ত ফেরা চলবে না, এর শেষ পর্যন্ত তোমাকে যেতেই হবে। অতএব কেমন পথে পা বাড়ানো সে কথা সম্পূর্ণরূপে জেনে নিয়ে তবেই এ বিষয়ে মনস্থ করা উচিত।

বেদিন থেকে তুমি এ পথে প্রবেশ করবে সেদিন থেকেই তোমার মধ্যে সব কিছু পাল্টে যেতে শুরু করবে। বাইরের অবস্থা অবশ্য আগেও যেমন ছিল অন্য সবাকার মতো তেমনই থাকবে, কিন্তু বিস্তর পার্থক্য এসে পড়বে ভিতরের দিকে দেখতে পাবে যে কোনো একটা চেতনা তোমার মধ্যে সর্বস্বকণ কাজ ক’রে চলেছে যাতে কোনো দিকে না বেকে তুমি কেবল সামনের সোজা পথ ধরেই চলতে থাকো, আর দেখবে যে তোমার অগ্রগতির পথে যা-কিছু বাধা কিংবা বিঘ্নরূপ হয়ে আছে সেগুলিকে সেই চেতনা অতি তীব্র আলোর মুখে তুলে ধরছে, তোমার নিজের মধ্যে যত কিছু অন্ধতা ও দুর্বলতা রয়েছে তারই দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খাইয়ে বার বার তোমার নাক ঠুকে দিচ্ছে। সেই সজাগ চেতনার মধ্যে এমন এক অবিবিশ্রাম একনিষ্ঠতা রয়েছে যা কোনোমতেই তোমাকে পথ ছেড়ে বিপথের দিকে যেতে দিতে রাজি হবে না।

অবশ্য যারা যোগের পথে চলা স্থির করেছে তাদের সব্বদেই এমন কথা। অন্যদের পক্ষে তা নয়। তাদের পক্ষেও সেই চেতনা আলো দেবে, জ্ঞান দেবে, নিরাপদ আশ্রয় দেবে, শক্তি দেবে, যার যেমন সামর্থ্য তা যাতে চূড়ান্তভাবে বিকাশ পেতে পারে তাও করবে, প্রত্যেকের উন্মুক্তি হওয়া সম্বন্ধে যতটা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে তাও দেবে, কিন্তু নিজেকে গন্তব্য ও পরিণাম সম্বন্ধে তাদের স্বাধীন ইচ্ছাই বজায় থাকবে, সে বিষয়ে কোনো বাধা বা নিয়ন্ত্রণের বাধাবান্ধি থাকবে না।

তোমরা আমার সব ছেলেমেয়েরা, তোমরা এখানে প্রচুর স্বাধীনতা পেয়ে থাকো।

বাইরের দিকে সামান্য কিছু নিয়ম নেনে চলতে হয় বটে, কারণ তোমরা অনেকগুলি এখানে জুটিয়ে অথচ ভাষা সংকীর্ণ, কাজেই এখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে কিছু কিছু আইন-কানুন মানতেই হয়। কিন্তু ভিতরের দিক দিয়ে তোমাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া আছে।

এখানে কোনো সামাজিক বা নৈতিক বা বুদ্ধিহিসাবী বাধ্যতা নেই, এমন কি কোনো নিষিদ্ধি বিধিও নেই আছে কেবল একটি আলো। তারই সাহায্য নিয়ে যদি লাভবান হতে চাও, তা তুমি অন্যায়সে হতে পারো যদি না চাও, তাও তোমার খুশি।

কিন্তু যেদিন তুমি যোগের পথ বেছে নেবে আর আন্তরিক ভাবেই তাকে বরণ করবে, যখন এ বিষয়ে প্রকৃতই মনস্তির ক'রে ফেলবে, তখন থেকে সব কিছুই হতে থাকবে আলাদা রকম দেখাবে যে সামনে রয়েছে ই আলো, আর ওর দিকে এগিয়ে যাবার তোমার পথটি—সবই স্পষ্ট আর সোজাসুজি। তখন সেদিক থেকে ফিরবার কোনো উপায় নেই।

যোগ মানে একটা ছেলেখেলা নয়; যখন এ পথ বেছে নিচ্ছ তখন কী করছ তা উদ্ভিন্নরূপে ভেবে নিয়েই করতে হবে। এ রাস্তা বেছে নিলে তখন এই নিয়েই লেগে থাকতে হবে। আর তখন ইতস্তত করা চলবে না, কেবল সোজা এগিয়ে চলা।

যারা যোগের পথ নেয়নি তাদের আমি বলি, যথাসাধ্য ভালো ভাবে নিজের কাজ করবে এই সংকল্প ক'রে নাও, উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করো, সাধারণ লোকেরা যেমন হয়ে থাকে তার থেকে নিজের জীবনকে আরো কিছু ভালো করার জন্য প্রয়াসী হও। এই আলোকদীপ্ত ও চেতনাদীপ্ত এমন সঙ্গতিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশের মধ্যে এসে সম্পূর্ণ শুভকামনার মধ্যে থেকে তোমরা মানুষ হচ্ছ; সে ক্ষেত্রে তোমাদের সেই মতোই উপযুক্ত হয়ে ওঠা উচিত আর এই সঙ্গতি ও শুভকামনা ও এখানকার এই আলোকধারাকে সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

কিন্তু বিশেষ ক'রে এই দুরূহ রূপান্তর যোগের সাধনা করা তোমার পক্ষে তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন স্পষ্ট বোধ করবে যে এই কাজের জন্যই তুমি পৃথিবীতে এসেছ—এ ছাড়া আর কোনো জিনিষ নিয়ে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব, তোমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো এই। এর জন্য যদি তোমাকে অনেক বেগ পেতে হয়, অনেক লড়াই হয়, অনেক কষ্টভোগ করতে হয়, তবে তা তোমার কাছে কিছুই নয়; তুমি চাও এই সাধনাতেই সিদ্ধি, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যোগের পথে চলতে গেলে তোমাকে বহুকঠিন সংকল্প নিয়ে থাকতে হবে, আর যেমন করেই হোক লক্ষ্য গিয়ে সরাসরি পৌঁছতে হবে।

★

★

★

প্রশ্ন : যদি কেউ এ পথে চলতে চলতে থেমে যায় কিংবা পেছিয়ে পড়ে—তাহ'লে তার বর্তমান জীবনের সমস্তটা কি সেখানেই থেমে রয়ে গেল ?

উত্তর : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ফল হবে, আর তা নির্ভর করবে কেমন প্রকৃতির পেছিয়ে যাওয়া তারই উপর। যদি তা গানান্যই পিছুহটা হয়, অল্প রকমের খেমে যাওয়া হয়, তাহ'লে তার আবার চলা শুরু হতে পারে, তবে সেই চলা আগের চেয়ে দশ গুণ কঠিন হবে।

প্রশ্ন : কেন তা হবে ?

উত্তর : কেন হবে ? কারণ ব্যাপারটা যে সেট রকমই হয়েছে, তুমি আপন শৈথিল্য আর দুর্বলতার দরুন নিজেরই মধ্যে পর্দাপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছ।

যত রকমের বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়ায় আর তোমাকে তা জয় করতে হয়, সবই হলো তোমার আধ্যাত্মিক পরীক্ষা, সে পরীক্ষায় তোমার উদ্বীর্ণ হওয়া চাই। তার মধ্যে একটা পরীক্ষায় যদি ফেল করো তাহ'লে তার পরের পরীক্ষাটি পাস করা তোমার পক্ষে বেশী কঠিন হবে। সাধারণত এই হলো গুহা নিয়ম, এর থেকে কারো রেহাই নেই।

এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে এখনকার কালে তোমাকে আগের থেকে কিছু জ্ঞানিয়ে দেওয়া হবে না, কাজেই প্রস্তুত না হওয়ার দরুন এ পরীক্ষায় পাস করা আরো কঠিন। আগেকার কালে আগের থেকে জ্ঞানিয়ে দেওয়া হতো, “এবার প্রস্তুত হও, তোমার কঠিন পরীক্ষা আগছে”। আগের থেকে জানা থাকলে কাজটা দশগুণ সহজ হয়ে যায়। যখন জানাই রইল যে এটি পরীক্ষা মাত্র, তখন তাতে উদ্বীর্ণ হওয়া এমন কিছু কঠিন হয় না।

কিন্তু এখনকার কালে গোটা জীবনটাই পরীক্ষা, প্রাত্যহিক ঘটনার ভিতর দিয়ে নিত্য পরীক্ষা পাস ক'রে চলতে হয়।

কেউ কেউ আপনা থেকেই জানতে পারে যে এবার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় এসেছে, তাই বিশেষ প্রচেষ্টায় লাগতে হবে। সেইভাবে প্রস্তুত হয়েই তারা চলে। তখন বেশী রকম শক্তি সঞ্চয় ক'রে তারা গাননের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

অপরপক্ষে তুমি যদি অজ্ঞান, অন্ধ, মুগ্ধ বা প্রতিকূল মন নিয়ে পরীক্ষার বেলাতে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ শুরু ক'লে দাও, তাহ'লে সে পরীক্ষায় তুমি অকৃতকার্য হলে। পরের বারে যখন আবার পরীক্ষা আসবে তখন যে কেবল তোমাকে ডবল বাধা ঠেঁকতে হবে তাই নয়, নিজের দোষে নিজের যতটা ক্ষতি করেছিলে তাও আগে গুধরে নিতে হবে, কাজেই তোমার পক্ষে কাজটা তখন অনেক বেশী কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বৈকি।

অতএব বরাবর যেমন ক'রে হোক চলাই দরকার, চলতে গিয়ে মাঝপথে বার বার খেমে পড়া উচিত নয়। কারণ কঠিন কাজ হলেও তার একটা ধারাবাহিকতা থাকলে অনেকটা তা সহজই হয়, কিন্তু একবার খেমে আবার নতুন ক'রে শুরু করা আরো কঠিন।

আত্মানুভূতির পথে যখন কোনো সন্ধিক্ষেপে এসে মত্ত কিছু বাধা পেরিয়ে যাবার দরকার হয়, তখন হাতে থাকে দুটি মাত্র উপায় হয় তুমি সাহস করে গোজা পা বাড়িয়ে দাও, তখন তাতেই একেবারে অনেকটা এগিয়ে যাবে; নয়তো সেখানে যদি ধমকে দাঁড়াও, তাহলে সেখানে যে কেবল ধেমাই রইলে কিংবা পেছিয়ে পড়লে তাই নয়; সেখান থেকে একেবারে গভীর ঋতের মধ্যে তোমার পতনও ঘটতে পারে, আর সে এমন নারাত্মক পতন যে তার থেকে আবার উঠে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। একটা জন্মই তখন বৃথা নষ্ট হলো।

কিন্তু সেই নারাত্মক অবস্থাতেও তোমার পতিত সত্তার মধ্যে এমন কিছু যদি টিকে থাকে যা অনির্বাণ শিখার মতো তখনও আছে, আর তুমি পতন হচ্ছেও সব রকম কষ্ট সহ্য করতে ও যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকো, তবুও যদি ঋতের নীচে থেকে আবার সত্য-সত্যি উপরে উঠতে চাও, তবে তাও সম্ভব হতে পারে—যদি তোমার সেই অনির্বাণ শিখাটি ভগবৎ-কৃপার সাহায্য প্রার্থনা করে। কৃপার জোরে কোনো-কিছু অসম্ভব থাকে না।

কিন্তু সেই শিখাটির প্রচুর জোর থাকা চাই, নতুবা ঋতের নীচে পড়ে আবার উপরের দিকে উঠে আসা নিতান্ত সহজ কাজ নয়।

এ পথ থেকে যদি একবার নেমে দাঁড়াও তবে আর একে খুঁজে পাওয়াও খুব কঠিন। আশ্চর্যের কথা এই যে একবার ছেড়ে দিলেই তা হারিয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে সকল দেশেই নানা রকমের কিংবদন্তী আছে, কবে কে কোথায় একবার পথভ্রষ্ট হয়েছিল তার পর সারা জীবন টুড়েও সে পথ খুঁজে পেলো না। তার কাছে তা মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পথটি যদি ধরে থাকো, কখনই তা ছেড়ো না। চলতে শুরু করার আগে যত বুশি ও যতকাল বুশি ইতস্তত করতে পারো। কিন্তু একবার পা বাড়ালে ও-সব একেবারে ধামিয়ে দেবে, চলা কিছুতেই ছাড়বে না কারণ তাতে যা ক্ষতি হবে তার জের অনেক জন্ম পর্যন্ত টেনে চলতে পারে। তাই বলছি, এটি খুবই গুরুতর ব্যাপার।

★

★

★

প্রশ্ন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা কেমন করে মিলিয়ে দেওয়া যায়?
উত্তর তার জন্য প্রথমত সেই ইচ্ছাটাই করা চাই। তার পর সে ইচ্ছাকে সর্বক্ষেত্রের জন্য জাগিয়ে রাখা চাই, যেন সর্বদাই সে ইচ্ছা লেগে থাকে, হাজার বিপত্তি এলেও তা অটন থাকে, যত কাল পর্যন্ত সে ইচ্ছা সকল না হয় ততকাল পর্যন্ত তার বিরাম না হয়।

এই হলো মোট কথা। তবে তার সঙ্গে আরো কিছু থাকা চাই, যেমন:

মনে অহংভাব রাখবে না,

মনের কোণে কোনো ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতা রাখবে না,

নিজের পছন্দ-অপছন্দকে ঠাই দেবে না,

কামনা বাগনা কিছু রাখবে না,

নিজের মনে কোনো রত্নমত গড়বে না, ইত্যাদি।

এ সব স্বদীর্ঘ প্রক্রিয়া, কারণ তোমার সাধারণ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে।

মনের সকল গণ্ডী ভাঙতে হবে, প্রাণের সকল কামনা ছাড়তে হবে, দেহের সকল চাহিদা ত্যাগ করতে হবে—তবেই তুমি ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।

তার পর যখন তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসবে তখন তার মধ্যেই তোমার স্থান হবে, অর্থাৎ তোমার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তখন তা একটিনাত্র ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে যাবে; এই ভাবেই তোমার ভগবৎ-ইচ্ছার সঙ্গে মিলন হতে পারে।

★

অতিমানসের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম তাই নিয়ে কিছু তুল ধারণা জন্মাচ্ছে।

জগতে মানুষের যখন প্রথম আবির্ভাব হয় তখনকার অবস্থার সঙ্গে এর তুলনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে মানুষ দেখা দিতে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে, তেমনি এই অতিমানস সম্প্রদায় দেখা দিতে অন্তত হাজার বছর লাগবে। তখন আমি এ কথা বলা প্রয়োজন মনে করিনি, যা শ্রীঅরবিন্দ লিখে গেছেন, যে এর মাঝখানে আগে উচ্চতর মানুষের আবির্ভাব হওয়া চাই, যাদের বর্তমান জন্তুভাবটি থাকবে না, তার পর তারাই হবে অতিমানব। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে তা এখনই সার্থক হওয়া সম্ভব, আর যারা ঐদিক দিয়ে সফল হতে পারবে তারা এতটাই অতিমানসই পেয়ে যাবে যে তাতে তাদের দেহেরও বাস্তব রূপান্তর ঘটবে। তার ফলে তারা জান্তব নিয়মের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে অনিদিষ্ট কালের জন্য প্রলব্ধিত করতেও পারবে।

এ কথা বলা বাহ্যিক যে অতিমানস-শক্তির অভিব্যক্তিতে এ সম্ভাবনা আরো বাস্তব এবং আরো জোবালো হবে। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগের শিক্ষাতে যে সব অনুশাসনের কথা বিশদভাবে বলে গেছেন তা আগে মনে চলা দরকার।★

আর্টের প্রকৃতি ও লক্ষ্য

সত্যকার আর্ট বা শিল্প হল স্থূল ভগতে সৌন্দর্যের প্রকাশ। একটা একান্ত ভগবৎ-মুখী ভগতে—অর্থাৎ যে-ভগৎ ভাগবত সত্যকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে ধরেছে সেখানে—আর্টের কাজই হল জীবনের পটভূমিকায় এই দিবা সৌন্দর্যকে প্রনূর্ত করে তোলা। অন্য কথায়, শিল্পীকে যুদ্ধ হতে হয় ভগবানের সঙ্গে, পেতে হয় অনুপ্রেরণার সেই অস্বাস্থ্যবোধটি যা বলে দেয় কোন রূপের আধারটি ধরে ভাগবত সৌন্দর্য বাস্তবে অবয়বী হয়ে উঠতে পারে। স্থূলের মধ্যে রূপকে প্রকাশ করে শিল্পী সেখান আবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর্ট তো শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টিই করে না, যে যথার্থ সৌন্দর্য যে গভীরতম সৌন্দর্য সকল ভাগবত সত্যের মূলে, তাকে চিনতেও শেখায়। এই হল আর্টের ধর্ম। তবে তার সঙ্গে প্রচলিত আর্টের পার্থক্য অনেকখানি।

নিবর্ডনের বেধা চলে বৃত্তাকারে উপরে উঠে কিন্তু তারই মধ্যে আছে আবার নিম্ন-মুখী অধিক বৃত্তাভাগ—এখানেই রয়েছে অবনতির বাঁহ। গত শতাব্দীর প্রত্যক্ষ থেকে মধ্যম পর্যন্ত আর্টের ছিল চরমতম অবনতির অবস্থা—সে-আর্ট অর্থকরী, অমাজিত, অর্থহীন, আপন যথার্থ প্রকৃতি ও ধর্ম থেকে বহু দূরে। তবে ভিতরে ভিতরে আর্টের আত্মাটি মৃত্যুঞ্জয়ী। তার এই আধুনিক নয়াক্রম এল একটা প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ফল হিসাবে, তার আকৃতিও তেমনি অপকৃপ! রুচির ব্যাপক অবনতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে সে ছাড়িয়ে গিয়েছে সব মাত্রা, প্রকৃতির সব আলোচনেরই যেমন ধারা। এক সময়ে সে চেয়েছে প্রকৃতির অঙ্ক অনুকরণ কিংবা তার ছায়া। তখনকার দিনে কটাক্ষ করে একে বলা হত 'ফটোগ্রাফী আর্ট'। আত্ম আর অবশ্য ও-কথা ব্যবহার করা চলে না, কারণ ফটোগ্রাফী এখন নির্মূল আর্টের পর্যায়ে উঠে গিয়েছে। আবার সত্যকার বাস্তববাস্তিতাও একে বলা যায় না, কারণ অত্যন্ত উচ্চ দরের চমৎকার বাস্তবিক চিত্রও আছে। প্রাচীনতর শিল্পটি ছিল যখন গতানুগতিক, কৃত্রিম, নিশ্চাপ তখন তার প্রতিফলন-স্বরূপ আলোকনতন এসে বলল, "স্থূল জীবন নিয়ে আর আমরা কারবার করি না, শাশ চোখে দেখা দৃশ্যও আর আমাদের উপজীব্য নয়। আমরা চাই প্রাণ-জীবনের 'ও মন-জীবনের চিত্র আঁকতে'। এই রকমে এসে পড়ল অসংখ্য সংস্কারক 'ও বিদ্রোহীরা—নান তাদের কিউবিষ্ট, স্যুরিয়ানিষ্ট, ফিউচারিষ্ট, ইত্যাদি। এরা চেয়েছে মগজ দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে। কিন্তু এই সরল সত্য কপাটা তারা ভুলে গিয়েছে যে শিল্পে প্রধান মাথা নয়, হৃদয়ে সৌন্দর্যের অনুভূতি। অথচ এই রকমেই আর্ট এসে পড়েছে বিধা, বিকৃতি ও বীভৎসতার মধ্যে। দুটি যুদ্ধের পরে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আরও গুরুতর। প্রত্যেক যুদ্ধ এনে দিয়েছে এক একটা পুণ্ডিতগুরুনয় গণিত পৃথিবী। বস্তুত আজ আমরা এক প্রলয়ের মাঝখানে।

হয়ত অবনতির বৃত্তাভাসটি ধরে শেষ সীমায় পৌঁছেছি এবার। এর পরই দেখব উত্তরণের পালা। স্বংস ঘোষণা করছে অভাবানেরই অপরিহার্য সূচনা। রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের চেয়ে, ফরাসীর দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কার অবস্থার চেয়ে—সে-সব যুগ সচল বাস্তববাদী নুর্তোগ্যের যুগ, স্বল্প-স্বল্প আর অনুচ্ছন্ন আঁিপোরে সাধারণতার যুগ—এই সঙ্কুল অবস্থা মনে হয় প্রেরণকর। আগে বলেছি, প্রগতির পথ উঠে চলে বৃত্তাভাসের বন্ধিন রেখা-ভঙ্গিতে। এক এক যুগে আসে পুরাতন জিনিসের উপর বিহ্বলতা, নূতন জিনিস আবিষ্কার ও তা নূতনভাবে প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে চতুর্দশ লুইয়ের যুগ—সে-যুগে এসেছিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির এক প্রবল প্রেরণা, শিল্পে ও জীবনে সে-যুগ এক ধরনের অনিশ্চয় সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরেছিল তার পরাকাষ্ঠায়। তারপর সামাজিক নিবর্তনের ধারায় দেখা দিল নূতন ভাব, নূতন নূতন প্রয়োজনের দাবি—সে ভাব ও দাবি অর্ধকরী যুগের। শিল্পের গতিও এখান থেকে চলে গেল অধোমুখে। অর্ধ আর শিল্পকলার এমনই অহি-নকুল সম্বন্ধ। শিল্পের সঙ্গে ব্যবসাকে মিশ্রিত করা অর্ধ একটা বিশেষ জিনিসকে সাধারণ করে তোলা—যা ছিল কতিপয়ের, শিকিতের, নাজিতব্রনের উপভোগ্য তাকে রাম-শ্যাম-যদু-বধুর ভোগ্য করে তোলা। বোধ হয় এই জন্যই, আর্টের কোনো মুক্তিপথ মিলন না বনেই সে ছুটল দিগ্বিদিকে—তাই তার আনাগোনা মনোজগৎ ও প্রাণজগতে, চেতনার অনিতে গলিতে। অবস্থার যখন উন্নতি হবে, যখন বিকিকিনি-প্রবৃত্তির বদলে পৃথিবীতে আর এক সৌন্দর্য্যময় সত্যের বোধ জাগবে, তখন আর্টেরও হবে পুনর্জন্ম, সে ফিরে পাবে তার স্বরূপ। তবে সে ভবিষ্যৎ এখনো মনে হয় বহু দূরে।

এই পতিত যুগের আর্টকে আমি বলি “মণরুম” আর্ট। তখনরা দেখনি কি রকমে জন্মায় ব্যাণ্ডের ছাতা? যা আবাদ করছে সেখানে আবাদ করছে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে কোথা থেকে গজিয়ে ওঠে এই ব্যাণ্ডের ছাতা। ভেবে দেখ ব্যাপারটা একবার। দেওয়ালটা একটু সঁাতসঁতে, আর অমনি সেখানে দেখা দিল অসংখ্য টুপি। একটা গাছ ছায়াছন্ন থাকে, তাই তার গোড়ায় ওঠে এই মণরুম। জন্মকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই—এমনই খেয়ালী প্রকাশ তার। ব্যাণ্ডের ছাতা না বলে বলতে পারতাম পরগাছা—দুটিই এক জাতের। গাছে জন্মায় তারা, সেখানে এঁটে থাকে। স্বকীয় প্রাণ ও জীবনযন্ত্র নেই তাদের, অন্য স্বাভাবিক গাছের মতো মাটি থেকে মোজাস্বজি তারা খাদ্য সংগ্রহ করে না—অন্যের প্রাণরস থেকে প্রাণ শোষণ করে বাঁচে। পরগাছা বা ব্যাণ্ডের ছাতার থাকবার কোনো যুক্তি নেই—তারা ঢুকে পড়েছে জোর করে, চুরি করে; বলতে গেলে, তারা এক-রকম অসঙ্গতিই।

প্রাচীন কালে, সে-সব গৌরবময় যুগে, গ্রীসে কিংবা ইটালির নবজন্মের (Italian

Renaissance) সময়ে বিশেষ করে গ্রীস ও নিশেরে গৃহ, স্তম্ভ ও ভাস্কর্যমূর্তি নির্মিত হত জনহিতার্থে। এসব গৃহ বলতে অবশ্য বোঝায় মন্দির, দেব-দেউল। তাদের ভাবে ও কল্পনায় ছিল একটা সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতা, অখণ্ডতা ও সৌন্দর্য। তাদের স্থায়ী স্থাপত্যের অসীম-প্রিয়ালী বৈশািবলীতেও ফুটে উঠেছে সেই কথাই। ভাস্কর্য ছিল এই স্থাপত্যের অনুঘটকী হয়ে—স্থাপত্যের মধ্যে ফাঁক বা কিছু বিশদ বর্ণনায় তা সে ভরে দিয়েছে। এমন কি, চিত্রকলাও এসে যোগ দিয়েছে এতে অখণ্ড সৌখটির আসল রূপ সব সুসঙ্গতভাবে নিলিয়ে। সেই গৃহ বা সৌখের জন্যই ভাস্কর্য, চিত্র। এককে অপরের থেকে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না, মনে হয় না কারো অস্তিত্ব ছুঁছাড়া অর্ধহীন। আর ভারতবর্ষে যে মন্দির নির্মিত হত তার লক্ষ্যও ছিল একটা পূর্ণস্রষ্ট—সব অঙ্গের ছিল এক উদ্দেশ্য—একান্ত পূজনীয় ভগবানের জন্য স্থলর আবাস নির্মান। তবে আধুনিককালে, গত শতাব্দির শেষার্ধ্বে আঁট হন ব্যবসার বস্তু—পণ্যপ্রবাহ। চিত্র আঁকা এখন বিক্রয়ের জন্য। আঁকা শেষে ছবিগুলি এখন সাজানো হয় সারি সারি কিম্বা এক ভায়গায়—বিশেষ চিন্তা না করে। ভাস্কর্য সম্বন্ধেও তাই। একটা মূর্তি খোদাই করে সেটাকে পারিপার্শ্বিকের বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাঙের ছাতা কিম্বা পরগাছার মতো তাকেও মনে হয় আশেপাশের সঙ্গে বেমানান, বিদেশী। শিল্প-বস্তুটি হয়ত তেমন অনুশলন নয়, তবে তা খাপছাড়া, চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে নিশে যায় নি। আজকাল আমরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি। তাকে প্রদর্শনী না বলে আত্মপ্রচার বলতে হয়—তার মধ্যে চাতুর্য, কৌশল, বাহাদুরির অংশই বেশি। আগের মতো একখণ্ড স্থাপত্যশিল্প আজ আর কোনো জীবন্ত শক্তিকে প্রযুক্ত করে ধরে না; তা আর প্রকাশ করে না আশুহা, কোনো-কিছু বা মানুষের অন্তরাষ্টাকে তুলে ধরে; কিম্বা যে-দেবতার আবাস বলে তা নির্মিত তার মহত্বকেও সে প্রকাশ করে না। আজকাল বাড়ীঘর নির্মিত হয় অসংলগ্নভাবে, এখানে ওখানে সেখানে—তার মধ্যে নেই কোনো সম্বন্ধের সূত্র, প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য। বাড়ীর ভিতরেও সেই একই অবস্থা। একখানি ছবি এখানে, একটা মূর্তি ওখানে, একটা ‘শিল্পবস্তু’ এক প্রান্তে, আর কয়েকখানি আবার অন্য এক প্রান্তে। একেই বলে প্রদর্শনী, বাড়ীঘর, সংক্ষিপ্ত সংগ্রহশালা। সত্যিকারের সুকৃষ্ট শিল্পরুচিকে সূচিকাবিদ্ধ করে এ-জিনিস।

আনি বলছি না বাড়ীঘর অনাবশ্যক কিম্বা অপকারী। শিক্ষার এ এক চমৎকার বাহন—অন্য যুগে অন্য কালের লোককীড়ির সঙ্গে পরিচয় হয় এর দৌলতে। এ আবার এনে দেয় জিনিসের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞান। তবে তা বলে শিল্পসম্বন্ধ একে বলতে পারি না। বাড়ীঘরে আঁটের পরন বা মহত্তম প্রকাশ নয়। এক ধরনের শিল্প অবশ্য আছে যা বিভিন্ন বিপরীতধর্মী জিনিস সব একত্র নিলিয়ে স্তম্ভময় করে ধরে। নাম তার সম্বন্ধীকরণ শিল্প।

এই দুদিনে এই শিল্পেও কিছু এগিয়ে যেতে পারলে সত্যিকার শিল্পের দিকে আর এক পা অগ্রসর হতে পারব আমরা।

ভারতবর্ষে অবস্থা কিছু অন্য রকম, আর তা হওয়াই উচিত। বিদেশ থেকে আধুনিকের আক্রমণ এবং নানা দিকে নানা পদস্খলন সবেও—শ্রীঅরবিন্দ সেই কালখণ্ডকে রবিবর্মার যুগ বলেছেন—ভারতের অন্তরটি ইংরেজ বা যুরোপীয় বনে যায় নি। তার প্রমাণ কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠি। এই প্রমাণ-চিহ্ন বলছে যে ভারতের রুচি প্রবৃত্তি এখনো তাকিয়ে রয়েছে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা শাশ্বত ও সারবস্ত তারই দিকে। তোমাদের সামনে, তোমাদের আয়তনের মধ্যে এখনো রয়েছে সেই প্রাচীন সব মন্দির, কতো পুরাতন চিত্র তারা সব বলছে যে শিল্পস্রষ্টি একটা ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য, তা দেবে একটা সমগ্রের ও সংগঠনের বোধ। প্রসঙ্গত আর একটা খুব আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ্য করে থাকবে। গুহায় ও মন্দিরে এ-সব চিত্র ও স্থাপত্যে কোনো শিল্পীর নাম নেই। যশের প্রার্থী হয়ে এসব করা হয় নি। আজ শিল্পীর একটুখানি কাজের সঙ্গে তার নাম-স্বাক্ষর থাকে, কাগজে পড়ে মহা হৈ চৈ হয়, যাতে তা সবার স্মরণে থাকে। সেকালে শিল্পী করে গিয়েছেন তাঁর আপন কর্তব্য—ভবিষ্যকাল তাঁকে মনে রাখবে কি না সেদিকে দৃষ্টিপাত ছিল না। অন্তরের প্রেরণা তাঁকে নিয়ে চলেছে এক উচ্চতর সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, আরাধ্য দেবতার উপযুক্ত আবাসটি রচনা করতে। যুরোপে মধ্যযুগের ক্যাথিড্রালগুলিতেও এই একই ভাবের জিনিস। সেখানেও শিল্পী রয়েছেন অজ্ঞাত, রাখেন নি তাঁর স্বাক্ষর। কোথাও যদিই বা নামচিহ্ন পড়ে গিয়ে থাকে তবে তা হয়েছে একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে, দৈবাৎ।

তবু, সকল কর্মরতা সবেও আজকের বণিগ্‌বৃত্তির রয়েছে একটা বিশেষ স্রবিকা। এই বাণিজ্যপন্য বা বিকিকিনির অর্থ পৃথিবীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বন্টিত। পূর্ব আর পশ্চিমের বিভেদ মুছে দেয় সে, পূর্বকে সে পশ্চিমের কাছে আর পশ্চিমকে পূর্বের কাছে এনে ধরে। পণ্যস্রবোর লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে চলে ভাবের ও আদান-প্রদান, এমন-কি আচার-ব্যবহারের বিনিময় পর্যন্ত। প্রাচীন কালে রোম জয় করেছিল গ্রীকদেশ, কিন্তু গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে নিজেই করেছিল আত্মদান। আজ এক বৃহত্তর কেন্দ্রে প্রবলভর বেগে সেই একই নাটকের পুনরতিনয় হতে চলেছে যেন। এক সময় আমেরিকার ধরনে জাপান নিজে থেকে শিক্ষিত করছিল; আর আজ যখন আমেরিকা জাপানকে স্থূলত প্রকৃতই জয় করেছে তখন তার পরাজয় হতে চলেছে জাপানের অন্তরাত্মার কাছে। আমেরিকায় প্রস্তুত জিনিসপত্র আজ যদি দেখো তবে দেখবে সেখানে পড়েছে কোনো না কোনো রকমে একটু জাপানী চিহ্ন।*

- পিতৃসভার প্রদত্ত যারের তালুক অনুসরণে লিখিত জীবনলীলাক্ত গুপ্তের ইংরাজী হইতে অনূদিত।

কম্পনীয় গম্প

শ্রীমা

অনেক দিন আগে স্বপ্নের প্রাচ্যদেশে ছোট একটি রাজ্য ছিল। সে-রাজ্যে যেমন গভীর শান্তি তেমনি নিবিড় শৃঙ্খলা। প্রত্যেকে সেখানে নিজের নিজের মনোমত স্থানটি পেয়েছে, পেয়েছে আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ। সকলে সেখানে পরিশ্রম করে গনবেত সকলের মহত্তম মঙ্গলের জন্য।

কৃষক, কারিগর, শ্রমিক, ব্যবসায়ী সকলের এক লক্ষ্য এক চিন্তা—নিজের কাজে যথাসম্ভি আত্মনিবেশ করা, আর তাতেই প্রত্যেকের কল্যাণ। কারণ, প্রথমত, এই স্বাধীন-ভাবে নির্বাচিত কর্ম যেমন তাদের স্বভাবের অনুযায়ী, তেমনি আনন্দদায়ক দ্বিতীয়ত, তারা জানে যে সকল কুপ্রয়াসের ফলে আছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক—ঐশ্বর্যসহ তাদের এই সুখ ও শান্তিময় জীবন। এ-জীবনে অনাবশ্যক বিলাস-সম্ভার নেই, তবে অভাব মিটিয়ে পরিতৃপ্তি দেবার উপাঙ্গন আছে যথেষ্ট।

বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীদের সংখ্যা তুলনায় কম। তারা তাদের সর্বস্ব, তাদের সকল সাধনা যেমন চলে দিয়েছে নিজের নিজের বিজ্ঞান ও শিল্পে, তেমনি দেশও তুলে নিয়েছে তাদের জীবিকার দায়িত্ব, কারণ দেশ বোঝে যে নূতন নূতন সব আবিষ্কারের স্বকল তারই ভোগে আসবে প্রথম, এসব নব নব সৃষ্টির আনন্দরস সে-ই পান করবে সকলের আগে। এ রকমে অনিশ্চয় এবং জীবন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থেকে বৈজ্ঞানিকের একমাত্র লক্ষ্য হল এই : নূতন নূতন পরীক্ষা ও উদ্ভাবনা, গভীর ও একনিষ্ট অধ্যয়ন মানুষের দুঃখ যেন লাঘব করে, তার সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি যেন বাড়িয়ে দেয়, যাতে আলোকনাত্ম শান্তিবিধাতৃজ্ঞানের সামনে পড়ে দূরে পালিয়ে যায় কুসংস্কার ও ক্রুরতার অঙ্ককার। আপন শিল্পে অভিনিবিষ্ট শিল্পীর একান্ত লক্ষ্য হল নিজের ভিতরে মহত্তম ধ্যানরূপের অনুযায়ী বাহিরে স্ফলরের সৃষ্টি।

সকলের মধ্যে বহু-স্বরূপ দিগারী-স্বরূপ ছিল চার জন দার্শনিক। তারা জীবন কাটিয়েছে তারা গভীর অধ্যয়নে এবং প্রদীপ্ত চিন্তায়—যাতে মানুষের জ্ঞানের পরিধি নিরন্তর বেড়ে চলে, যাতে যা-কিছু এখনো রয়েছে রহস্যময় তার অবয়ব থেকে আবরণ একে একে যায় সরিয়ে ফেলা।

সকলেই সুখী। কারণ, এখানে নেই প্রতিযোগিতার তিক্ততা। সকলেই এখানে পারে নিজের গহ্বলমতো কাজ বা অধ্যয়ন নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে। সকলেই সুখী, তাই

জাটিন আইন-কানূনেরও প্রয়োজন হয় না। তবে একটা মূলনীতি আছে, তা সংক্ষেপে এই—সকলের জন্য সামান্য একটু স্মরণ উপদেশ—‘নিজে যা, তা-ই হও’ সকলের জন্য অবশ্য-পালনীয় এক নিয়ম—সে নিয়ম ‘ঐদার্য’ আর তার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হল স্বনির্ভর। এ ‘ঐদার্য’ কোনো অপচয় করে না, মানুষের অবাধ উন্নতিতেও বাধা দেয় না। তাই স্বভাবতই প্রত্যেক যুগপৎ নিজের ও অপরের জন্যে কাজ করে চলে।

এই সোনার রাজ্য শান্তির রাজ্য শাসন করতেন এক রাজা। তিনি রাজা, কারণ তাঁর মতো বিচক্ষণ তাঁর মতো জ্ঞানী আর কেউ ছিল না, কারণ প্রত্যেকের অভাব মিটাতে পারতেন এক তিনিই। তিনিই পারতেন দার্শনিকদের চিন্তার সমুচ্চ চূড়া ধরে চলেতে, এমন কি তাদেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁর সামর্থ্য ছিল রাজ্যের সমাবধান এবং প্রজাদের সুখ-সুখী বিধান করবার, কারণ তিনি জানতেন সকলের প্রয়োজন।

আমাদের গল্পের যে-সময়ে আরম্ভ তখন এই অনন্যসাধারণ রাজার বয়স হয়েছিল ষোল—দু’শ বছরের বেশি। তা হলেও জড়তা তাঁকে স্পর্শ করে নি, তখনো তিনি পূর্বের মতোই তৎপর ও সজাগ। তবু তিনি এত বছর ধরে যে গুরুভার বহন করেছেন তার থেকে অবসর নেবেন মনস্থ করলেন। ডেকে পাঠালেন রাজপুত্র তরুণ মেওতা-কে। কুমার সর্ব-গুণসম্পন্ন। সাধারণের চেয়ে অনেক সুশ্রী তিনি, তাঁর ঐদার্য এত সমর্থ যে তা ন্যায়বিচারের পর্যায়ে গিয়ে ওঠে, তাঁর বুদ্ধি সূর্যের মতো ভাস্কর, জ্ঞানের তো তুলনাই মেলে না। কারণ, তাঁর তারুণ্যের এক অংশ তিনি ব্যয় করেছেন শ্রমিক ও কৃষিগণদের মধ্যে—ব্যক্তিগতভাবে জেনেছেন কি তাদের অভাব, কি তাদের প্রয়োজন। অন্য সময় কাটিয়েছেন একাকী কিংবা দার্শনিক আচার্যদের সাহচর্যে—কখনো প্রাসাদের নির্জন নিম্নে, কখনো নীরব ধ্যান ও অধ্যয়নে।

মেওতা যখন সামনে এসে অভিষেক করে দাঁড়ালেন তখন পিতা তাঁকে পাশে বসিয়ে বললেন—‘বৎস, একশ’ সত্তর বছরের বেশি এ রাজ্য শাসন করলাম আমি। যদিও হৃদয় সকলেই আজ আমার শাসনে সুখী, তবু এখন মনে হচ্ছে শৃংখলারক্ষা এবং সকলের সুখশান্তি-বিধানের গুরুদায়িত্ব আর আমি তেমন সহজে বহন করতে পারি না। বৎস, তুমিই আমার আশা ভরসা আনন্দ। প্রকৃতি তোমার প্রতি কোনো কাপণ্য করেন নি—তাঁর সম্পদ সব তোমাকে চেলে দিয়েছেন তিনি, আর সুশিক্ষায় সেসব তুমি আশানুরূপ সুসম্বদ্ধ করে তুলেছ। সামান্য চাষী থেকে মহা মহা দার্শনিকতা, রাজ্যশুদ্ধ সকলে, তোমার উপর নির্ভর করে অসঙ্কোচে। নিজের সদিচ্ছা দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করেছ তুমি, আর ন্যায় বিচার দিয়ে করেছ তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ। সুতরাং আজ যদি আমি একটু অবসরভোগের ন্যায্য বাসনা জানাই তাহলে সদতভাবে তোমাকেই তারা নির্বাচন করবে। কিন্তু তুমি তো জানো এদেশের

চিরন্তন নিয়ম—একক কেউ এ-সিংহাসনে বসতে পারে না অর্থাৎ চাই এমন সজিনী যার সঙ্গে হবে পরিপূর্ণ মিলন, যিনি রুচি ও যোগ্যতায় সনান হয়ে তোনাকে দিতে পারবেন সবতার শান্তি। তোনাকে ডেকেছি এই প্রথা বনে করিয়ে দিতে, আর তোনাকে জিজ্ঞাসা করতে যে এমন কোনো যোগ্য কুমারীর সাক্ষাৎ পেয়েছ কি যিনি আনাদের এই ইচ্ছানুযায়ী তাঁর জীবন যুক্ত করতে চান তোমার জীবনের সঙ্গে।”

“পিতা, আপনাকে নিশ্চিত উত্তর দিতে পারলে খুসী হতাম। যাঁর জন্য অপেক্ষা তাঁকে অনেক বৃদ্ধি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোথাও তাঁর দেখা পেলান না। রাজ্যের মূল্যবোধে কুমারীরা সকলেই আমার পরিচিত। তাদের অনেকের উপর আছে আমার গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা, কিন্তু এই যে একমাত্র সূত্রে মিলন হয় সত্য ও সার্থক সেই ভালোবাসা কেউই আমার মধ্যে আগাতে পারে নি, আর একথাও ঠিক জানি যে তাদের মধ্যেও কেউ তেমন আমাকে ভালোবাসে না। আপনি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবেন, তাই আপনাকে বলছি এখন আমার মনের কথা। আমার মনে হয় আনাদের এই ছোট রাজ্য পরিচালনা আনি আরো দক্ষতার সঙ্গে করতে পারব যদি আনি জানতে পারি নানা দেশ-বিদেশের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন। আমার ইচ্ছা তাই বিগ্ৰহনয়ন করবার—দেখা আর শেখার জন্য। পিতা, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমার বিদেশ-যাত্রার অনুমতি দিন। কে বলতে পারে, হয়ত এই যাত্রায় সাক্ষাৎ পেয়ে যাব আমার জীবনসজিনীর—যাঁর রক্ষা ও সুখসুস্থির তার পড়বে আমার উপর।”

“বৎস, তোমার ইচ্ছা সাধু। আনি সম্মতি দিলাম। তোমার পিতার আশীর্বাদ থাকল তোমার সঙ্গে।”

★

★

★

পশ্চিমের সমুদ্রে সে এক ছোট বীপ। তার মূল্যবান অরণ্য তাকে আরো বহুমূল্য করে তুলেছে।

বসন্তকালের সেই দিনটি আলোর উজ্জ্বল। কত বিচিত্র রমনীয় আরণ্যবৃক্ষ। আর নীচে সেই ছায়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে কুমারী নিয়ান। নারীকুলের তিলোত্তমা সে, হাল্কা পোষাকের নীচে ছন্দের স্তম্ভ তুলে চলে তার দেহবল্লরী। সুখখানির রঙ কোনল—রক্তিত লাল ওঠাধর সে-মুখের স্তম্ভতাকে আরো স্তম্ভ করে ধরেছে। মুকুটের মতো সবার উপরে সোনালী চুলের রাশি—তা নেবে এসেছে বহুধারে। চোখ দুটি বেন নীল অসীমের পারে দুটি উন্মুক্ত দুয়ার—সেখান থেকে বুদ্ধির আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে সর্বাদে।

পিতৃভাতৃহীন নিয়ান। সঙ্গীসাবী তাঁর কেউ নেই। অবশ্য তাঁর অনুপম সৌন্দর্য এবং অতুলনীয় বুদ্ধি তার দিকে আকর্ষণ করেছে অনেকের চিত্ত, অনেকের আন্তরিক প্রেম।

কিন্তু নিয়ান অন্তশ্চক্ষে দেখেছে এক পুরুষকে, বেশবাস দেখে নেন হয় তাঁর দেশ বহু দূরে : অপরিচিতের সেই নবু ও প্রশান্ত দৃষ্টি জয় করেছে এই তরুণীর হৃদয়, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ডানোবাসতে পারে না সে। সেই থেকে তাঁরই জন্যে সে অপেক্ষা করেছে আশাভরে। গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছে সেই অনুপম মুখখানি, তাঁকেই আবার কল্পনাচক্ষে দেখবার অবসর-অছিলায় সে এসেছে এই ঘন অরণ্যের নির্জনতায়।

অরণ্যের সে-নিবিড় পত্রসত্তার ভেদ করতে পারে না খরসূর্য। পখিকের পায়ের নীচে দলিত শৈবালের ক্ষীণ শব্দ সেখানকার নীরবতা একটুও সচকিত করে না। আতপ-রিত্রি এ-সময়ে সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন। শুধু নিয়ানের অন্তরে কিসের এক অস্পষ্ট ব্যাকুলতা, যেন তার চার দিকে বনজ গুল্মে নুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য অশরীরী প্রাণী, যেন গাছের আড়াল থেকে নিষ্কিণ্ট হয়ে অগণিত দৃষ্টি পড়েছে তারই উপর।

হঠাৎ পাখী গেয়ে ওঠে আনন্দের স্বচ্ছ সংগীত। সব শব্দা যায় মিলিয়ে। মনে হয় সমস্ত বনানী যেন তার সখী। গাছে গাছে যদি নুকিয়েও থাকে প্রাণীরা, তারা যেন আর তার ক্ষতি করতে পারে না। তার ভিতরে জেগে ওঠে এক কোমল ভাব, সব মনে হয় সুন্দর ও কন্যাগন্ধ, চোখে তার জন ভরে ওঠে। অজ্ঞাত প্রেমানন্দের চিন্তায় এত আশা জাগে নি তার আর কখনো। মনে হতে থাকে বাতাসে আন্দোলিত ওই গাছে, পায়ের তলায় দলিত ওই শৈবানদল, গানমন্ত ওই পাখী—সকলে তারই বাহ্যিকের কথা বলছে। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভাবনায় তার শরীরে এল শিহরণ, বুকের উপর দু'হাত রেখে যেন শান্ত হতে বলল চকল হৃদয়কে, চোখ বন্ধ করে অন্তরের এই আবেগকে চাইল আরো নিবিড়ভাবে অনুভব করতে। এ কি! অনুভূতি তো তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ক্রমে তা এত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় যে নিয়ান যেন বুঝতে পারে তার সামনে কেউ উপস্থিত। সে চোখ খুলল। কি আশ্চর্য অঘটন! সেই তিনি সম্মুখে, জীবন্ত তিনিই, যাকে সে দেখেছে স্বপ্নের মধ্যে...সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর—মেওতা।

দৃষ্টিপাতমাঝেই পরস্পরে পরস্পরকে চিনলেন—একে অন্যকে জানালেন সুদীর্ঘ অপেক্ষার কথা আর এই পুনর্মিলনের আনন্দ। পুনর্মিলন, কারণ তাঁদের পরিচয় ছিল এক দূর পূর্বজন্মে—এখন আবার সব সংশয় দূর হল।

নিয়ান নীরবে তার হাত রাখল মেওতার প্রসারিত হাতে—এ সেই নীরবতা বার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে পারাপার করে কতো কথা। বনের মধ্যে দিয়ে চললেন দু'জনে। সামনে এসে পড়ল তারপর প্রফুল্ল সূর্যের নীচে শান্ত সবুজ সমুদ্র। তারই তীরের কাছে নোঙর করে আছে মন্ত এক জাহাজ।

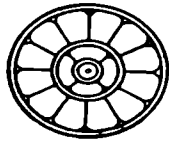
বিশ্বাসে পূর্ণ নম্র নিয়ান মেওতার অনুগমন করে উঠল বালুবেলাতে টেনে আনা নৌকায়

দু'জন বনিষ্ট নান্না ঠেলে সে-নোকা সনুত্রে নানিয়ে তারপর ক্রত পৌঁছাল গিয়ে জাহাজের গারে ।

দূরে দিকচক্রবালে যখন মিলিয়ে গেল ছোট্ট বীপটি তখন বলল তরুণী তার সঙ্গীকে, “তোমার অপেক্ষায় ছিলাম । এখন তুমি যখন এলে তখন প্রশ্ন না করে তোমার অনুগমন করলাম আমি । আমি অনুভব করছি, আমি জানি আমরা একে অপরের জন্য সৃষ্ট ; আর এ’ও জানি অদ্যাবধি চিরকাল তুমি আমার আনন্দের আনন্দ, জীবনের রক্ষাকবচ । কিন্তু বড় প্রিয় ছিল আমার জন্মভূমি ওই বীপ আর ওর সুললিত অরণ্য । জানতে ইচ্ছা হয় কোন তীরের মুখে চলেছি আমরা ।”

—“গারা পৃথিবী হুঁজে বেড়িয়েছি তোমায় । এখন যখন তোমাকে পেলাম, বিনা বিধায় তখন তোমার পাণি গ্রহণ করলাম । আমারই অপেক্ষায় ছিলে তুমি, তোমার চোখে পড়লাম সেই কাহিনী । আজ থেকে চিরকাল আমার প্রিয়া হল আমার সর্বস্ব । তাকে যদি তার শাখীশোভামণ্ডিত ছোট্ট বীপটি ছাড়তে হয়ে থাকে আজ, সে তবে তার আপন রাজ্যের রাণী’র গ্রহণের জন্যে —গারা পৃথিবীতে শুধু সেই রাজ্যেই শান্তি ও অশ্রুত্যা, সে-রাজ্যের প্রভারাই এমন রাণীর উপযুক্ত ।”*

* হুগু করাসীতে লিখিত Conte Saphirin র অনুবাদ ।



ଶ୍ରୀଯା

ମତେ ଆରୋହଣ

ଝରନ-ନାଟା

উপক্রমণিকা

সপ্তধাপ

উপসংহার

*

ব্যক্তিগণ (বারজন)

জনসেবক

দুঃখবাদী

বৈজ্ঞানিক

শিল্পী

ছাত্রছাত্রী (তিনজন)

শ্রেমিক-শ্রেমিকা

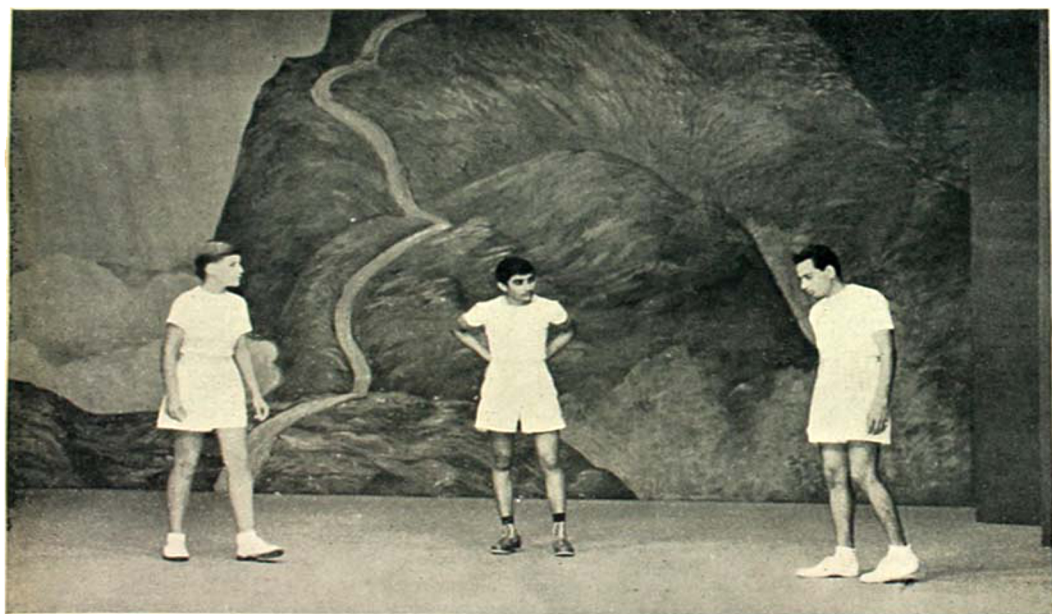
সন্ন্যাসী

সাধক-সাধিকা



সত্য আরোহণ







শিল্পী ও মৈত্ৰানিক





সাদক-সাদিকা

সূচনা

শিল্পীর কর্মশালা, প্রারম্ভিক অধিবেশন, আরোহনের সাতটি ধাপ,
সপ্তমটি ছুড়ার উপরে। উপসংহার—নবজগৎ।

শিল্পীর কর্মশালায়

সারাহ। রাজি আসন। সভার শেষ। সভায় সম্মিলিত কয়েক-
জনের একটি ছোট গোষ্ঠি, সকলেই সত্যকে আবিষ্কার করার
একই প্রেরণায় উদ্ভূত।

উপস্থিত

সদিচ্ছা-পরিপূর্ণ জনসেবক।

জীবনে যে শুধু নিরাশ হয়েছে—পৃথিবীতে সুখলাভ সম্ভব বিশ্বাস করে না যে।

বৈজ্ঞানিক—প্রকৃতির সমস্যা সব শীবাংসা করতে চায় যে।

শিল্পী—যাঁর স্বপ্ন স্নানরতর আদর্শ।

তিনজন হাজারাজী (দুটি ছেলে, একটি মেয়ে) নিয়ে একটি দল—যাদের আস্থা আছে
শ্রেষ্ঠতর জীবনের উপর এবং নিজেদের উপর।

প্রেমিক-প্রেমিকা—যারা মানুষী প্রেমের মধ্যে হুঁজছে পূর্ণ সার্থকতা।

সন্ন্যাসী—সত্যকে আবিষ্কারের জন্য যে সকল রকম কৃচ্ছ সাধনার জন্য প্রস্তুত।

দুটি প্রাণ—একই আশ্রুহা যাদের মিলিয়ে ধরেছে, যারা বরণ করেছে অনন্ত
ভগবানকে, কারণ অনন্ত ভগবানই তাঁদের বরণ করেছেন।

যবনিকা উত্তোলন

শিল্পী

বন্ধুসব, আমাদের সভা ত শেষ হতে চলল,—সমাপ্ত করবার পূর্বে, যে একই চরম সম্বন্ধে কর্ত্তের মধ্যে আমাদের সকলকে নিলিয়ে ধরবে তা গ্রহণ করবার পূর্বে, আমাদের সকলকে আর একবার আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের বন্ধুতা যা বনেছ তার অধিকতর আরো কিছু যোগ করতে চাও কিনা।

জনসেবক

আমি আমার এই কথাই বলতে চাই যে আমার সমস্ত জীবন আমি উৎসর্গ করি জনসেবায়—বহুবৎসর ধরে আমি পরিচিত বা সম্ভাবিত সব রকম উপায়ে চেষ্টা করে দেখি, কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তিকর ফল কোন কিছুতে পাইনি। এখন আমি স্থির হয়েছি যে আমি যদি আমার কর্ত্তে সাক্ষ্য চাই তবে আমাকে আবিষ্কার করতে হবে সত্যকে। বাস্তবিকই, জীবনের সত্যকার অর্থই যদি না ধরতে পারি তবে মানুষকে সার্থকভাবে কেমন করে সাহায্য করতে পারি? যা কিছু প্রতিকারেরই আশ্রয় গ্রহণ করি না কেন তাতে ক্ষণিক উপশম হতে পারে কিন্তু আরোগ্যলাভ হবে না। সত্যের চেতনাই কেবল মানুষকে উদ্ধার করতে পারে।

তুঃখবাদী

জীবনে বচ দুঃখভোগ করেছি,—বচ নিরাশ আমি হয়েছি, বহু অন্যায় সহ্য করেছি, বহু শ্রম সাফল্য করেছি—কিন্তু এই উপর আমার আর বিশ্বাস নাই, কারো উপর ভরসা নাই, না ভগবতের উপর, না মানুষের উপর। আছে এক আস্থা শুধু সত্যের আবিষ্কারের উপর—অবশ্য সত্যকে আদৌ যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।

প্রথম সাধক

আমাদের দুজনকে একসাথে আপনারা দেখছেন, তার কারণ একই প্রেরণা আমাদের জীবনধারাকে নিলিয়ে ধরেছে—সেহের কি প্রাণের কোন গ্রহিই আমাদের পরস্পরকে বাঁধে নি। আমাদের জীবনের একমাত্র অভিনিবেশ সত্যের আবিষ্কার।

শ্রেমিক

সাধক সাধিকা দুজনকে দেখিয়ে

আমরা দুজন কিস্ত এই বন্ধু দুটির খেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; (প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে) আমাদের জীবন পরস্পরকে ধরে, পরস্পরের জন্যো—আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মিলন লাভ, দুটি সেহে থাকবে কিস্ত শুধু এক সত্তা, এক চিন্তা, এক ইচ্ছা—দুটি বৃক্কে থাকবে এক নিঃশ্বাস, দুটি হৃদয়ে এক স্পন্দন—দুটি হৃদয় বেঁচে থাকবে প্রেমকে ধরে, প্রেমের মধ্যে, প্রেমের জন্যো । আমরা চাই প্রেমের যে পরিপূর্ণ সত্য তাকে আবিষ্কার করতে, আমাদের জীবন এই লক্ষ্যেই আমরা উৎসর্গ করেছি ।

সন্ন্যাসী

কিস্ত আমার কাছে সত্য যে এত সহজলভ্য তা মনে হয় না । যে পথ সেখানে গিয়ে পৌঁছেচে তা হবে কঠোর সমুচ্চ, ঋজু—বিপদে-আপদে, ভীতিতে, নিখ্যা ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ । এসব বাধাবিপত্তি পার হয়ে চলতে গেলে দরকার অটল সঙ্কল্প আর ইস্পাতের স্নায়ু । আমি নিজে সবারকম কৃচ্ছতার, তপস্যার, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত—যে-সুস্থহান লক্ষ্য সম্মুখে ধরেছি; তার উপযুক্ত হবার জন্যো ।

শিল্পী

সকলের দিকে তাকিয়ে

আর কিছু বলবার নাই তোমাদের ?...না । তাহ'লে একমত আমরা—আমরা একসঙ্গে একই চেষ্টায় সকলে মিলে এই যে সুস্থহান গিরি সত্যের দিকে নাথা তুলেছে তাতে উঠব গিয়ে । এ অভিযান কঠিন, শ্রমসাধ্য—কিস্ত চেষ্টা করে দেখবার যোগ্য ; কারণ তার শিখরে উঠতে পারলে সাক্ষাৎ করা যায় সত্যকে আর বলা বাহুল্য তখনই সব সমস্যারই মীমাংসা হয়ে যায় ।

কাল তাহলে আমরা সকলে মিলব পাহাড়ের তলায়—একসঙ্গে আমাদের আরোহণ শুরু করব । আসা যাক এখন তবে—ফিরে দেখা হবে ।

সকলের নিজাতি

প্রথম ধাপ

পাহাড়ের উপরে সবুজ সবতলভূমি—সেখান থেকে সমস্ত নিগুভূমিটি দেখা যায়। এই সবতলভূমি পর্য্যন্ত পথ ছিল সহজ প্রশস্ত, এর পর থেকে তা হয়ে উঠল হঠাৎ ঝড়া—বিরাট শিলানয় সমুচ্চ পাহাড়ের মানুদেশ বেড় দিয়ে তা চলল।

সকলেই একসঙ্গে চলেছে, সামর্থ্যে উৎসাহে পরিপূর্ণ। সবাই তাকিয়ে দেখল নিগুভূমি,—উঁচু থেকে সবটা তার দেখা যায়। তারপর জনসেবকের ইসারায় সবাই কাছে এল।

জনসেবক

বহুসব, কিছু বলতে চাই তোমাদের আমি—বিশেষ দরকারী জিনিষ জানাতে হবে তোমাদের।

সবাই নীরব, নন দিয়ে ওনছে

গানন্দে হেলায় আনন্ডা উঠে এসেছি এই উচ্চভূমি অবধি—এখান থেকে আনন্ডা জীবনের ধারা নিরীকণ করতে পারি, তার সমস্যা সব ভালো করে বুঝতে পারি—বুঝতে পারি মানব দুঃখের হেতু ; জ্ঞান আশ্রমের বৃহত্তর গভীরতর হয়ে ওঠে, যে নীমাংসা বুজ্জে চলেছি তা লাভ করবার নত ক্ষমতাও এসে যায় (ক্ষণকাল নীরব)...

কিন্তু এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি একটা সংকট-স্থলে। এখান থেকে আরোহণ হবে আরো ঋজু, আরো কঠিন এবং বিশেষ কথা এই যে আমরা এখন পাহাড়ের অন্য দিকে ঘুরে যাব, আর দেখতে পাব না নিগুভূমি, দেখতে পাব না মানুষ ; তার অর্থ, আমাকে আমার কাজটি বিসর্জন দিতে হবে, মানুষের সেবা করব আমি এই যে বৃত্ত নিয়েছিলাম তা তদ্রূপ হবে আমার। আমাকে আর তোমাদের সঙ্গে থাকতে বোলো না—তোমাদের ছেড়ে আমাকে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে আমার কর্তব্য করবার জন্যে।

অবতরণের পথ ধরে ক্বে চলল সবাই আশ্চর্য্য হয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর

সন্ন্যাসী

বেচারী ভাই ! চলল নীচে নেমে আবার ! কর্ণে আসক্তি, বাহ্য জগতের, বাহ্যরূপের মোহ তাকে পরাভূত করল। কিন্তু আমাদের প্রেরণা যেন কিছুতেই স্তিমিত না হয়—আমরা আমাদের পথ বেয়ে চলব, কোন অনুশোচনা কোন বিধা না করে।

সকলে আবার পথ ধরে চলল

পথের এক অংশ—ক্রমে ঋড়া হয়ে উঠেছে, তারপর সবকোণে দূরে গিয়েছে এমনভাবে যে কোথায় চলেছে তা দেখা যায় না। নীচে একখানা সুদীর্ঘ অতিথন গুহবের পথটিকে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে।

সকলেই ন্যূনাত্মক আনন্দে চলেছে, দুঃখবাদী ছাড়া—সকলের শেষে সে এসে উপস্থিত হ'ল, পা টেনে টেনে, তারপর পথের ধারে, পাড়ের উপর বসে পড়ল। দুহাদের মধ্যে মাথা ওঁজোঁ চুপ করে বইল—আর সকলে যখন দেখলে সে আসছে না তখন ফিরে তাকালে। জ্বালাহুতীরের একজন ফিরে এল, তাঁর কাঁধে হাত দিল।

দ্বিতীয় ধাপ

ছাত্র

আরে! কি হল মশাই! ব্যাপার কি? হাঁপিয়ে গেছ?

দুঃখবাদী

হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে

যাও, যাও—ছেড়ে দাও আনন্দ—যথেষ্ট হয়েছে, আর পারি না আমি।

কেন, হয়েছে কি?

দুঃখবাদী

না, না, আমি বলছি আর পারি না—এটা একটা বোকানি, একটা অসম্ভব কাজ।

(পায়ে নীচে বেরানি দেখিয়ে)

দেখ না চেয়ে। জগৎ থেকে, মানুষ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কিছু নাই, কিছু নাই, বুঝবার জন্যে ধরবার ছোঁবার কিছু নাই,

ফিরে তাকিয়ে দেখন সত্যের ঝাঁকে

আর ঐ দেখ। কোথায় যে চলা হচ্ছে তা জানবার যো নেই। সবটাই উদ্ভট, নয় উদ্ভাঙ্গি—দুই-ই বোধ হয়। শেষটা হয়ত দেখা যাবে আবিষ্কার করবার কোন সত্যই নাই। জগৎ বল, জীবন বল, একটা নরক নয় কি? ফাঁক নেই বের হবার—তার মধ্যে আমরা রয়েছি

কয়েদী হয়ে। তোমাদের ইচ্ছা হয়, চনতে থাক। আমি আর নড়ব না—আমি আর নড়ব না। আমি আর ঠকতে চাই না।

দুহাতের মধ্যে আবার নাখা শুঁকে বসে বইল, ছাত্রটি তাকে বুঝাবার আর আশা করল না, আর দেখাও করতে চাইল না—তাই তাকে তাব নৈরাশ্য ভোগ করবার জন্যে ছেড়ে দিবে চন্দন আর সকলের সঙ্গে যোগ দিতে, আবার চড়াইয়ের পথ ধরতে।

তৃতীয় ধাপ

বৈজ্ঞানিক আব শিল্পী একসঙ্গে এল, দলটির পিছনে একেবারে, আলাপ করছিল বলে যেন দেখী হয়ে গিয়েছে—আলাপের শেষ।

বৈজ্ঞানিক

ইয়া, আমি তোমাকে বলেছিলেন—আমার মনে হয় আমরা একটু তরল চিন্তেই যেন অভিযানে নেমে গিয়েছি।

শিল্পী

ঠিক কথা, আমাদের আরোহণ এপর্যন্ত নিষ্ফলই হয়েছে। অবশ্য অনেক চিন্তা-কর্মক ভিনিষই আমরা যে পর্যবেক্ষণ করিনি তা নয়—কিন্তু সে সব পর্যবেক্ষণ খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় নি পরিণামে।

বৈজ্ঞানিক

তা বটে,—আমার পদ্ধতি আমি পছন্দ করি—তা অনেক বেশি বুদ্ধিযুক্ত, তা নির্ভর করছে নিরন্তর পরীক্ষণের উপর.....আমি এক পাও এগিয়ে চলি না, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী ধাপ সত্য বলে নির্ণীত না হয়েছে। এস, আমরা ডাকি আমাদের বন্ধুদের—খুব একটা প্রয়োজনীয় বার্তা আমরা দিতে হবে ওদের—

ইয়ারা ও শব্দ করে ডাকল সকলকে—সকলে কাছে এলে, বৈজ্ঞানিক বলে চন্দন তাদের

বন্ধুরা সব! পথের সহযাত্রী সকলে! যতই আমরা দূরে চলে গিয়েছি জগৎ থেকে, তার স্থল বাস্তবতা থেকে, ততই বেশি আগার মনে হয়েছে যে আমরা যেন ছেনেখেলা করছি!

আমাদের কাছে এই তথ্য উদ্ঘাটিত করা হয়েছিল যে এই খাড়া পাহাড়টি যার চূড়া পর্যন্ত কেউ কখনো উঠতে পারে নাই, আমরা যদি তা পারি তাহলে সত্যে গিয়ে পৌঁছাব—আর অবনি আমরা পথে উঠে চলেছি, উঠবার পথ সম্বন্ধে কোন পরিচয় না নিয়েই। কে বলতে পারে আমাদের পথ ভুল হয় নি? কে আশ্বাস দেবে আশানুরূপ ফল আমাদের হবে? আমার মনে হয় আমরা কাজ করেছি অস্বাভাবিক তরলো পরিচালিত হয়ে—আমাদের এই অনুষ্ঠান বিজ্ঞান-সম্মত নয়। সুতরাং আমি ঠিক করেছি—অতি দুঃখের সঙ্গে বলব, কারণ তোমাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, ঠিক করেছি আমি এখানেই থেকে যাব প্রশুটি অনুধাবন করতে, একটা নিশ্চয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে, যদি তা আসে বা সম্ভব হয়—কি পথ অনুসরণ করা উচিত, সত্যাকার পথ কি, যা নক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

কিছুক্ষণ পরে

তাছাড়া আরো কথা। আমার স্থির বিশ্বাস প্রকৃতির মধ্যে অতি সামান্যতম বস্তুর গঠন-রহস্য যদি আমি আবিষ্কার করতে পারি—ধর না, রাস্তার উপরের এই তুচ্ছ পাথরের টুকরাটি—তা থেকেই আমি সত্যে গিয়ে পৌঁছাতে পারি। সুতরাং আমি এখানেই রয়ে গেলাম, এবং তোমাদের বলি, এস তাহলে—হ্যাঁ এস তা হলে, বলছি—তাই আশা করি; কারণ হয়ত বা তোমরা আবার ফিরে আসবে আমার কাছে আর আমার বৈজ্ঞানিক ধারায় : কিম্বা আমি যা চাই তা যদি লাভ করি তবে আমিই হয়ত তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছব স্বসংবাদটি নিয়ে।

শিল্পী

আমিও মনে করছি তোমাদের সঙ্গে ছাড়ব—তবে আমার হেতু আমাদের বৈজ্ঞানিক বন্ধুবরের হেতু নয়, যদিও দাবী তারও একই।

আমাদের এই নবোন্মত্ত উত্তরণের পথে অনেক অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি—নূতন নূতন স্থলর জিনিষ সব দেখা দিয়েছে—না, বলতে পারি সৌন্দর্য্যের এক নূতন বোধ আমার আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে—আর সেই সঙ্গেই একটা তীব্র অদম্য প্রয়োজন আমাকে পেয়ে বসেছে যে সে-অভিজ্ঞতা স্থূল আকারের মধ্যে ধরে দিতে হবে, জড়ের মধ্যে তাদের নামিয়ে আনতে হবে যাতে সকলের শিক্ষার তা সহায় হয়, বিশেষভাবে যাতে তার কল্যাণে এই স্থূল জগৎটি প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। তোমাদের সঙ্গে ত্যাগ করলাম তাহলে, অতি দুঃখের সঙ্গে। আমি এখানেই থেকে যাব—যতদিন না আমার অভিনব অভিজ্ঞতা সব আমি শাকার না করে তুলতে পারছি। আমার সকল বক্তব্য আমি যখন ব্যক্ত করে ধরব, তখন আবার উত্তরণের

পথ গ্রহণ করব, তোমাদের সঙ্গে আবার মিলব গিয়ে, তোমরা যেখানে পৌঁছেচ সেখানকার নবতর আবিষ্কারের অনুমোদনে।

আমি তা হলে, ভাগ্য তোমাদের সুপ্রসন্ন হোক—

সকলে তার দিকে কিছু বিম্বিত হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর অল্পবয়স্কা ছাত্রীটি বলে উঠল :

ছাত্রী

কি এসে যায় আমাদের এ স্থলনে ! প্রত্যেকে তার নিয়তির পথে চলে, তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ত্ত্ব করে। আমাদের কিন্তু কোন কিছুতেই ফিরাতে পারবে না আমাদের এই অভিযান থেকে—চল, পথে এগিয়ে, সাহসে, সবলে, অক্লান্তভাবে।

বৈজ্ঞানিক ও নিল্পী ব্যতীত আর সকলে চলে গেল

সাধক গাধিকা দুটি যার সন্ধ্যাসী একসঙ্গে নিলে চলেছে, না খেমে বরাবর দ্বিধা পদক্ষেপে, তাদের পশ্চাতে প্রেমিক প্রেমিকা দুজন পরস্পরের বধো নিবিষ্ট, হাতে হাত দিয়ে চলেছে, অন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে।

তাদেরও ঠিক পিছনে ছাত্রছাত্রী তিনজন উপস্থিত হল—স্টাইল ক্রান্ত ভাষা—এসে ধাবল।

প্রথম ছাত্র

আরে ভাই ! চড়াই বলতে চড়াই—কি পথখানি—চলেছে ত চলেইছে, কোথাও থানা নেই—দন নেওয়ার ফুরসৎ নেই—না; পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমি।

ছাত্রী

ও কি কথা ! তুমিও বুঝি বসে পড়ছ আমাদের ছেড়ে। এটা কি ভয়ভয় হ'ল ?

প্রথম ছাত্র

আরে না না—ছাড়াছাড়ির কথা কি হল। বলছিলেন, একটু বিশ্রাম করে নিলে হ'ত না ? একটুখানি বসে দমটা নিয়ে নিলে হ'ত না ?—একটুখানি বই ত নয় ? উঃ, পাখানা কি না ধরে গিয়েছে—বস না একটু, একটুখানি শুধু—তারপর চলা বাবে আবার, আরো উদ্যমে, দেখবে তর্কন।

দ্বিতীয় ছাত্র

বেশ—তোমাকে এখানে ত আর হাওয়া খেয়ে থাকবার জন্যে একলাটি ফেনে আররা ভেগে যেতে পারি না—তাছাড়া, আনিও ভাই কিছু ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। এস না সবাই একটু বসা যাক—বলি, তুমি পরস্পরে কি দেখনার, কি শিখনার আনরা।

ছাত্রী

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বসল ওদের বত

বেশ, তাই হোক—তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই না। তবে বেশিক্ষণ কিন্তু বসা চলবে না—পথে দেবী করা সব সময়েই বিপদজনক কিন্তু—

প্রেমিক-প্রেমিকা ফিরে তাকান, দেখন ওরা বসে পড়েছে, দেখে চলল আবার...

শটই বেশ উচ্চস্বান—সাত্তা আরো সজীর্ণ, নীচে দেখা যায় বিপান দিগন্তর, অধিত্যকা অশুণ্য, সাদা বেগের নীচে ঢাকা পড়েছে—সাত্তা থেকে একটু পিছনে, নৃত আকাশের দিকে মুখ করে ছোট একখানা বাড়ী। প্রথম তিনজন না খেবে বরাবর চলে গেল, তারপর এল পরস্পরের বাতনছ প্রেমিক-প্রেমিকা, তাদের আপন স্বপ্নে বিভোর।

প্রেমিকা (দেখল তারা নিঃসঙ্গ)

বাঃ, কেউ ত নেই দেখছি—আনরা শুধু দুজন। আর সকলকে দিয়ে কি হবে আমাদের—আমাদের ত কোন প্রয়োজন নেই তাদের দিয়ে। আমরা দুজনে দুজনকে নিয়েই ত সম্পূর্ণ সুখী।

পথের পাশে বাড়ীখানা দেখে

প্রেমিক

দেখ ত চেয়ে, প্রিয়তমে, ঐ যে ছোট বাড়ীখানি, পাহাড়ের গায়ে, নির্জন কিন্তু কি আরাদের, কি অস্তরঙ্গ অঞ্চ খোলা অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে। বনে হয় আমাদেরই জন্য বিশেষভাবে তৈরী। আর কি চাই আমাদের? আমাদের বিননের আদর্শ আশ্রয়।

আমরা ত পেয়ে গিয়েছি. আমরা দুজন, পূর্ণ অথও নিনন—চায়ামুনা, মেঘমুক্ত। ওরা যাক না উঠে কোথায় যাবে, অনিশ্চিত কোন গত্যের দিকে—আমাদের গতা, আমাদের দুজনের একান্ত সত্য আমরা তো পেয়ে গিয়েছি—যথেষ্ট তা আমাদের।

প্রেমিকা

তাইত, প্রিয়তম, চল যাই, বাড়ীখানার ভিতরে আশ্রয় নিই—আমাদের আনন্দ উপভোগ করি আর কিছু দুঃপাত না করে।

বাহবছ হয়ে ওরা পথ ছেড়ে বাড়ীখানার দিকে চলল

ষষ্ঠ ধাপ

পথের শেষ—একান্ত সঙ্গীর্ণ হয়ে তা হঠাৎ খেঁবে গেছে—একটা বিপুল পর্বতগাত্র খাড়া হয়ে উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে, চূড়া তার আর দেখা যায় না। ঝাঁ দিকে অল্পপরিসরের একখানা সবতলভূমি প্রসারিত, তার শেষ প্রান্তে একটা অনুচ্চ এবং ক্ষত্র কূটির—সবস্ত্র স্থানটি বিস্ত্র উত্তর।

পেথের তিনজন একসঙ্গে এল—সন্ন্যাসী কিন্তু ধারল এবং ইসারায় আর দুজনকে ধামতে বলল

সন্ন্যাসী

একটা বিশেষ কথা বলবার আছে তোমাদের কাছে আমার, তোমরা দুজনে শুনতে যদি। উদ্ভূরোহণের পথে আমি আমার সত্যকার সত্যকে, আমার সত্যকার আত্মাকে আবিষ্কার করেছি। আমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, আমার কাছে আর কিছুর অস্তিত্ব নাই, আর কিছুর দরকারও নাই আমার। যা সেই বস্তুটি নয়, তা অকিঞ্চিংকর ব্রাহ্মি। সুতরাং আমি মনে করি পথের শেষে আমি পৌঁছে গিয়েছি।

বাদিকের সমস্তটি দেখিয়ে

দেখ, ঠিক এখানেই রয়েছে কি মহান নির্জন স্থানটি—যে জীবন যাপন করতে চাই আমি এখন থেকে, সত্যই অনুকূল তার পক্ষে। আমি ওখানে থেকে বাব, থাকব অটুট ধ্যানের মধ্যে ডুবে, পৃথিবী ও মানুষ থেকে দূরে, জীবন-যাত্রার নিয়তি থেকে মুক্ত হয়ে।

আর কিছু না বলে, ইসারায় বিদায় আনিবে, পিছনে না জাকিয়ে সোচ্চা চলে গেল—তার ব্যক্তিগত সিদ্ধির লক্ষ্যে।

সাধক-সাধিকা সঙ্গীহীন হয়ে পরশরের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, এখন মহত্বের নিদর্শনে কিছু বুঝে—কিন্তু তখনই আবার সারলে নিল,সাধিকাটি বলে উঠল

সাধিকা

না, না, এ কখনো সত্য—পূর্ণসত্য হতে পারে না, বিশ্বসৃষ্টি কখন শুধু বিঘন বাত্রে হতে পারে না, যে তা থেকে সরে পড়তেই হবে। তাছাড়া, আমরা তো পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছিনি—আমরা ত আমাদের আরোহণ শেষ করিনি।

সাধক

একটা ঝাড়া পাহাড়ের উঁচু মেয়ালে পথটা ঠেকে গিয়ে শেষ হয়েছে তা দেখিয়ে

ভৈরৱী পথ ত খেনে গেল এ-পর্যন্ত এসে। আমার মনে হয় এর বেশী আর কোন মানুষী জীব পার হয়ে যায় নি। এই যে ঝাড়া পাহাড়টি আমাদের সম্মুখে উঠে গিয়েছে তা মনে হয় একেবারেই অনতিক্রম্য—এটি পার হতে গেলে আমাদেরই প্রবেশের পথ খুঁজে বের করতে হবে, এক পা এক পা করে, এ শুধু আমাদের নিজেদের চেষ্টায়, কোন দিশারীর সাহায্য বিনা, একমাত্র আমাদেরই সঙ্কল্প ও নিষ্ঠার সহায়ে—আমাদের পথ আমাদেরই কেটে বের করতে হবে।

সাধিকা

সোৎসাহে

কোন পরোয়া নেই,—চল, এগিয়ে চল বরাবর—কি একটা জিনিষ আছে এখনো, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে—সৃষ্টির একটা অর্থ আছে—তা আবিষ্কার করতে হবে।

আবার জরা যাত্রা শুরু করল

সপ্তম ধাপ

পূর্বত শিখর

সাধক-সাধিকা সব বাধাবিঘ্ন বীরের বত ঠেলে এসেছে—শেষ চেষ্টার নিজেদের তুলে ধরল একেবারে শিখরে, পূর্ণালোকের মধ্যে। সব জ্যোতির্গগ এখানে, শুধু যে প্রত্যয়-বগটির উপর তারা দাঁড়িয়ে সেইটুকু ছাড়া—জও এত সজীর্ণ যে তাদের দু'ঝোড়া পা অতিক্রমে তার উপর স্থান পেয়েছে

সাধক

এই ত চূড়ায় আমরা—জ্যোতির্গগ বরোহ্মজল সত্য—আর কিছুই নাই।

সাধিকা।

আর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—ধাপে ধাপে যে আমরা এত পরিশ্রম করে চূড়া পর্য্যন্ত উঠে এসেছি তা সব মুছে গেছে।

সাধক

শূন্য—পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্বত্র—আছে শুধু আমাদের পা রাখবার মত জায়গাটুকু।
আর কিছুই নাই!

সাধিকা।

এখন যাব কোনদিকে? কি করতে হবে?

সাধক

ঐ ত সত্য, শুধু সত্য, চাবদিকে, সর্বত্র।

সাধিকা।

কিন্তু তা আয়ত্ত করতে হলে আমাদের যে আরো এগিয়ে যেতে হবে—সে জনো তবে আরো একটা গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করতে হবে।

সাধক

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার সব সম্ভাবনা শেষ এখানে। আর
একটা শক্তি এসে কাজ করা দরকার।

সাধিকা।

ভগবৎপ্রসাদ, ভগবৎপ্রসাদই কাজ করতে পারে শুধু—পথ তাতেই খুলে দিতে পারে,
একমাত্র তা-ই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

সাধক

দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে

দেখ, দেখ চেয়ে, দূরে, বহুদূরে, অতল গহবরের ওপারে চূড়া একটা, আলোয় আলোয়
উদ্ভাসিত, সর্বদাসুন্দর রূপাবলি, অপরূপ সূক্ষ্মা—ঐ ত পূণ্যভূমি, ঐ ত নূতন পৃথিবী।

সাধিকা।

তাই ত ! তাই ত ! ওখানেই ত আনাদের যেতে হবে—কিছু কি বকনে ?

সাধক।

ওখানেই যখন আনাদের যেতে হবে, পথও নিশ্চয় আনাদের মিলবে ।

সাধিকা।

হ্যাঁ, চাই বিশ্বাস, চাই ভগবৎপ্রসাদে ঐকান্তিক নির্ভর, চাই ভগবানে পূর্ণ সমর্পণ ।

সাধক।

হ্যাঁ, পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভগবৎ ইচ্ছার কাছে । কোন পথই যখন আর চোখে দেখা যায় না, তখন আনাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কিছু ভয় না করে, দ্বিধা না করে, পূর্ণ নির্ভর নিয়ে ।

সাধিকা।

আনাদের গন্তব্যস্থানে আনরা নিশ্চয় পৌঁছে যাব ।

দুজনেই ঝাপ দিন

উপসংহার

সিদ্ধি

ঐশ্বর্যজনিক আলোর রাজ্য

সাধক

এই দেখ, এসে গিয়েছি আমরা—অদ্ভুত শক্তি এক অদৃশ্য পাখায় করে যেন উড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

সাধিকা

চারদিকে চেয়ে দেখে

কি অপরূপ জ্যোতির্স্বর্য মহিমা! আমাদের এখন শুধু শিখতে হবে নূতন জীবন বাপন করা।

যবনিকা

দিব্য-জীবন

[অবতরণিকা]

অনির্বাণ

(পূর্বসম্বন্ধ)

৩৬

বিজ্ঞানঘন পুরুষ

আমরা জানি, অতিমানস সং-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তি। বিশুদ্ধে সে-ই ধরে আছে এবং প্রবর্তিতও করছে। আমরা মানুষ বা মনোময় জীব, মনই হল আমাদের মুখ্য চিন্তা-বৃত্তি। মনের উৎকর্ষে আমাদের মাঝে দেখা দেয় বুদ্ধি এবং বোধি। বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় সামান্য-জ্ঞানের আশ্রয়, বোধির বৈশিষ্ট্য হল প্রাতিভা-সংবিৎ। চেতনার যে-ভূমিতে বুদ্ধি বিস্তৃত এবং বোধি সহজ, উপনিষদের ভাষায় তাকে বলতে পারি বিজ্ঞানভূমি। আমাদের মাঝে এই বিজ্ঞানই হল অতিমানসের মুখ্য বৃত্তি। যেমন সচিৎসদানন্দের অতিমানস, তেমনই প্রবুদ্ধ জীবচেতনার বিজ্ঞান। একটি উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, আরেকটি নীচ থেকে উপরপানে উঠে যাচ্ছে।

মনের ওপারে বিজ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহকে জানে পরোক্ষভাবে। আর বিজ্ঞান সেই বহর মূলে এককে জানে এবং সে-জ্ঞানতে বহকেও জানে অপরোক্ষভাবে—ইন্দ্রিয়ের কোনও আশ্রয় না নিয়েই। মন জানে বাইরের ধাত্য, আর বিজ্ঞান জানে অন্তরের স্বতঃস্ফুরণে—তার জানা তাই ‘হয়ে জানা’। প্রাকৃত-চেতনা বাইরের উপর অনেকখানি নির্ভর করে বটে, কিন্তু তারও মাঝে অতীন্দ্রিয় স্বতঃস্ফুরণের একটা বেগ আছে। চেতনা শুধু আয়নার মত বাইরের প্রতিবিম্বই যে গ্রহণ করছে তা নয়, নিজস্ব ভাবনা দিয়ে তাকে অর্থযুক্তও করছে। স্বতঃস্ফুরণের এইটি হল প্রথম কাজ। ইন্দ্রিয়ের আহরিত জ্ঞানের মাঝে যে একটি বিশেষ অর্ধের বিধান করে, সে হল আমার ‘আমি’। স্বভাবের গরজে আমাকে কেন্দ্র করেই প্রতিনিয়ত আমার জগৎকে আমি সৃষ্টি করে চলেছি। বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে এই ভিতরের আমি সম্পর্কে আমার চেতনা উজ্জ্বল হতে থাকে, আমি ক্রমে আত্মসচেতন হই। আত্মসচেতনতা স্বতঃস্ফুরণের আরেকটি বৃত্তি। আত্মসচেতনতার

উৎকর্ষসাধনট হ'ল যোগ, তা'র চরম পরিণাম স্বারাভ্যাসিক্তি—আমার বিশুদ্ধ আনিকে পুরা-
পুরি জানা, পাওয়া এবং ব্যবহার করা। তখন বিশ্বব্যাপারকে আর যন্ত্রাচার বলে অনুভব
হয় না। দেখি, আমার মাঝে যে স্বতঃস্ফুরণের অনিরুদ্ধ সংবেগ, তা বিশ্বেরও মূলে,—
এক বিশ্বেদ্বন্দ্ব আদিত্যাত্মিক স্বতঃস্ফুরণেই বিশ্বের নীলকমল সহজের ছন্দে দল মেলছে।
উপনিষদের ঋষির ভাষায় বলতে পারি, সেই আদিত্যেই একটি রশ্মি সন্তত হয়েছে আমার
হৃদয়ে। তার ছোঁয়ায় আমারও হৃদয়কমল দল মেলছে। আমার জগৎ এই আত্মোন্নীতনের
আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, আনন্দই আমার জগৎ। এ সেই 'জগৎতাং জগৎ'—এক শাশ্বত
সত্তারই স্বতঃস্ফুরণ, যেমন বিশ্বে তেমনই জীব। বিশ্বের স্বতঃস্ফুরণের মূলে অতিমানসের
সংবেগ, তেমন আমার স্বতঃস্ফুরণের মূলে বিজ্ঞানের সংবেগ। বিশ্বলীলায় অতিমানসের
যে-সাব্যাসিক্তি, তারই ছন্দের অনুবর্তনে আমার মাঝে বিজ্ঞানের স্বারাভ্যাসিক্তি।

অতিমানসকে মন দিয়ে জানা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায়। প্রাক্ত-
বনেও বিজ্ঞানের একটা আবছা প্রকাশ হয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধি দিয়ে অতিমানসের স্বরূপ সম্বন্ধে
খানিকটা কর্পনা করা চলে। তাতে আর-কিছু না হ'ক, লোকোত্তরের একটা আভাস
চেতনায় ফুটিতে পারে। আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করাই সাধনার লক্ষ্য। তার
গোড়ার কথা হল অন্তরাবৃত্তি আর আত্মচেতনতা। আভাসে যা ফুটেছে, তা বস্ত নয়—
ভাব। ভাব আমার চেতনায়, বস্তর সে অর্থ। ভাবের মাঝেই চিত্ত নিবিষ্ট হলে দেখি
বস্ত বস্তর অর্থ আনন্দ। আর তোনাকে জানতে গিয়ে পেতে গিয়ে আনাকেই জানছি
এবং পাচ্ছি। এই একান্ততা যখন সহজ হয়, তখন বিজ্ঞান ঘনীভূত হয়। বিজ্ঞানঘন
পুরুষের চিত্তবৃত্তির আধার হল এই তাদাত্ত্যবোধ। কোনও-কিছুকে 'আমার' বলে জানা
প্রাক্ত-বোধের মাঝে একটা অন্তরঙ্গতা আনে। কিন্তু তবুও আনতে-তোনতে একটা
ফাঁক থাকে। ফাঁক বোলে, যখন আমি তুমি হয়ে যাই। আমি তখন তুমি হয়ে তোনাকে
জানি। তখন আমি ফাঁকা, তাইতে তুমি পূর্ণ। এই ফাঁকা হয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞানের
বনিয়াদ। যোগের ভাষায় একেই বলে সমাধি। তাদাত্ত্যবোধ সমাহিতচিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম।

এই তাদাত্ত্যবোধের তিনটি বৃত্তি আছে। উপনিষদ তাদের পরিচয় দিয়েছেন এই-
ভাবে। একটি হল আত্মকে সর্বভূতের বোধ, দ্বিতীয়টি সর্বভূতে আত্মার বোধ এবং তৃতীয়টি
আত্মই সর্বভূত এই বোধ। বলা বাহুল্য, তিনটিই জাগ্রৎ-সমাধির চিন্তন বৃত্তি। আত্ম-
চেতন্যের নিরন্তর ব্যাপ্তি এবং আবেশ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে, তাকে সত্তার
গভীর হতে বিচ্ছুরিত করছে, এই হল তাদের ক্রিয়ার স্বরূপ। প্রাক্ত-বন প্রশ্ন করবে,
কি করে তা হয়? তার ঐ এক জবাব : অন্তর্ভূত হয়ে, স্তব্ধ হয়ে, শূন্য হয়ে—অথচ সম্পূর্ণ
জাগে থেকে।

এই চিন্তাবৃত্তি দিয়ে যে-জানা, তা হল বস্তুস্বরূপকে আত্মস্বরূপে জানা। এটা প্রাকৃত মনের এলাকায় পড়ে না। তার জানা বস্তুকে বাইরে রেখে থাওয়া করে জানা, তার বিচিত্র ধর্মের আবিষ্কার ও বিন্যাস দ্বারা নতুন-নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। এই জ্ঞান হল বৈজ্ঞানিকের—আমান্তের ব্যবহারিক জীবনের তা বুঝা সাধন। এতে উপকরণ স্থপীকৃত হয়, ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যূনতার পূরণ হয়। বস্তুকে আমরা তখন ভোগ করি, কিন্তু জানাবাসি না। ভোগে আত্মাতে আর বস্তুতে ভেদ দূর হয় না। আমি তোনাকে পাই, কিন্তু আমার অন্তরে পাই না। অথচ সেই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই এত আয়োজনের সৃষ্টি। আয়োজন ব্যর্থ হয়, অন্তরের শূন্যতা কিছুতেই পোরে না। যদি পূরত, বাইরের পাওয়াটাও তখন সার্থক হত। সে-পাওয়া তখন হত আত্মার বিনাস, অন্তরে পাওয়ারই আনন্দময় বিচ্যুতরণ।

মানসে আর অতিমানসে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আর বিজ্ঞানে এই সম্পর্ক। অতিমানসেরই মানস, বিজ্ঞানেরই ইন্দ্রিয়জ্ঞান। মন আর ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানের যন্ত্রনাত্র—ব্যবহারিক প্রয়োজনের বয়। এটি বুঝতে হল প্রাকৃত-চেতনার ধারাকে উল্টে দিতে হয়—বাঁচতে শিখতে হয় অন্তরের স্বতঃস্ফুরণের তাগিদে, বাইরের চাপে নয়। অন্তরে ঢুকতে গেলে বাইরকে হারাতে হবে, এ-আশঙ্কা বিখ্যা। যোগস্ব থেকেও কর্তব্য করা যায়, চোখ বেলেও ধ্যান হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর এমন সহজস্বপ্নি আসে, একথাও সত্য নয়। চিন্তাবৃত্তিনিরোধের জন্য যতপানি নেহনত দরকার, চিন্তাবৃত্তির উন্মেষের জন্য তার বেশী নেহনত দরকার হয় না। অভ্যাস উভয় ক্ষেত্রেই অপরিহার্য; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সাধনা শুরু করার কোথা থেকে—উপর থেকে, না নীচ থেকে। অবরোধক্রমে সাধনাই হল পূর্ণযোগের পথ। আরোহক্রম তাতে বজিত হয় না, কিন্তু তার স্থান হয় গৌণ। কি করে সে সাধনা করতে হয়, আগের অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে।

আজ পর্যন্ত মনোময়ী চেতনা আর শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে পৃথিবীতে। মনশ্চেতনার সাম্প্রতিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে জড়াত্মমী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিকাশে। এ-বুদ্ধির এখন একটা বিরোধ চলছে বোধির সঙ্গে। বোধির অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানও যে মানুষের একটা ইষ্টার্থ, একথা সে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু এ তার ছেনেমানুষী। ইন্দ্রিয়ের ইশারা অতীন্দ্রিয়ের দিকে, বস্তুর পিছনেই রয়েছে ভাব। সেই ভাবের আবিষ্করণেই মানুষের জ্ঞান ও রসবোধের সার্থকতা। একটু তলিয়ে দেখলেই এ-তত্ত্বগুলি বোঝা যায়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি যে-জীবনদর্শন রচনা করেছে, তারও একটা প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর এখানে-সেখানে আত্মার গৌরবীপ্তি ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে আজও অমানিশার রাজত্ব। মহাপ্রকৃতির প্রেরণাতেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই অমানিশার ষোর ষোচাবার তার নিয়েছে। 'মানুষ শুধু অনুর কাণ্ডান নয়' এই আশ্বাবাক্য বোঝবার আগে তার সর্বজনীন অনুভাব দূর

হওয়া দরকার। তাই প্রাকৃত জীবনকে নিরঙ্কুশ এবং সর্বুদ্ধ করবার একটা তাগিদ এসেছে মহা-প্রকৃতির মধ্যে। বাইরের অভাব যখন আর থাকবে না, মানুষ স্বভাবতই তখন ফিরবে অন্তরের দিকে। এবং ফিরবে সমষ্টিভাবে। বর্তমান যুগ সমষ্টিগত সাধনার যুগ, অদ্বৈত-বুদ্ধিকে শুধু আধ্যাত্মিক তুলায় সমাপন না রেখে সমাজ-চেতনায় ও রাষ্ট্র-চেতনায় সঞ্চারিত করবার যুগ। ননঃশক্তির সমাক্ষ স্ফুরণে এটি সিদ্ধ হলেই মাটির বুকে এবার প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিজ্ঞানঘন চেতনা এবং শক্তি। আমরা বর্তমানে আছি একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে। এখন অন্তর্গত বিজ্ঞান-শক্তিরই প্রচোদনায় ননঃশক্তিতে এসেছে এক আলোড়ন। একটা মহান্ আদর্শকে নন অভাসে অনুভব করছে, কিন্তু তাকে রূপ দিতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক বৈত-বুদ্ধি এবং আধারের অবিশুদ্ধির বশে নানা খামেলার সৃষ্টি করছে। এটা হল আগুন জলবার আগে ধোঁয়ার সৃষ্টির মত। কিন্তু ধোঁয়া থাকবে না। ইহন ক্রমেই তেতে উঠছে, এইবার আলো ফুটেবেই। পাখিব-চেতনার সমষ্টিগত রূপান্তরে এক চিদ্বীৰ্ঘনয় দেবজাতির ক্রমিক অভ্যুদয়—এই হল প্রকৃতি-পরিণামের পরের ধাপ। মহাপ্রকৃতিতে চনছে তারই আয়োজন। এই পরিণামের যিনি পুরোধা, তিনিই বিজ্ঞানঘন পুরুষ। এবার তাঁরই স্বরূপের আলোচনা করব।

পরমার্থতত্ত্বের চারটি বিভাব—সত্তা, চেতনা, আনন্দ এবং শক্তি। সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তিই হল অতিমানস। অতিমানসশক্তিযুক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দের ঘনবিগ্রহকে আমরা বলি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম সর্বাস্তর্যামী। বিজ্ঞানঘন পুরুষ পুরুষোত্তমেরই প্রকট বিভূতি। তিনিও সচিচিদানন্দঘনবিগ্রহ এবং অতিমানসশক্তিযুক্ত। তাঁর আত্মসংবিত্তে সৎ-চিৎ-আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব—তাঁর চেতনার চক্রে-চক্রে, প্রাণশক্তির প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রতিটি কোষে পুরুষোত্তমের দিবা আবেশ।

আত্মানুভবের তিনটি প্রকার (mode) নিম্নে অনুভব করা জীবরূপে, বিশুরূপে এবং বিশ্ণুতীরূপে; অর্থাৎ আপনান মাঝে গুটিয়ে থাকা, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়া, আবার সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়া। অনুভবের এই তিনটি প্রকারই বিজ্ঞানঘন পুরুষের মাঝে সহজ এবং স্বতঃসিদ্ধ। তিনি আপনাতে আপনি আছেন; এইখানে তিনি উপনিষদের ভাষায় 'আত্মরতি', তিনি সিদ্ধ জীব। আবার তিনি আছেন বৈশ্বানর হয়ে সবার মাঝে; তখন তিনি 'আত্মকীড়'—ঘটে-ঘটে রমনাণ হয়ে আপনাকেই অনুভব করছেন চিৎশক্তির বিচিত্র উন্মাদে। আবার তিনি প্রপঞ্চাভিত নিকল শিবস্বরূপ। এনি করে তাঁর মাঝে ঘটে জীবশক্তি বিশুরক্তি এবং স্বরূপশক্তির সামরগ্য। জীবরূপে তিনি জগতে থেকেও এবং জগতের হয়েও তার উর্ধ্বে নিত্য অধিকৃত রয়েছেন বিশ্ণোত্তীর্ণ স্বরূপচেতনায়। অর্থাৎ যুগপৎ তিনি 'অপোরণীয়ান্' এবং 'বহতোমহীয়ান্'—আবার পরম শূন্যতা।

বিজ্ঞানধন পুরুষ মূর্ত, অর্থাৎ চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির তিনি ধনবিগ্রহ। এই মূর্ত্যই তাঁর সত্যের 'রহস্যানুত্তম'। প্রাকৃত পুরুষও মূর্ত; সুতরাং তার সঙ্গে প্রতিতুলনায় বিজ্ঞান-ধন পুরুষের স্বরূপ বোঝা হয়তো কতকটা সহজ হবে।

মূর্ত্যের একটা লক্ষণ হল সংহততা অর্থাৎ মূর্তির মাঝে শক্তি বা ভাব যেন জমাট বেঁধেছে বলে আমরা অনুভব করি। যা সংহত, প্রত্যক্ষের কাছে তা স্পষ্ট, কেননা তার অনুভবের মাঝে একটা তীক্ষ্ণতা আছে। অনুভবের তীক্ষ্ণতা আমাদের কাছে মূর্ত অস্তিত্বের মাপকাঠি। একটা-কিছু আছে বলে তখনই মনি, যখন তা আমার চেতনাকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। আঘাতক বস্তুটি মূর্ত, কিন্তু তার মূর্ত্যের প্রমাণ আমার চেতনার তীব্রতায়। যদি আমার দিক থেকে দেখি, তাহলে বলতে পারি, অনুভবের তীব্রতাই আমার মূর্ত্য।

আমার চেতনা বাইরের অভিঘাতে একটি কেন্দ্রে সংহত হচ্ছে। সেই কেন্দ্রে আমি মূর্ত। এই মূর্ত্যকে বলি আমার অহং।

অহংএর মূর্ত্যই আমার কাছে বুঝ্য। আমার বাইরে একটা জগৎ আছে, আমার চেতনাকে সে আঘাত করে বলে সেও মূর্ত। কিন্তু তার মূর্ত্য গোপ, কেননা আমার চেতনার সংস্পর্শে না এলে আমি তার অস্তিত্ব জানতে পারি না।

আমি যেমন আছি, তেমনি আমার বাইরেও অসংখ্য জীব আছে। আমার নত তাদেরও বাহ্যমূর্তির কেন্দ্রে একটি তীব্র সচেতন অহং আছে। কিন্তু আমার অহংএর সঙ্গে তাদের অহংএর যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। আমি তাদের বাইরের মূর্তিটাই চিনি, ভিতরের মূর্তিটাকে চিনি না।

অথচ চেনবার দরকার হয়, ইচ্ছাও হয়। অবশ্য একেবারেই যে চিনি না, তাও নয়। আমাকে দিয়েই তাদের চিনি, ধরে নিই তারা আমারই মতন। কিন্তু এমনতর চেনার মাঝে অনেক ভুল অনেক গোঁজামিল থাকে, পদে-পদে তা ধরাও পড়ে। আমিই যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে চিনি না, সুতরাং আমার তুলনায় অপরকেই-বা পুরাপুরি চিনব কি করে?

কিন্তু আমার অহংও তো স্বাধীন নয়, সেও বাড়ছে। তার বৃদ্ধিতে অনুভবের যেমন প্রসার ঘটছে, তেমনি ঘটছে সংহতি। এটা হল বৃদ্ধির বাইরের দিক। ভিতরের দিকে ঐ সংহতিরই অনুবৃত্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে নতুন-একটা বৃত্তি—আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতনতা প্রথমটায় ফিকে থাকে, কিন্তু প্রকৃতির ষাট-প্রতিঘাতে ক্রমেই তা সংহত ও বিষয়নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমার মূর্ত অহং রূপান্তরিত হয় মূর্ত আত্মাতে। আত্মসত্তার মূর্ত্যই যোগের লক্ষ্য।

বাইরে জগৎ, ভিতরে অহং, তারও গভীরে আত্মা। এই পরম্পরার মাঝে চিন্ময় মূর্ত্যের একটা ক্রমিক উৎকর্ষ আছে। আত্মা অনূর্ত নয়, চিৎস্বয়—এই অনুভবে যদি

প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহলে অহংকে অনুভব হয় তাঁর বিচ্ছুরণরূপে। বিচ্ছুরণে বৈচিত্র্য আছে, তা আত্মারই বিভূতি। কিন্তু সমস্ত বিভূতি সংহত হয়ে আছে এক ঐশ্বর-যোগে। আত্মা সূর্যের মত, অহং তাঁর রশ্মিজাল। প্রাকৃত অহংএ যে অনুভূতির তীব্রতা বা চিৎশক্তির বিদ্যুৎসিক্তি, তা ঐ সৌরবিশ্বের পানেই প্রাকৃত-চেতনার উৎস্রব। অজ্ঞানে আমরা তা বুঝতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞানে বোঝা যায়। প্রকৃতির ষাট-প্রতিষাটে স্বনকে-স্বনকে চিৎগিরি শিখা লেলিহান হয়ে উঠছে—এই হল বিশ্বলীলার তাৎপর্য। বিজ্ঞানঘন পুরুষ এই লীলার বোঝা, ভর্তা এবং ভোক্তা—বিদেহী হয়ে নয়, দেহী হয়ে। এই তাঁর চিন্ময় বৃত্তি। তিনি যুগপৎ অমানব, অথচ 'মানুষীঃ তনুশ্রিতঃ', প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণামের তিনি পরম চমৎকার।

বিজ্ঞানঘন পুরুষ যখন আত্মকেন্দ্রে সনাতিত, তখন উপনিষদের একটি পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি তিনি 'জীবঘন' অর্থাৎ জীবলীলার যত বৈচিত্র্য সমস্তই সংহত হয়েছে তাঁর নাথে এবং সে-লীলার চরম উৎকর্ষও তিনি। একদিকে বিশ্ব, আরেকদিকে বিশ্বেত্তর—দুয়ের নাথে তিনি সেতু। বিশ্বজীব তাঁর কায়বৃহৎ, তাঁর চিন্ময় জীব-স্বরূপের বিচিত্র বিভূতি আর বিশ্বেত্তর তাঁর অকাগ-স্বরূপ। বিশ্বেত্তরের প্রতি তাঁর যে-প্রীতি, তা-ই বিশ্বজীবে ছড়িয়ে পড়ে মৈত্রীভাবনার স্বত-উৎসারণে। তাঁর হয়েই তিনি সবার—এই হল তাঁর নাথে সৰ্ব্বভূতের পরম চমৎকার। তিনি আপনাতে আপনি আছেন—এই তাঁর প্রাকৃত রূপ। এইরূপে তিনি বিশ্বের একজন। কিন্তু তা বলে তিনি বিশ্ব হতে বিযুক্ত নন। প্রদীপের শিখা যেমন নিজের নাথে সংহত থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, তিনিও তেমনি আত্মবিচ্ছুরণের আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে হৃদয়ের বেদনায়, ইচ্ছার সংবেদনে—এমন-কি দৈহ্য-চেতনার নিবিড়তাতেও। অথচ এমনি করে বিশ্ব-ভুবনকে আত্মচেতনায় জারিত করেও তিনি বিশ্বেত্তর, অতএব শূন্যস্বরূপ। তিনি একাধারে জীবঘন, বিশ্বরূপ এবং অরূপ। তাঁর আনন্দ-চেতনা যেমন ব্যক্তির বিগ্রহে ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিশ্বাত্মিকা চেতনার ভাস্বরভায়, আবার নিলীন হয়ে গেছে বিশ্বে-জীর্ণের পরঃকৃষ্ণ শূন্যতায়। তাই বৈদিক ঋষির দর্শনের অনুসরণ করে তাঁকে বলতে পারি 'বৈশ্বানর' পুরুষ।

এই গেল বিজ্ঞানঘন পুরুষের অন্তশ্চেতনার বা স্বরূপের পরিচয়। কিন্তু এ-স্বরূপ নিঃশক্তি নয়, স্বভাবতই চিদ্ব্যক্তিতে তাঁর বীর্ষের স্ফুরণ হয়। এখন আমরা তারই কথা বলব।

পরমার্থ-সৎ যেমন এক, তেমনি আবার বহুও। একের বহুতে ছড়িয়ে পড়া, আবার বহুর একে গুটিয়ে আসা—এই দুটি ছন্দে চলছে শক্তির লীলা। শক্তির প্রকাশ যেমন

প্রজায়, তেননি সঙ্কল্পে। প্রজ্ঞা এবং সঙ্কল্প আত্মস্বরূপের দুটি মুখ্য চিন্তাবৃত্তি। একটি অস্তরে সৌম্যন্যের প্রতিষ্ঠা করে, আরেকটি তাকে অভিযাজ্ঞ করে বাইরে। বহর সন্দেহ একের সম্পর্ক হতেই দুয়ের উদ্ভব।

বাইরের জগতের বিচিত্র অভিঘাত থেকে অস্তরে বিচিত্র প্রত্যয়ের আবির্ভাব হচ্ছে। চিন্তের বাসনা এবং সংস্কার অনুযায়ী এই বৈচিত্র্যের মাঝে আনন্দা একটা ছন্দ ও সংহতি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি। প্রাকৃত-চেতনা ব্যাপক নয় বলে বিশ্বের সবটুকু সে দেখে না বা বোঝে না। তাই বাইরে থেকে যেসব উপকরণ তার কাছে এসে হাজির হয়, তার মাঝে বাছাই-ছাঁচাই করতে হয়। তা থেকে জাগে অনুকূল এবং প্রতিকূল বেদনা বা স্বপ্ন ও দুঃখের দ্বন্দ্ব। স্বপ্ন অস্বাস্থ্যকর, তাহতে স্রষ্টা হয় পীড়ার। প্রাকৃত-চেতনা খণ্ডিত এবং দ্বন্দ্বসঙ্কুল, অতএব পীড়িত। প্রজ্ঞা সেখানে আচ্ছন্ন।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনা অনন্তে সনাপন্য এবং সর্বগ্রাহী। তাই তার মাঝে অবিরোধে সব-কিছুর ঠাঁই হতে পারে। চেতনার ব্যাপ্তির সন্দেহ বিকোভের একটা বিষমানুপাত আছে। চেতনা যতই ছড়িয়ে পড়ে, ততই তার মাঝে ক্ষোভের তীব্রতা কমে আসে—এটা আনন্দা প্রাকৃত অনুভব দিয়েও বুঝতে পারি। একার দুঃখ অসহন হয়, কিন্তু দশের জন্য দুঃখবরণে দুঃখকে ছাপিয়ে জাগে আত্মপ্রসাদ। এইখানে দেখছি, প্রাকৃত রীতির বিপর্যয়। সঙ্কীর্ণ চেতনা আঘাতের বদলে প্রত্যঘাত করে; তাইতে বেদনার স্রষ্টা হয়। কিন্তু পরিব্যাপ্ত চেতনায় আঘাত তুলিয়ে যায় মত্তার গভীরে। তাতেও আলোড়ন জাগে—কিন্তু সে-আলোড়ন সন্দেহের বৃক্ক বীচিভেদের মত, তার মাঝে অসহন উদ্ভানত নাহি। এইখানেই প্রাকৃত দুঃখকে অপ্রাকৃত প্রসঙ্গতায় রূপান্তরিত করবার সঙ্কেত খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনা আপূর্ণমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সন্দেহবৎ। বিশ্বপ্রকৃতির তরঙ্গ তাতে উঠে তাতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, স্রষ্টা করছে আনন্দের ছন্দ। এই তাঁর প্রজ্ঞার রূপ।

এই-যে প্রজ্ঞা এবং আনন্দ, এ শুধু শক্তির নিবেশ-রূপ নয়, তার সন্দেহ জড়িয়ে আছে তার উন্মেষ-রূপও। পরনার্থ-সত্তার গভীরে যে আপনাত্তে-আপনি-ধাক্কা আনন্দ, তারই উচ্ছলন এই জগৎ। সে-জগতের একটা লক্ষ্য আছে—অন্তহীন প্রপঞ্চের উন্নাসে আবার ঐ স্বরূপানন্দে ফিরে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, এ ফিরে-যাওয়া শুধু উপশম নয়—উন্নাস, একের মাঝে শুধু তুলিয়ে যাওয়া নয়,—একের অন্তর্গত মহিলাকেই অনন্ত বৈচিত্র্যে স্ফুরিত করা। প্রকৃতির ক্রমাতিব্যক্তিতে চলছে এই স্ফুরণের তপস্যা। অস্তরে আলো, বাইরে আঁধার—এই হল স্রষ্টার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত। সেই আলোই আঁধারকে তরলিত করে বাইরে ফুটেছে—এই হল তার পরের পর্বে উদয়নের মহিমা। তা-ই প্রজ্ঞার সঙ্কল্প-রূপ, উপনিষদ্ যাকে বলেছেন ব্রহ্মের ‘জ্ঞানময় তপঃ’।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের প্রজ্ঞার স্ফুরণ তাঁর সত্যসঙ্কল্পের গিহবীর্যে। প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্পে সেখানে কোনও ভেদ নাই। তাঁর প্রজ্ঞা সৃষ্টিধরী। সবিতা শুধু প্রকাশই করে না, তাপও দেয়; সে-তাপে প্রাণের স্ফুরণ হয়, মাটির বুকে ফল ফোটে, জলে আলোর রংমশাল। তেমনি বিজ্ঞানঘন পুরুষেরও প্রজ্ঞায় আছে শুধু আত্মানুভাবের আনন্দই নয়, সে-আনন্দকে আধারে-আধারে সংক্রান্তি করবার বীর্যও। এই তাঁর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য বা গুরুত্ব। তিনি ধীর-প্রচোদক—সবিতার মত। উর্ধ্বে মহাশূন্য, অব্যক্তের রহস্যে নিখর; নিম্নে পৃথিবীর বুকে চনছে প্রাণের তপস্যা। বিজ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্কল্প দুয়ের মাঝে সান্বিতী-দ্যুতির দীপনী। তাঁর প্রজ্ঞা স্ফুরিত হয় সঙ্কল্পে, তাঁর সঙ্কল্প রূপ নেয় সিদ্ধকর্মে। সে-কর্ম প্রকৃতির তড়িনায় নয়, আত্মসত্যের প্রেরণায়। বাইরে একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলবার ক্লিষ্ট প্রচেষ্টা তা নয়, তা অন্তরের শক্তিকে সহজের মুক্তচ্ছন্দে উৎসারিত করা। তাঁর কর্ম বিসৃষ্টি। যে-সঙ্কল্প বিশ্বের নূলে, তাঁর সঙ্কল্প তারই অভিযুক্তি। সে-সঙ্কল্পের একটীমাত্র ধারা—জড়ের গহন হতে চেতনার স্ফুরণ, লোকোত্তরের প্রচোদনায় বিশ্ব-কমলের চিন্ময় উন্মীলন। বিজ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্কল্পেরও এই ধারা। আনন্ত্যের চিহ্নন দ্যুতি হয়ে সবার মাঝে সব-কিছুর মাঝে তিনি আলো ফুটিয়ে চলেছেন। তাঁর এই আত্ম-বিকিরণের তপস্যা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ। তা-ই তাঁর দিব্যকর্ম। তাঁর সামান্য-তন ব্যাবহারিক কর্মের নূলেও ঐ দিব্যভাবনারই প্রেরণা।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞানঘন পুরুষের ব্যবহারে ধর্মার্থের স্থান কোথায়? জবাবে বলা চলে, বিজ্ঞানঘন পুরুষ যখন শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর কর্ম যখন চিহ্নন ব্যক্তিসত্ত্বের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ অভিযুক্তি, তখন তার মধ্যে ধর্মার্থবোধের বা তালমন্দের কোনও স্থান কি সমস্যার কথা ওঠে না। বন্দ দেখা দেয় অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের মাঝে, কেননা সেখানে চনছে সঙ্গীর্ণ অহং-এর পেনা। অহং-এ-অহং-এ বিরোধ যেখানে, সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি। কল্যাণের আদর্শ তোমারও আছে, আমারও আছে,—কিন্তু আমরা কেউ সমগ্র সত্যের সবটুকু দেখতে পাই না বলে আদর্শে-আদর্শে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাইতে যুগে-যুগে আদর্শ বদলায়ও। অবশ্য এরও মধ্যে প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণামের ভাগিদে চেতনার প্রসার ঘটে বলে আমাদের আদর্শবোধও ক্রমে উজ্জ্বল হতে থাকে। কিন্তু ভবুও বন্দ একেবারে ঘোচে না। কাঠে আগুন ধরতে গিয়ে প্রথম ধোঁয়া এবং তারপর ফোটে তাপ আর আলো। প্রাকৃত-চেতনায় ধর্মবোধের অভিযুক্তিও হয় এমনি করে। সেখানেও কর্ম আত্মপতিরই বিচ্ছুরণ, কিন্তু আত্মদৃষ্টি স্বচ্ছ এবং উদার নয় বলে কর্মে আয়াস এবং তার ফলে বন্ধের সৃষ্টি হয় অবশ্যজ্ঞাবী। কিন্তু সবিতার তেজ সত্ত-উৎসারিত; তার মাঝে আত্মবিচ্ছুরণের ক্লেহতা বা আচ্ছন্নতা নাই। সে-তেজও বেষ্ট সৃষ্টি করে, জড়ের গহনে নিঃশেষে সঙ্কুচিত করে।

কিন্তু তবুও সে আশ্চর্যরূপে প্রভাসর, আপন স্বষ্টির 'পরে তার ইশনা অকুণ্ঠ'। পৃথিবীতে দিন-রাত ঘটে পর্যায়ক্রমে, সেখানে আলো-আঁধারের একটা দৃশ্য আছে। কিন্তু সূর্যে কেবলই আলো এবং পৃথিবীর আঁধার সে-আলোরই একটা তির্যক ডগ্গি।

বিজ্ঞান-ঘন পুরুষের চেতনাতেও এই সাবিত্রী-দীপ্তি। স্বতরাং আলো-আঁধারের দৃশ্য তাঁর মাঝে নাই। অথচ প্রাকৃত-চেতনায় আঁধার আছে। সে-আঁধার বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিশুদ্ধচেতনারই কুস্কিগত। তিনি তেজস্বী, অতএব তিবিরাস্তক; আঁধারের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক। এই তাঁর সুদক্ষিণ রূপরূপ। আমরা তাকে বলতে পারি, আমাদের অনিষ্ট-দর্শনের দ্বিবা রূপান্তর। প্রাচীনেরা তা-ই বলতেন। যিনি শিব, তিনিই রুদ্র। কিন্তু রুদ্র তো অশিব নন। আমাদের অবিদ্যাক্রিষ্ট চেতনাতেই তিনি 'ষোর', স্বরূপত তিনি অষোর।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের সমস্ত কর্মই এই শৈবী-চেতনার উৎসারণ। বাইরে তার যে-রূপই থাক না কেন, বস্তুত তার একমাত্র লক্ষ্য অদ্বারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। স্বতরাং বাইরে থেকে প্রাকৃত-চেতনার সীমিত আদর্শবোধ দিয়ে তাকে বিচার করলে চলে না। মহাত্মনেরা তাই বলেন, 'তাঁর ক্রিয়া-মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝ্য'। এদেশের বৈদান্তিকও বলেনছেন, 'নিষ্ক্রেণ্ডণের পথে যিনি বিচরণ করছেন, তাঁর কোথায় বিধি কোথায় নিষেধ? তাঁর পাপ পুণ্য কিছুই নাই।' কথাটা শুনে সাংঘাতিক, কিন্তু তবুও সত্য। বিজ্ঞানঘন পুরুষের পাপ-পুণ্যের দায় নাই অথচ তিনি অশিবনাশন, শিবস্বরূপ। নৌকিক পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা মনঃকল্পিত। মন কোনও কর্মকেই বিশুদ্ধতার পটভূমিকায় রেখে দেখে না। তবুও যখনই তার দৃষ্টির প্রসার ঘটে, তখনই পাপ-পুণ্যের মানের বদল হয়। নরহত্যা পাপ,—কিন্তু রাজা যখন নরঘাতককে প্রাণদণ্ড দেন, তখন লোকে তাকে পাপ বলে না। কেননা সেখানে বিচার হয় ব্যাটির স্বার্থের দিক থেকে নয়, সমষ্টির কল্যাণের দিক থেকে। বৈদিক ঋষি তাই পাপের সংজ্ঞা দিলেন, 'অশনাতা বৈ পাপা'—খাই-খাই করাটাই পাপ; অথবা বললেন, হৈতবোধই পাপ, যেখানে বৃহৎ প্রাণের বিচক্ৰ প্রকাশ সেখানে পাপ নাই। অর্থাৎ পাপের উৎপত্তি অবিদ্যাক্রিষ্ট অহং হতে। বিজ্ঞানঘন চেতনা অহং-নির্মুক্ত, বিশুদ্ধ এবং বিশোধিতীর্ণ, স্বতরাং তা 'ভক্তন্ অপাপবিক্রন্'। বিজ্ঞানঘন পুরুষে দূকৃত নাই, অথচ তিনি দূকৃতের বিনাশক। তাঁর এই অশিবনাশন রুদ্র রূপকে আমরা বুঝতে পারি না। বন্দ-বুদ্ধি বলে ঈশ্বরে যেমন বৈধব্য আর নিষ্ঠুরতার আরোপ করি, তেমনি করি তাঁর বেলান্তেও। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পক্ষে তা স্বাভাবিক। বস্তুত বিশুদ্ধপদর্শনের আগে কুরুক্ষেত্রের তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় না, কার্পণ্যোপহতস্বভাব ধর্মসম্মু-চেতার চিন্তে পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা ঘুলিয়ে যায়।

এইখানে আরেকটা প্রশ্ন উঠতে পারে: বিজ্ঞানঘন-পুরুষের চেতনা যদি বিশুদ্ধ ও বিশোধিতীর্ণ হয়, তার মাঝে কি ব্যক্তিসত্তার কোনও প্রকাশ হয় না? কেউ-কেউ বলেন,

হয় না। অহস্তার নির্বাণে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রলয় ঘটে। নুনের পুতুল সমুদ্রে নামলে নোনাঙ্কলের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। সত্যাদর্শনের পর দেহপাত হওয়াই স্বাভাবিক। তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, মুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে ফিরে আসেন শুধু অবিদ্যাশাসিত প্রারঞ্জন জের চাঁনবার জন্য। বস্তুত তাঁর আত্ম-সত্তাই আছে, ব্যক্তি-সত্তা নাই, তাঁর লোকব্যবহার মায়িক।...এ-মতের সনালোচনা আমরা অন্য-প্রসঙ্গে আগেই করেছি। বলেছি, এ-শুধু সত্যাদর্শনের আধখানা মাত্র। ‘ব্রহ্ম সত্যং, জগন্ মিথ্যা’—উত্তরা-পথের এই-যে মহাবাক্য, এ শুধু তারই বিবৃতি। ‘সর্বং বলিদং ব্রহ্ম’—অনুভবের এই উত্তরার্থও আছে। এটুকু না জানলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থও হয় না, পরম উপনজির মাঝেও অবিদ্যানের বৈতসংস্কার নুকিয়েই থাকে। নেতিবাদ শুধু ওণাতীতকেই নানে এবং তার প্রতিযোগিরূপে নানে ব্যানিশ্র গুণক্রিয়াকে। কিন্তু ওণাতীততা আর গুণ-বিকোভের মাঝে আছে শুদ্ধস্বের বা অতিমানসের ভূমি। সেখানে রজস্তমের মালিন্য তিরোহিত হয়ে প্রশান্ত বীর্ঘ্যে ঘটে তাদের রূপান্তর। বিজ্ঞানঘন পুরুষের প্রকৃতি এই শুদ্ধ-স্বের বিভূতি। তিনি ওণাতীত, অখণ্ড শুদ্ধস্ব। এই শুদ্ধস্ব চিদ্বন-বিগ্রহের স্রষ্টা করে, যার কথা আগেই বলেছি। স্তূতরাং বিজ্ঞানঘন পুরুষ বিশ্বাত্মক এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়েও তাঁর শুদ্ধস্ব আত্মপ্রকৃতি হতে গড়ে তোলেন ব্যক্তিস্বের একটা বিভূতি। অবতারেরও এই রহস্য—অব্যাক্তা ভূতবহেশ্বর হয়েই স্বীয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আত্মমায়ার দ্বারা সজ্জত হওয়া।

বিজ্ঞানঘন-বিগ্রহ অতিমানব এমনিতর চিন্ময় পুরুষ বটে, কিন্তু তবুও তাঁর ব্যক্তিস্বের একটা নির্দিষ্ট ছক কল্পনা করা যায় না। একটা আড়ট কাঠানোতে আটকা পড়ে অবিদ্যা-চছনু অহং-চেতনা। কিন্তু যাঁর অহং শুদ্ধ অর্থাৎ বিশোধীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক হয়ে তবে জীব-ভূত, তাঁর ব্যক্তিস্ব থাকে একটা অবক্ষন সারলীনতা। তিনি সব হয়ে আবার সবাইকে নিজের সত্তার গভীরে আকর্ষণ করছেন এবং এক মহারাগচক্রে দিবা আত্মবিভূতিরূপে তাদের আত্মদান করছেন। স্তূতরাং একদিকে তিনি যেনন সনন্ত ব্যক্তিস্বের সমাহার, তেমনি আরেকদিকে দেশকালপরিচ্ছিন্ন লীলামানুষবিগ্রহ বলে তাঁর ব্যক্তিস্বের একটা অনন্যাতাও আছে। কিন্তু সে-অনন্যাতা প্রাকৃত ব্যক্তিস্বের মত ব্যাবর্তক (exclusive) নয়। এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিস্ব সমুদ্রবৎ—সমুদ্রের তরঙ্গই নয় শুধু। অমূর্ত দিবা-পুরুষেরই তিনি স্বপ্রকাশ মূর্ত-বিগ্রহ।

ব্যক্তিস্ব বস্তুত কতগুলি চিদ্বস্তুর একটা সংহতি। দেহ প্রাণ এবং মনের আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ। প্রাকৃত-ভূমিতে দেহ-প্রাণ-মনের স্বভাব ও সামর্থ্য কৃষ্টিত থাকে, যদিও স্বচ্ছন্দে নিজেদের ফুটিয়ে তোলবার একটা গভীর আকৃতিকও তারা বহন করে চলে। এই

আকৃতি তারা সার্থক করতে চায় বাইরের উপকরণকে আশ্রয় করে। তাই মানুষের মাঝে দেখা দেয় ভোগের তৃষ্ণা। তাতে দেহ-প্রাণ-মনের স্থূল তর্পণই হয়, কিন্তু আকৃতির পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘটে না। দেহ-প্রাণ-মনের উর্ধ্ব রয়েছে বিজ্ঞান। ভোগ যদি বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাপিত হয়, তাহলে স্থূলত্ব ঘুচে গিয়ে তার চিন্ময় রূপান্তর ঘটেতে পারে। উপনিষদের ঋষি একেই বলেছেন অদ্ব প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনের আপ্যায়ন বা ধাতুপ্রসাদ (luminosity of substance)। বিজ্ঞানজন পুরুষের শুদ্ধস্বয় ব্যক্তিত্বের সহজ বিভূতি হল এই ধাতুপ্রসাদ। তাতে দেহ-প্রাণ-মনের স্বভাব ও সামর্থ্যের নিগ্রহ কি উচ্ছেদ ঘটে না, ঘটে তাদের অন্তর্গত আকৃতির সার্থকতা।

প্রাকৃত-মন সব-কিছুই জানতে চায়, কিন্তু পুরাপুরি জানতে পারে না। অজ্ঞানার গভীরে চলে তার জ্ঞানার কচ্ছপাখ্য অভিযান। কিন্তু বিজ্ঞানজন পুরুষের মন জানে বাইরের অজ্ঞানাকে আবিষ্কার করে নয়, অন্তরের জানাকেই প্রকট করে। এইটি জ্ঞানার অবরোধ-ধারা। যোগীর সমাধি-প্রত্যায়নও আবির্ভাব হয় এই রীতিতে। অথও হতে খণ্ডের দিকে নেমে আসা, সত্যের বিভূতিক্রমে তথ্যকে জ্ঞান—এই হল বোধির কাজ, বিজ্ঞানজন-পুরুষের মনোবৃত্তিতে যার সহজ স্ক্রুণ। আবার বোধির দ্বারা সত্যের অনুভবই নয়, অনুভূত সত্যকে ব্যবহারের ক্ষণতে মূর্ত করবার দিব্যপ্রতিভাও জাগে তাঁর মধ্যে। বোধির অসঙ্কুচিত উন্মেষে তখন তাঁর মন হয় সত্যাকার জীবনশিল্পী।

এমনি করে বিজ্ঞানের জারণায় ঘটে প্রাণেরও রূপান্তর। প্রাণ চায় ভোগ আর ঐশ্বর্য অর্থাৎ বেদনা (feeling) আর সঙ্কল্পের (will) নিরঙ্কুশ তর্পণ। তারই জন্যে তার যত বুড়ুকা, বিদ্রোহণা আর উপকরণ-সঙ্কলের দুরাগ্রহ। বহির্মুখ প্রাকৃত-চিত্তে এই দুরাগ্রহের পরিভূষ্টি কখনই হয় না, হলেও তা স্থায়ী হয় না। প্রাণবাসনা চৈতন্যেরই ধর্ম এবং তার সার্থকতা ঘটেতে পারে একমাত্র চৈতন্যের উন্মেষে। বাসনার বন্ধকে বাইরে নয়, অন্তরে পেতে হবে, পেতে হবে ভাবরূপে। ভাব যেখানে গভীর, বস্তুর আত্মদানও সেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে, এটা আনন্দ প্রাকৃত অনুভব হতেই বুঝতে পারি। বিজ্ঞানজন পুরুষের অন্তরবৃত্তির ধারা আরোহী নয়, অবরোহী—একথা অনেকবার বলেছি। তাঁর ভোগ আর ঐশ্বর্যের বেলাতেও তা-ই। আনন্দ আর বীর্য তাঁর স্বভাবের ধর্ম—তারা তাঁর বেলায় বস্তুনির্ভর নয়। তিনি স্বত-উৎসারিত দিব্যসত্ত্বোৎসর্গ আর দিব্যসঙ্কল্পের মূর্ত বিগ্রহ। সবিতার মতই তাঁর আলো, আনন্দ আর শক্তি সত্যের গভীর উৎস হতে ভুবনের আকারে বিকীর্ণ হয়। যে-পরমপুরুষের বিষ্ণুটি এই জগৎ, যার প্রজ্ঞা আনন্দ ও কামনার ক্ষুরভা এই বিগ্ৰহভবনে, বিজ্ঞানজন পুরুষ তাঁরই সমধর্মী। তাই তাঁকে আশ্রয় করেই পৃথিবীতে ঘটে মহাপ্রাণ মহা-প্রকৃতির উদ্বোধন ও সম্প্রসারণ, তাঁর সকল সৃষ্টিই হয় শান্ত শক্তি দীপ্তি শ্রী ও তত্ত্বভাবের

(reality) সার্থক রূপায়ণ। এমনি করে তাঁর প্রাণের তর্পণ হয় অবস্থা দিব্যাসক্তত্বেরই উদ্ভাসে।

অভিমানস-চেতনার এই সিদ্ধি বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্থূল দেহেও সংক্রামিত হয়। তখন তাঁর দেহাবোধ হয় এক লোকান্তর সিদ্ধ-চেতনার বাহন। পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে দেহ জড় ; কিন্তু প্রতাক্ (subjective) দৃষ্টিতে দেহ প্রাণময় বোধ। প্রাক্ত ভূমিতেও দেখি, চেতনা ঘনীভূত হয় দেহে, দেহাশ্রিত বোধই আমাদের মাঝে সব-চাইতে তীব্র। প্রাক্ত-চেতনায় এই তীব্রতা সক্ষীর্ণ এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর ; তাছাড়া দেহ জীবে-জীবে ব্যবধানেরও একটা হেতু। তাই অধ্যাত্মসাধনার প্রথম প্রয়াস হয় দেহবোধকে ছাপিয়ে ওঠা, 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ে' চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই থেকে দেহের প্রতি একটা ছুঁপ্সার (recoil) ভাবই সাধারণত সাধকদের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুত দেহ তো উপেক্ষণীয় নয়। বিদেহভাবনার সিদ্ধির দ্বারা আমরা যদি তার সঙ্কোচ বোচাতে পারি, তাহলে সেই ব্যাপ্ত-চেতনার ভাবনাকে ঘনীভূত করে আবার দেহেও তো সংক্রামিত করা চলে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের বেলায় এইটি ঘটে। তাঁর মাঝে দেখা দেয় দেহাব-ভাবনার একটা চিন্ময় ভঙ্গি,—তাঁর দেহ জড় নয়, চিদ্মন। জড়-প্রকৃতিকে নিরাক্ত না করে তাকে স্বচ্ছন্দ এবং নিঃশেষে অঙ্গীকার করবার সামর্থ্য থেকে তাঁর মাঝে এক অভিনব কায়সম্পদের (physical perfection) আবির্ভাব হয়। জড়কে চিন্ময় করা অর্থাৎ তার অসাড়তা ছুটিয়ে চিদৈশ্বর্যের বাহন করা—প্রকৃতির এই তপস্যাই তো চলছে জগৎ জুড়ে। জীবের দেহে প্রাণ আর চেতনার উন্মেষ তার নিদর্শন। উন্মেষ এখনও পূর্ণসিদ্ধ হয়নি, অথচ তার একটা আকৃতি এই দেহকে আশ্রয় করেই চলছে। তাতে দেহকে প্রথমে বাধা বলে মনে হতে পারে—যেনন ভিজা কাঠ আগুন জ্বলবার পক্ষে প্রথম একটা বাধা। কিন্তু কাঠে আগুন আছেই। সে যখন জ্বলে ওঠে তখন কাঠ আর কাঠ থাকে না, বাইরে-ভিতরে সে আগুন হয়ে যায়। তখন তার জড়ত্বের অর্থ আগুনের জমাট বাঁধা। দেহের সঙ্গেও চেতনার এই সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানঘন পুরুষের দেহও এমনি করে চিদ্মন বিগ্রহ হয়ে ওঠে। তাঁর মূর্ত্তবই যে স্বরূপের পরম এবং গুহ্যতম রহস্য একবার ইঙ্গিত আগেও করেছি।

এই চিদ্মন বিগ্রহ হ'তেই জড়জগতের সঙ্গে তাঁর একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রাক্ত-ভূমিতে দেহাশ্রিত জীবচেতনা পরস্পরের কাছে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু চিদ্মন বিগ্রহে এই আড়াল ছুচে যায়। বিজ্ঞানঘন পুরুষ বস্তুত বিগ্রহবিগ্রহ। যেন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সবিভা, সমস্ত নগলটি তারই জ্যোতিঃশক্তিতে উদ্ভাসিত বিগুট এবং সঞ্জীবিত, বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিগ্রহও তেমনি সমগ্র পাখিব-চেতনার একটা শক্তিকুট। তিনি

জীবন, নিম্নলি জীব তাঁরই কোষস্থানীয়। বিশ্বে ব্যাপ্ত নিরাট পুরুষের তিনি হৃদয় বা মূর্ধা তাঁরই চিন্তন বিগ্রহের কেন্দ্র হতে বিশ্বের নাড়ীতে-নাড়ীতে চলেছে চিৎশক্তির সংক্রমণ। আনন্দের হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে যেমন বিচিত্র ভাব গুটিয়ে আসে আবার ছড়িয়ে পড়ে, বিশ্বভূতের সমস্ত চিৎস্পন্দও তেমন বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিগ্রহে সংহত এবং বিকীর্ণ হয়। এই তাঁর কায়সিক্তির চরম চমৎকার।

এই গেল বিজ্ঞানঘন পুরুষের আত্মসমাহিত বিমুচেতনার পরিচয়। কিন্তু তিনি যেমন বিমু, তেমনই আবার সিদ্ধও। যেমন তিনি আছেন বিগ্রহে, তেমনই আছেন বিশ্বে। লোকলোকান্তরের সঙ্গে অধিচেতনার যে স্বাভাবিক সঙ্গ রয়েছে, তার সম্যক অনুভব তাঁর চেতনাকে করবে জড়োত্তীর্ণ। বিগ্রহে থেকেই তাঁর শক্তি সৌরচ্ছটার মত জগতে কাঙ্ক্ষ করবে চিন্ময়-ভাবনার নিগূঢ় বীর্ঘ নিয়ে। সমগ্র বিশ্বের অঞ্চল নিগূঢ় প্রজ্ঞানই তাঁর সে-ভাবনার উৎস। তা এক ঋতন্তরা প্রজ্ঞার সংবেগে বিশ্বের জড়-লোক প্রাণ-লোক ও মনো-লোকের পূর্ণবীর্ঘকে উন্মোচিত এবং নিরোজিত করবে এই জড়বিশ্বের চিন্ময় অভ্যুদয়ের সাধনায়। এই তাঁর সার্বভৌম শক্তির অবস্থা প্রচোদনার নিত্যরূপ।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপ জীবন ও কর্মের মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা পেলান। এতক্ষণ আমরা ব্যক্তির কথাই বলেছি, এইবার সমূহের কথাই আসা যাক। ব্যক্তি আর সমূহ পরস্পর সম্বন্ধ। প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণাম প্রথমত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই ঘটে, তারপর তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমূহের মধ্যে। ব্যক্তিই সমূহের পথিকৃৎ। তিনি যুগপুরুষ, ভাবী যুগের প্রোচ্ছন্ন সম্ভাবনার অপরোক্ষ অনুভব নিয়ে তিনি সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং তার অগ্নিবীর্ঘকে সঞ্চারিত করেন তাদের মধ্যে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব, সর্বত্রই প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণামের ছক একটা পিরামিডের মত—ভিত্তির বিস্তার ক্রমে চূড়ার দিকে সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। জড়ের বিপুল আয়তনের সামান্য অংশই হয় প্রাণের আধার, প্রাণিজগতের সামান্য অংশেই কোটে মনস্বিতা, মনস্বিতার অতিসামান্য ভাগই রূপান্তরিত হয় অধ্যাত্মসিদ্ধিতে। বিজ্ঞানঘন পুরুষকে ভাই কল্পনা করতে পারি পিরামিডের শীর্ষ-বিন্দুতে। তিনি একক, কিন্তু তবুও একা নন। তাঁর অনিত শক্তির যোগে সবার সঙ্গে তিনি যুক্ত, সবার তিনি প্রশাস্ত। সংখ্যা ও পরিমাণের ন্যূনতর এক্ষেত্রে পূরণ হয় গুণের উৎকর্ষে। আগুনের একটি ক্ষুদ্র তুপাকার ইন্ধনকে আগুন করে তুলতে পারে—এই-খানে পরিমাণের (quantity) উপর গুণের (quality) জিত। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে অপ্রবুদ্ধ সমূহের সম্পর্কও নিরূপিত হয় এই রীতিতেই।

সমূহের দুটি রূপ—একটি সংখ্য, আরেকটি জাতি। প্রাকৃত-জগতে যেমন আছে

পরিবার এবং সমাজ। বিজ্ঞানমন সংঘকে বলতে পারি একটি দিবা-পরিবার। পিরানিডের চুড়া হতে শক্তির ধারা নীচের দিকে নেমে আসছে, চুড়ার কাছাকাছিই তার বেগ বেশী। যতই সে নীচের দিকে নামছে, ততই তার বেগ নশ্ব হয়ে আসছে। সর্বত্রই শক্তি-সংক্রমণ এই রীতিতেই হয়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে ঘিরে যারা থাকে, তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আর বহি-রঙ্গের দুটা ধাক স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। অন্তরঙ্গের কাছে যা প্রভাস, বহিরঙ্গের কাছে তা আভাস। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ কোনও ভেদ থাকবে না, সব প্রভাসই হয়ে উঠবে—এটা ঘটতে দেয় হয়। ভিক্ষা কাঠেও যদি আগুন ধরাতে হয়, তাহলে প্রথমটায় শুরু করতে হয় সহজদাহ্য ইন্ধনে আগুন ধরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তার জোর বাড়িয়ে। অধ্যায়গত্রে এই ব্যাপারটাই দেখা দেয় চক্র নগ্নী বা সংঘের স্রষ্ট্রিতে। প্রাচীনেরা বলতেন বিদ্যাকে কুলবধুর মত গুপ্ত রাখবে, পুত্র না শিষ্য ছাড়া কাউকে বিদ্যা দেবে না, যে শ্রদ্ধাবান্ তপস্বী এবং অনসূয় নয় তাকে মর্নের কথা বলবে না। এই সতর্কতা অকারণ নয়। যে-সত্য সর্বজনীন, তারও গ্রাহক এবং ধারক মুষ্টিমেয়ই হয়। পৃথিবীর এখন যে-অবস্থা, তাতে যে-ভাব মনোগোচর তাকে অবাধে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াটা কিছু কঠিন কাজ নয়। তা-ই কি সবাই গ্রহণ করতে পারে? যা ইন্ডিয়ান, তার গ্রাহক সবাই হতে পারে। যা মনন-সাধ্য, তার গ্রাহক তার চাইতে কম। যা বিজ্ঞান-গম্য, তার গ্রাহক ‘কোটিকে গোটিক’। অথচ এই বিজ্ঞান-সিদ্ধিই হল প্রকৃতি-পরিণামের পয়ের ধাপ। তাকে রূপ দেওয়ার কাজ আগে শুরু হবে ব্যক্তিতে, তারপর সংঘে। শক্তিকে সার্থক করতে হলে সমধর্মীর সংঘে তাকে সংহত করতেই হবে। সংঘ একটা শক্তিকূট, স্তত্রাং তার চারদিকে একটা গতি থাকবেই। কিন্তু গতি কাটার অর্থ বাইরের সঙ্গে যোগ হিনু করা নয়। আপাতত বাইরের প্রতিকূল জোঁয়াচ বাঁচিয়ে শক্তিকে তেজস্বী করাই তার উদ্দেশ্য। প্রদীপের শিখায় আলো আর তাপ সংহত হয় ছড়িয়ে পড়বার জন্যই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির দায় প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সংঘ গড়া, সেই সংঘের দায় প্রবুদ্ধ সমাজ বা জাতি গড়া।

বিজ্ঞানমন সংঘের স্বরূপ কি হবে, বিজ্ঞানমন পুরুষের স্বরূপ-কথা হতেই-তা অনুমান করা যেতে পারে। সংঘের কেন্দ্রে আছেন সংঘ-পুরুষ, তিনি সিদ্ধধর্মের ঘনবিগ্রহ। সংঘের ব্যক্তিরা তাঁরই কায়ব্যূহ। তাঁদের সম্ভার ও কর্মে প্রকাশ পাবে একটা চিন্তন ব্যূহের নিটোল পূর্ণতা, যন্ত্রচালিত একটা যৌথবৃত্তি নয় শুধু। দেহের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যেমন দেহীর চেতনা আনন্দ এবং শক্তি অবাধে ও সমভাবে সঞ্চারিত হয়ে একটা একঘনত্ব (organic unity) গড়ে তোলে, এও হবে তেননি। :সংঘের ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈচিত্র্যের অকরুণ ঐশ্বর্য থাকবে, কিন্তু তা বলে বিরোধ থাকবে না। বৈচিত্র্য সেখানে হবে একঘেরই স্মন বিভূতি। একই কেন্দ্র হতে সেখানে সবার বিন্দু, তাই অন্তরে

সবাই এক—কিন্তু অভিব্যক্তিতে তারা বিচিত্র। অতিনানস একদা আর অধিনানস বৈচিত্র্য—এই হবে সংস্বেতনায় অন্তরঙ্গ পরিচয়। আর তার বহিরঙ্গ বৃত্তিতে থাকবে বোধিনানস প্রভাসনানস আর উত্তরনানসের লীলায়ন।

ধর্মকায় সম্যক্‌সমুদ্র বিজ্ঞানধন পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত এই সংস্বে হবে যেন সাবিত্রী-দ্যুতির একটা পরিণওন। আর তার জ্যোতিঃশক্তি ছড়িয়ে পড়বে পাণ্ডিব-জীবনের 'পরে', বিহ্বল হবে তার মর্মমূলে—দিব্য-জীবনের ভাবের মহিমাঘ ঘটাতে তার রূপান্তর।

[সমাপ্য]

শ্রীঅরবিন্দ ও মানুষের দুঃখমুক্তি*

সোমনাথ মৈত্র

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ আজ শ্রীঅরবিন্দের জন্মের এই পূণ্যদিনে ভক্তিপূর্ণত চিন্তে তাঁকে স্মরণ করি। তাঁকে স্মরণ করা আজকের দিনে শুধু একটা বাষিক কৃত্যনাত্র নয়; মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্যে সোটা একান্ত প্রয়োজন। আজ কোথাও আনন্দ নেই, না ব্যক্তিজীবনে, না জাতীয় জীবনে। চারিদিকে অভাব, হিংসা, লোভ, ভয় ও নিরাশা। মানুষ মানুষকে এবং তার কষ্টজনিত সকল প্রকৃত সম্পদকে ধ্বনিসাৎ করতে উদ্যত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অশান্তি ও অভাবে মানুষের এমন দশা আসে যখন সে সকল বিশ্বাস হারাতে বসে। সে এমন সন্দেহবাদী হয়ে দাঁড়ায় যে তার জীবনের যা কিছু শুভাশুভের নান তাতে সে সংশয়ী হয়ে ওঠে, তার মনে হয় সকল আদর্শের সাধনাই নিষ্ফল ও অর্থহীন। মন যখন জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পরাস্ত হয় তখন তার এমন গভীর বিতৃষ্ণা ও কোভ আসে যে সব কিছুই তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় অসার ও বিরক্তিকর। এই মনোভাব থেকেই আনন্দের জীবনী-শক্তি আরবিসোধী হয়ে ওঠে। নিজেদের মনে হয় ভাগ্যের ক্রীড়নক, চারিদিকে দেখতে থাকি অমঙ্গলের রাজত্ব।

এই জটিল বিশ্ববাপারের এবং মানবজীবনের দুঃখ কষ্ট ও অমঙ্গলের একটা পরিপূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন। জগৎকে তিনি দেখেছেন এক বৃহত্তর সৃষ্টি-প্রেরণার সাধনক্ষেত্ররূপে, যেখানে অজ্ঞানের আড়ালে রয়েছে বিপুল সম্ভাব্যতা। জগতের যে অবস্থা দেখে দুঃখবাদের সমর্থন পাওয়া যায় তা শুধু ক্রমবিকাশের একটা পর্যায়মাত্র। অমঙ্গল জগতের স্থায়ী উপাদান নয়, বিশেষ অবস্থায় তার প্রাদুর্ভাব হয়; সে অবস্থা কেটে গেলে অমঙ্গলও দূর হয়। জগৎ নিখ্যা ও দুঃখময় মনে করা ভুল। আদিত্তে জগতে অন্তত বলতে

কিছু ছিল না, কারণ নির্ভানের যে অন্ধকারে জগৎ তখন আবৃত ছিল তাতে উভাউত-নোথের উদ্বেগই সম্ভব হয়নি। অস্ত্রও অস্ত্র ধাক্কা নেই না, কারণ দিব্যজীবনে ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব নেই। বিবর্তনের মধ্যাবস্থাতেই যত দুঃখযন্ত্রণা। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, যে দুঃখবোধের মূলে আছে একটা স্বপ্নের ঝাপসা ধারণা, সে স্বপ্ন বর্তনানে পাই না বলেই কষ্ট ; যে পরিবেশে বাস করি তা অস্বপ্নের মনে হয় বলেই অস্বস্তি। আমাদের মধ্যে এই যে আনন্দের আভাস, এই যে স্বপ্নের অস্পষ্ট বোধ এ আসে কোথা থেকে ? যে ভাগবতী শক্তি প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত এ তারই স্মৃতি প্রকাশ। তাকেই যদি পুরো পেতে চাই যার কথা কবি বলেছেন, “আমি তারেই বুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে,” তাহলে দুঃখবোধের একটা সার্থকতা পাওয়া যায়, কারণ এই বোধকে জাগিয়ে আত্মানুভূতির কাজে লাগাতে যদি পারি তাহলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ একদিন সম্ভব।

অমঙ্গল এড়াবার জন্যে তার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা কিছু নয়। পালানো কোথায় ? নিজের মধ্যেই বাঁধনের জাল যে পাতা। অজ্ঞানের লক্ষণ ঋণিত চেতনা ; সেই ঋণিত চেতনাই অস্ত্রের বাস। অশোধিত চেতনা অহংবোধকে জাগায়, এবং এই অহংবোধ জগৎপ্রাণের সঙ্গে ব্যক্তির বিভেদ ঘটায়। যতদিন না বিবর্তনের চাকা ঘুরতে ঘুরতে মানুষকে দিব্যচেতন্যে পৌঁছে দেবে, ততদিন জগৎ ও জগৎজীবনের সঙ্গে একাত্মতার অভাবে দুঃখ ও অমঙ্গল মানুষের মধ্যে থেকে যাবে।

বিবর্তনের চাকা ঘুরবে কিসে ? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানের অনুশীলন, পরহিতসাধন, স্বার্থশূন্যতা—এসব বৃত্তির ও প্রচেষ্টার বহু পরীক্ষা মানব-ইতিহাসে হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে স্বপ্ন সম্ভোগ তাতে স্থায়ীভাবে বাড়েনি ; মানুষের যন্ত্রণার অনলে দু’এক ফোঁটা জল ছিটিয়েছে, এখানে ওখানে কণিক উপশম ছাড়া আর কিছুই হয়নি। যা কিছু পরিবর্তন মানবজীবনে ঘটেছে সে কেবল তার বহিরবয়বে ; মানুষের অন্তর প্রকৃত অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। যে-অহংবোধ মানুষের সকল অনর্থের মূল সে অহংবোধ দূর হয়নি। পরহিতৈষণা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে তার দ্বারা যদি আমাদের জীবন চালিত হয় তাতেও আমাদের অহংকার থেকে মুক্তি নেই। পরহিতব্রতীর অহংকার স্বার্থপরের অহংকারের চেয়েও সাংঘাতিক, কারণ তা আত্মগরিমায় স্ফীত। পরার্থে ত্যাগ অথবা আত্মদান অবশ্য ভালো জিনিষ, তাতে প্রকৃতিতে সার্বিক ভাব বাড়ার সম্ভাবনা আছে। দয়ামায়া, সমবেদনা, সমতা, সংযম—এসবই সার্বিক গুণ ; আমাদের বর্তমান বুদ্ধিসংবর্ধন জীবনের কাঠামোতে এইসব গুণের চর্চা ছাড়া আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তবে এতে সমস্যার সমাধান হয় না, রোগ সারে না, সাময়িকভাবে চাপা পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন সত্যিকারের সমাধান হবে তখনই যখন সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম

হতে পারব, নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাব। তখন অন্যের সঙ্গে বিভেদ ঘুচে যাবে যেখানে পূর্বে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করা ও প্রতিষ্ঠিত করা হত, বা নিজের স্বার্থভোগ সম্ভব হত, সেখানে সকলের মধ্যেই নিজেকে পেয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বার্থভোগের পূর্ণতা লাভ করব। যে নিজের অহং-বোধে আবদ্ধ তার পক্ষে সর্বভূতে দয়া, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা, পরের স্বার্থদুঃখকে নিজের বলে মনে করা একেবারে অসম্ভব। শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝলে চলবে না যে দয়ানামা, পরহিতসাধন প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠগুণ। এ আদর্শ তখনই সত্য হয়ে উঠবে যখন পরকে আপন বলে অনুভবে জানব। এই উপলক্ষি যখন সত্য হবে যে আত্মপরে ভেদ নেই, তখন আদর্শ ও আচরণে আর গরমিল থাকবে না। তবে অজ্ঞানে যদি পরের সঙ্গে এক হই তাহলে অন্যের তিতরকার দুঃখ, অনায়াস ও অমঙ্গল নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। অন্তরায়ের ক্ষেত্রে যে মিলন সেই যোগই মুক্তিদায়ী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অহঙ্কার থেকে মুক্তিই হল দুঃখ ও অমঙ্গলের হাত থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র পন্থা। অর্থাৎ প্রকৃতির যদি রূপান্তর না ঘটে তাহলে সে মুক্তি কোনদিনই সম্ভব হবে না। বুদ্ধি দিয়ে ভালোমন্দের বিচার কোনদিন ভালোকে ভগতে প্রতিষ্ঠিত এবং মন্দকে ভগৎ থেকে নির্বাসিত করতে পারবে না। কিন্তু মানবপ্রকৃতির এতটা বদল হবে কি উপায়ে?

এর উত্তর দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। বিবর্তনের ফলে আমরা আজ যে স্তরে পৌঁছেছি বিবর্তন সেখানে থেমে যেতেই পারে না, কারণ মনের সীমানা ছাড়িয়ে আরো উর্দ্ধে না গেলে আমাদের প্রকৃতি বদলাবে না। মনের সীমানা পেরিয়ে অতিমানসে যাওয়া মানবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। উদানপতনের বন্ধুর পন্থা দিয়ে আজকে মানুষ যেখানে পৌঁছেছে সেই পর্য্যন্তই তার দৌড় একথা মনেও করা যায় না। যে দুর্বল, দুঃখগোকে কাতর, কানকোখে ভর্তর, হিংসায় উন্নত মানুষ ধরণীকে আঁচ ভারাক্রান্ত করে আছে সে যে পূর্ণমানব নয়, একথা বুঝতে বেশী দেরী হয় না। সূতরাং বিবর্তনের চাকা আবার ঘুরবে এ ত অবধারিত। তবে বিবর্তন তার নিজের চালে চলে, সে চাল সাধারণতঃ ধীর ও মন্থর। তার গতি কি দ্রুত করা যায় না?

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে শ্রুষ্টির ইচ্ছার সঙ্গে যদি মানুষের আত্মপূহা যুক্ত হয়ে যায় তাহলে প্রকৃতির সামগ্রিক রূপান্তরের জন্যে যুগযুগান্ত অপেক্ষা নাও করতে হতে পারে। জগৎ-ব্যাপারে ও মানবচেতনায় অতিমানসের অবতরণ হতে পারে যদি ভাগবতী শক্তিকে মানুষ নানিয়ে আনতে পারে তার আত্মপূহার জোরে আর তার আত্মনিবেদনের পূর্ণতায়। এই পূর্ণযোগের ফলে সে ভাগবতী-শক্তিধারণের প্রকৃষ্ট আধার যদি হতে পারে তাহলেই তার মেহ-মনপ্রাণ অন্তরায় অমান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তার দুঃখের আলা ও ব্যর্থতার হতাশা দূর হয়ে যাবে। তাই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি জগতের দুঃখ আর অজ্ঞানেই নিবদ্ধ নয়, দুস্তর

দুঃখজন্যই পাপের যে আনন্দধানে মানুষ একদিন পৌঁছবে, তাঁর দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। তারই
সকল তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন :

This is not all we are or all our world.
Our greater self of knowledge waits for us,
A supreme light in the truth—conscious Vast :
It sees from summits beyond thinking mind,
It moves in a splendid air transcending life,
It shall descend and make earth's life divine.

বিদ্বাদ্বতী

নিশিকান্ত

কি উজ্জ্বল-আনন্দ-উচ্ছ্বাসে

সহসা কে মোর বিষাদ লুপ্ত করে ।

তুধু পলকের অস্তু-প্রোম্মানে

আলো জ্বলে গেল আমার আশার ঘরে ।

চলে গেছে, তবু আছে তার রূপরাশি,

এখনো যে দেখি তার অপূৰ্ণ হাসি,

আখিতারা তার এখনো সমুদ্ভাসে

আমার মুক্ত মানস-নেত্র-পরে ।

তুধু পলকের অস্তু-প্রোম্মানে

আলো জ্বলে গেল আমার আশার ঘরে ।

কোন পরিচয় হ'ল না ত কথা ব'লে,

সম্বোধনের অনকাশ হয়নি ত ;

আধিভাবের আনন্দেই গেছে চ'লে,

আসা-যাওয়া তার এমনি আচস্থিত ।

তবু অন্তরে কোনো আশ্রয় নাই ;

আমার প্রতি স্পন্দনে তারে পাই

সে রয়েছে মোর নন্দিত নিঃশ্বাসে,

দীপ্ত-শোণিতে, আগ্রত ক

তুধু পলকের অস্তু-প্রোম্মানে

আলো জ্বলে গেল আমার আশার ঘরে ।

প্রবল বিতার বেগে বিদ্বাদ্বতী,

পাবক-স্বভাব-বিকাশের তুলতা,

আমার জীবনে দিয়ে গেছে তার গতি :

অনির্বাকের নিমল অবস্থতা ।

শুধু কণিকের লীলায় চিরন্তনৌ
 বিলাল আমায় মিলন-সন্দীপনৌ,
 শুভদৃষ্টির নির্বাক-সম্ভাষে
 বহি-বাসর রেখে গেল মোর তরে ।
 শুধু পলকের জলন্ত-প্রোল্লাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার ঐ ।

১-পরশে যেমন মৃত্যু হয়,
 তার পরশনে তেমনি অকস্মাৎ
 আমার মর্ত্য-সত্তার হ'ল লয়,
 সে মোরে সহসা ক'রেছে আত্মসাৎ ।
 মরণ-গরলে ঘন-কালো ফণীমালা
 স্বর্ণশিবার মালিকায় ত'ল জ্বালা ;
 তামসিকতার আমূল-সর্বনাশে
 সে আমার মাঝে অশনি-রভস ধরে ।
 শুধু পলকের জলন্ত প্রোল্লাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার ঐধার ঘরে ।

আলো! এসে এসে আমার মানবতায়
 বাধা পেয়ে পেয়ে ফিরে গেছে বারে বারে ।
 ছিলাম গহন-তিমির-অচেতনায়
 এবার পেয়েছি আলোর অতলতারে ।
 কত জন্মের অশিষ-ঘুমের ঘোর
 এখন ভেঙেছে, রজনী হ'য়েছে ভোর ;
 ঐ শিখাময়ী শিবানীর সঙ্কালে
 জেগেছি আমার শিখাময় শঙ্করে ।
 শুধু পলকের জলন্ত প্রোল্লাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার ঐধার ঘরে ।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তুক।

এ কি নিমোহ প্রেমের সম্মোহিনী
মোহিত ক'রেছে মহাশক্তির মদে !
এল ভড়িমায় ভড়িৎ-সঞ্চারিণী,
গতি রেখে গেল সঞ্চারণের পথে ।
চকিতে চমকি' আমার মলিন প্রাণ
লভে অনাহত আলোকের অভিযান,
নি অবিচল। চপলার অধিবাসে
মোর সংবিৎ অনল্যমৃতে ভরে !
শুধু পলকের জলন্ত প্রোলাসে
আলো জ্বলে গেল আমার আঁর ঘরে ।

কোথ' অবিচল। চপলার অধিবাস ।
কোথ' হ'তে মোরা অঝোর আলোক লভি !
নীলাকাশ মাঝে আছে কার বিভাকাশ,
কোথ' হ'তে আসে চন্দ্রতারকারবি ?
নভ-গভীরের অরূপ-বিরতি তার
রূপের গতিতে দিয়ে গেছে উপহার ,
নৌলিনা-মর্ম-মস্তিত নির্যাসে
তার অক্ষর মাদুরীর মধু ক্ষরে ।
শুধু পলকের জলন্ত-প্রোলাসে
আলো জ্বলে গেল আমা

প্রতি অঙ্গের জাগরণে তুমি জাগে,
জ্বগেছে আমার নিখিল-মৃদয়তা ;
নিকামনার নির্মল অমুরাগে
প্রতি অণু মোর পেয়েছে অভিস্রুতা ।
বিনিদ্রাবতী আমার নিদ্রা হানি'
আমার বাণীতে আনিয়া বজ্রবাণী

পূর্ণের বিশাল সুপ্তির নাগপাশে
 মোর নিমেষের তৈরব-রবে হরে ।
 শুধু পলকের অলস্ত-প্রোন্মাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার আধার ঘে

নবগতি পায় নিয়তির নীহারিকা ;
 দোলে গ্রহতারা, আকাশে কি আলোড়ন !
 জগৎ-জলদ-বিদারিণী মহাশিখা
 বসুন্ধরায় করেছে অবতরণ ।
 অখিল আলোর মর্ম-গতির জ্যোতি
 সম্মুখে মোর হয়েছে মৃতিমতী ;
 ভব-জড়তার যবনিকা জ্বলিয়া সে
 নব-প্রদীপন দিয়েছে নারীতে-নরে ।
 শুধু পলকের অলস্ত-প্রোন্মাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার আধার ঘে

শুধু পলকের উপলক্ষির রে ,
 শুনেছি, মানব অমিয়-অন্ধি পায় ;
 আমার ভবনে তম-অর্গল খসে,
 আমি লভি ঐ পাবনী-উষ্মিলায় ।
 এখন আমার দিবাভাববরৌময়
 তারি বিভা দোলে, তারি বিভঙ্গ রয় ;
 লাবণীতে তার আমার অবনী ভাসে,
 তারি রূপানল আমার রূপান্তরে ।
 শুধু পলকের অলস্ত-প্রোন্মাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার আধার ঘরে ।

এল অনন্ত যৌবনরাগময়ী
 মানবী-জীবনে আপনারে বিতরিল ;
 তারে চিনি নাই, তাই সে সহসা ঐ
 আমার দৈব-দর্শনে রূপ নিল ।
 রূপের বলকে ফেলে গেছে অবদান,
 অকিঞ্চনেরে করেছে বিস্তবান ;
 মোর সুরে তার সৌর-সুধমা আসে,
 তারি কান্তির কোমুদীসুধা ঝরে ।
 শুধু পলকের জলন্ত-প্রোলাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার আধার ঘরে ।

ঐ অনাদিনী অনল-কুন্তলার
 অধরে সুচির-উষার অরুণ-ধা । ,
 প্রলয়-তারায় জ্বলে বামাক্ষি তার,
 দক্ষিণ-ঐথি সৃজনের আদিতারা ।
 পূর্ণচন্দ্র-পূর্ণরবিস্তনী,
 চরণে দামিনী, পাণিতে পরশমণি ;
 নবকল্লের অপূর্ব হাসি হাসে
 আমার মুগ্ধ মনাস-নেত্র'পরে ।
 শুধু পলকের জলন্ত-প্রোলাসে
 আলো জ্বলে গেল আমার আধার ঘরে ।

২৪ এপ্রিল, ১৯৫৭

সৃষ্টির অসুস্থহীন ধারায় প্রত্যেক অবতার হলেন
ভবিষ্যতের পূর্ণতর সিন্ধির অগ্রদূত ও পুরোধ।

শ্রীমা

মায়ের প্রার্থনা

১৪ মে, ১৯১৫

এক দিন, ভগবান, তুমি আমার মনকে শেখালে যে সে তোমার দিব্য-সত্য প্রকাশের যন্ত্র হয়ে, তোমার সনাতন ইচ্ছার বাহন হয়ে পূর্ণভাবেই কাজ করতে পারে, অথচ মূল-সত্য সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা সব-তারই মধ্যে তার গঠন-সামর্থ্য যে আবদ্ধ থাকবে এমন নয়। সে-অবধি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া মনের অভ্যাস ছিল তোমার বাক্যাতীত অনন্তের সম্মুখে মুক আনন্দে, নীরব ধ্যানে ডুবে থাকা—সেখান হতে বের হয়ে আসত বাহ্যসত্তাটি যে কর্তৃক্ষেত্রের প্রতিরূপ তারই উপর সমস্ত প্রয়াসকে নিযুক্ত রাখতে। তার অর্থ একটা অতিনাত্র সঙ্গীর্ণ সীমানার মধ্যে দাসত্ব; সেখানে আর থাকে একটা আত্ম-বিরোধ, মনের গঠন-সামর্থ্য এক দিকে আর অন্যদিকে যে-আধারের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ হতে চায়—অব্যবহিত ফল, মনের শক্তি-সকলের অপচয় এবং সীমাবদ্ধতা তার কর্ত্তের মধ্যে সার্থকতা না পেয়ে স্বভাবতই ফিরে চলে যায় তোমার আনন্দের মধ্যে নিমজ্জিত হবার জন্যে।

এই বিশৃঙ্খলার অবসান হঠাৎ তুমি ঘটালে, মনকে তুমি তার শেষ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলে, তুমি তাকে শেখালে অবাধে সক্রিয় হয়ে উঠতে, সকল রূপের ভিতর দিয়ে, কেবল মাত্র সেইগুলির ভিতর দিয়ে নয় যা একদিন সে নিজের ব'লে অর্পাৎ তার আত্ম-প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় ব'লে বিবেচনা করেছে।

প্রাণসত্তা ত বরদিন পূর্বেই এই মুক্তি লাভ করেছে, সে জেনেছে কি করে অনুভবের ও আবেগের পরিপূর্ণতা নিয়ে, জীবনীশক্তিকে যত রূপে প্রকাশ করে ধরতে পারে যায় তার মধ্যে বর্ধে থাকা যায়। কিন্তু মনোময় সত্তা এখনো শেখেনি কি রকমে সচেতনভাবে ইতর-বিশেষ না করে সমানে সকল জীবনধারাকেই সম্মীলিত, সঙ্গঠিত, আনোক্ত করে ধরতে হয়। কিন্তু এই তুমি তার সকল বাধা ভেঙ্গে দিয়েছ, তোমার অনন্ত-প্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে ধরেছ।

কয়েক দিনের মধ্যেই নূতন সিকিটি স্থির হল দৃঢ় হল। আমার অনন্ত-সত্তা বর্তমান পৃথিবীর উপরে যে চেতনা-কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছে, তার কাছে তুমি যা আশা কর, সে জিনিষ তার সম্মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—তা হল, সকল জড়-আকারের মধ্যে তাদের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠা, সকল রূপের মধ্যে এই জীবনীশক্তিকে স্থানীয় করে, ব্যবহার করে যে চিন্তাশক্তি তা হয়ে ওঠা, আর এই চিন্তাশক্তির নানাবিধ উপাদানসমষ্টকে প্রসারিত করে, সমুচ্ছল

কবে, প্রথম কবে এবং সম্বন্ধিত কবে ধরে যে প্রেম-শক্তি তাই হয়ে ওঠা—আর এই ভাবেই ব্যক্ত-সৃষ্টির সঙ্গে অব্যবহাবে একীভূত হয়ে গিয়ে পূর্ণশক্তিতে তার রূপান্তর সাধনে অবতীর্ণ হওয়া ।

অন্যদিকে, তা হল আবার, পবনতরঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের ফলে, পরমসত্যের জ্ঞান-লাভ, আর যে শাশ্বত ইচ্ছা-শক্তি তাকে প্রকাশ করে তার জ্ঞান-লাভ ; এবং এই একান্ততার জন্যে ভাগবতশক্তির অনুগত সেবক ও অস্বাস্থ্য বস্ত্র হয়ে ওঠা, আর মূলতরঙ্গের সঙ্গে সজ্ঞান একাত্মতা এবং তার বাহ্যপ্রকাশের সঙ্গেও সমাগ একাত্মতা, এই উভয় একাত্মতাকে সংযুক্ত করে ধরা স্তত্রাং পরিণেবে মূলতরঙ্গের সত্যধর্ম অনুসারে সৃষ্টির মধ্যে সচেতনভাবে হৃদয়কে মনকে প্রাণকে চালাই করা, গঠন করা ।

এই রকমেরই ত ব্যক্তিগত সত্তা পরমসত্য আর ব্যক্ত-বিশ্বের মধ্যে সচেতন মধ্যস্থ হয়ে উঠতে পারে, প্রকৃতির যোগ সাধনায় যে ধীর অনিশ্চিত গতি তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, তাকে দিতে পারে দিবা যোগসাধনার ক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি গতি ।

আর এই রকমেরই কোন কোন যুগে পৃথিবীর জীবন-ধারা অত্যাশ্চর্য্য ভাবে সোপান সব উন্নয়ন করে যায়—অন্য সময়ে যা পার হতে প্রয়োজন হত সহস্র সহস্র বৎসর হয়ত ।

ভগবান, বর্তমানে তোমার চিরন্তন ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ ও সচেতন আত্ম-সমর্পণ, যত দূর আনি বুঝতে পারি, হয়ে উঠেছে স্থির নিত্য অবস্থা, তা রয়েছে মনের হোক প্রাণের হোক আর একান্ত ভড়ের হোক প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক বৃত্তির পিছনে । তার প্রমাণ নয় কি এই যে অক্ষুণ্ণ প্রশান্তি, এই যে গভীর অচঞ্চল অব্যভিচারী-আনন্দ, তা কখন আনাকে ছেড়ে যায় না ?

নিষ্ক্রিয় একাত্মতা অর্থাৎ গ্রহীকৃ যে একাত্মতা—যাবতীয় বক্তা আধারের প্রাণ, মন ও হৃদয়ের সঙ্গে—এখন তা সংস্কৃত : তা হল বিভক্ত সত্যের কাছে আত্ম সমর্পণের অপরিহার্য্য পরিণতি ।

কিন্তু চেতনা যখন সক্রিয় প্রাণশক্তি হয়ে সকল জড় আধারকে জীকৃত করে গঠিত করে, বুদ্ধিশক্তি হয়ে প্রাণকে স্বসংগঠিত করে, প্রেম হয়ে বুদ্ধিকে জ্ঞানোন্মুলক করে—সক্রিয়ভাবে, পূর্ণ সচেতনভাবে, মন্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে যুগপৎ বর্তমান থাকে, একটা অসীম পূর্ণতা ও সুধীম সানন্দ্য নিয়ে : তখনকার সেই মুহূর্ত্ত সব আসে বিচ্ছিন্নভাবে, যদিও ক্রমেরই তা অবিচ্ছিন্ন হয়ে স্থায়ী হয়ে উঠেছে ।

ঠিক সেই সব মুহূর্ত্তেরই চেতনা দুটি যুগপৎ চলে, একটি চেতনায় বিলে যায় ; অবর্ণনীয় বাক্যাতীত সে চেতনা তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছে অক্ষর অনন্ত—আর অনন্ত গতি । এই সব মুহূর্ত্তেরই ত বর্তমানের ব্রত সিন্ধু হতে স্রব করে ।

নাসিগাগ ৩১ জুলাই, ১৯১৫

তগবান ! সেবকের, যন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে আনাকে কি তোমার দিকে ফিরে তোমার প্রশস্তি গাইতে হবে ? না, তোমার সনাতন সর্বস্ব আর অসীম আনন্দের মধ্যে তোমার সঙ্গে একীভূত হয়ে, মানুষকে বলতে হবে যে শান্তি যে স্বপ্ন তান্না জানে না তার কথা ? দুটি মনোভাবই রয়েছে এক সঙ্গে, চলেছে সমানে পাশাপাশি, আর এই মনিত্ব অচেতন ইকোন মধ্যেই পরিপূর্ণতা।

স্বর্গ ভয় হয়েছে নিঃসন্দেহে—কোন জিনিষের কোন ব্যক্তিই কমতা নাই তাকে আর আমার কাছে থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু পৃথিবীর ভয় এখনও নাকী তান কাছ চলেছে বটে, তবে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে—আর ভয় হলেও তা এখনো হবে আপেক্ষিক মাত্র। এ জগতে যত বিজয় তা সোপান শুধু, নিয়ে চলে ক্রমে আরো মহত্তর বিজয়ের দিকে। তোমার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে তুলে ধরে যে নক্ষত্র পৌঁছিতে হবে, যে বিজয় নান্দ করতে হবে, তা হল তোমার সনাতন পরিকল্পনার সামান্য অঙ্গ মাত্র। কিন্তু তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌম্য আমার, তখন আমিই ত এই পরিকল্পনা, এই ইচ্ছাশক্তি, অসীমের পরম-আনন্দই আমি উপভোগ করি তখনও যখন এই ভেদময় জগতে যে বিশেষ ভূমিকা তুমি আমার উপরে ন্যস্ত করেছ তা আমি অভিনয় করে চলি, উৎসাহের সঙ্গে, উদ্যমের সঙ্গে, যথায়থভাবেই।

আমার অন্তরে তোমার শক্তি স্ফুল সবল উৎসের মত, পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে রয়েছে, জমিয়ে তুলছে তার সামান্য বাধা সব ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে, বাহিরে মুক্তভাবে ছুটে চলবার জন্যে, চারদিকের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তাকে সহসা উর্বর করে তুলবার জন্যে। কিন্তু কখন এই উৎসারণ ঘটেবে ? সময় যখন আসবে তখনই তা হবে—কারণ বিশেষ মুহূর্ত অনন্তকালের মধ্যে কিছুই নয়। আগামী কাল তোমার যে এষণা প্রকট হবে তারই অনুগত হয়ে সকল শক্তির চলেছে, সৃষ্টির উপর ছড়িয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে উঠছে—যা-কিছু তোমার পুরাতন এষণাকেই চিরকাল প্রকাশ করে চলেতে চায়, সর্ব্বজ্ঞমী পরিপ্লাবনে তা ডুবিয়ে দিতে চলেছে, যাতে শেষে তোমারই নামে সারা পৃথিবী তান্না অধিকার করতে পারে, তোমার কাছে তাকে তোমারই পূর্ণতর রূপে সমর্পণ করবে বলে—শক্তির এই যে আন্তর আশ্ব-সঙ্কম, এই যে আশ্ব-নিবিষ্টতা তার মধ্যে রয়েছে কি বিপুল আনন্দ, কোন কথায় কখন তাকে ব্যক্ত করা যায় ?

তুমি বলেছ পৃথিবী মরতে চলেছে—সে মরবে যতখানি সে থাকে প্রাচীন অজ্ঞানের মধ্যে।

তুমি বলেছ পৃথিবী বেঁচে থাকবে—সে বেঁচে থাকবে যতখানি সে তোমার মহাশক্তির মধ্যে পায় নবজীবন।

কোন কথায় প্রকাশ করতে পারে তোমার সিদ্ধান্তের ঔজ্জ্বল্য, তোমার মহিমার ঐশ্বর্য্য ? কোন কথায় ব্যক্ত করবে তোমার চেতনার নিঃস্বং পরিপূর্ণতা, তোমার অসীম প্রেমের আনন্দ !

কোন কথায় সঙ্গীত হবে তোমার বাক্যাতীত শান্তি, কীন্তিত হবে তোমার নীরবতার নাহাড়া, তোমার সর্বশক্তিমান স্তোত্র মহত্ব ?

সনস্ত বাক্য বিশ্ব যথেষ্ট নয় তোমার ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেব, তোমার সব অত্যাশ্চর্য্য কৃতির বিবরণ দেয়। কানের অনন্ত ধারায় তাই ত সে চেষ্টা করে চলেছে, অধিকতরভাবে, স্তুতিভর ভাবে, অনন্তকাল ধরে।

প্যারিস নবেম্বর ২ ১৯১৫

(কিছুকণ ধরে সাধারণ নৈমিত্তিক জিনিষপত্র ওছিয়ে রাখবার পর)

প্রবল বাতাস যেমন সাগরের উপর দিয়ে বয়ে গেলে তার অসংখ্য তরঙ্গাবলির মাধ্যম মাধ্যম ফেনপুত্র তুলে দেয়, তেমনি আমার স্মৃতির উপর দিয়ে একটা বিপুল ফুৎকার বয়ে গেল, সেখানে তুলে দিল অগণিত পুরাণো কথা সব—তীব্র জটিল ঘনবিন্যস্ত অতীত বিদ্যুৎলহনার জন্যে যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল, তার রসস্বাদ তার ঐশ্বর্য্য এতটুকু না হারিয়ে।

তারপর সনস্ত আধারটি আরাধনা-মগ্ন হয়ে আবেগে উদ্বেগু উবিত হল যেন—তার যাবতীয় স্মৃতি একত্রিত করে, যেমন প্রচুর ফসলের গোছা বাঁধা হয় তেমনি করে, ভগবান, তোমার পায়ের কাছে অর্ঘ্যের মত তাকে ধরে দিল।

সনস্ত জীবন ধরে, না ছেনে, পূর্ব্বাভাস না পেয়েও, তোমাকেই সে খুঁজে চলেছে। তার সকল অনুরাগে, সকল উৎসাহে, সকল আশায়, সকল নিরাশায়, সকল দুঃখে, সকল আনন্দে তোমাকেই সে চেয়েছে ব্যাকুল হয়ে। আর এখন যখন তোমাকে পেয়েছে সে, এখন যখন তোমাকে পরমাশান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে অধিকার করতে পেরেছে, সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, তোমাকে আবিষ্কার করার জন্যে এত সব চিন্তাবেগ, এত সব অভিজ্ঞতার সংঘাত তার দরকার হয়েছে।

কিন্তু এই যে সনস্ত ছিল সংঘর্ষ আর ক্রেশ আর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, তোমার সজ্ঞান সান্নিধ্যের অপরিণীত করুণায় তা হয়ে উঠল অনুভূত সৌভাগ্য, সে সব তোমাকে অর্পণ করতে পেরেছে বলে আমার সস্তার কি আনন্দ! তোমার দিব্যজ্যোতির পাবকশিখা সে-সনস্তকে মহার্ঘ্য রত্নে পরিণত করেছে, আর তাদের আনি আমার হৃদয়-বেদির উপরে জীবন্ত পূর্ণ আহতি দিয়েছি।

বাস্তি সব হয়ে উঠেছে সোপান-শ্রেণী, অন্ধ-অনুেষণ হয়ে উঠেছে বিজয় সিদ্ধি। তোমার মহিমা পরাজয়কে শাশ্বত জয়ে পরিণত করে; যজ্ঞকার সব ছুটে পালিয়েছে, তোমার প্রোজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে।

তুনিই ছিলে প্রেরণা ও নক্ষা, তুনিই কর্তা ও কর্ত্তব্য।

বাস্তিগত জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন স্তোত্র যেন, বিশ্ব পুনঃ পুনঃ তা গেয়ে চলেছে তোমার অনবধারণীয় মহৈশ্বর্য্যের উদ্দেশ্যে।

শ্রদ্ধা

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রকৃতি সৃষ্টির আধার। প্রকৃতি আপনার অনন্ত অক্ষরত্ব ভাণ্ডার হইতে প্রতিনিয়তই উপকরণবরাহি সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে, আপন শক্তিবাহা সেগুনিকে মাঠাইয়া গুড়াইয়া পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু দর্শক বাতিরেকে যেনন নাট্যলীলা নিরর্থক সেইরূপ প্রকৃতির এই নাট্যলীলাও এক দর্শকের প্রতি চাহিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে চাহিতেছে। একজনের অনুমতিক্রমেই আপনার দৃশ্যপট একে একে উন্মুক্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। আধারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই আবেগই পুরুষ। পুরুষের যেরূপ অভিরুচি, যাহাতে তাহার আনন্দ প্রকৃতি সদা তাহাই পুরুষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে। প্রকৃতি স্বতঃই পুরুষের দাসী স্বরূপে সেবা করিতেছে, বিশেষ জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাকে দাসী করিবার কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রকৃতির লীলার রস পুরুষ দুইভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে—দুইপ্রকারে প্রকৃতি পুরুষকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। নিত্যগুরুবুদ্ধনুভূত স্বভাব পুরুষ যখন আপনস্বরূপ, আপন সহজ অবস্থা হইতে অবরোহণপূর্বক ক্ষুদ্রতা, বিচিহ্ননুতা ও চাকল্যের মধ্যেই নিঃশেষিত হইতে চাহে, যখন সে আপনাকে ক্ষণভঙ্গুর ও বন্ধুতাবেই দেখে, তখন সে যে রস, যে আনন্দ সম্ভোগ করে তাহা অবিদ্যার রস, অবিদ্যার আনন্দ। তখন পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির দাস বলিয়া মনে করে, প্রকৃতির সহিত আপনাকে নিশাইয়া ফেলিয়া, স্বধূঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়ের স্বপ্নের মধ্যে ভাঙিত ও সমস্ত হইতে থাকে অথবা একরূপ মনে করে। অজ্ঞানের বশে সে বোধ করে তাহার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বোধ করে সে নিতান্তই পরাধীন, ক্ষুদ্র, স্বধূঃখের চিরদাস। পুরুষ যখন আপন স্বভাবকে একরূপ বিকৃত করিয়া দেখে তখনই কিন্তু সে নিজেই অনুভূতা ও আজ্ঞাকারী, প্রকৃতি তাহার নির্দেশ অনুসারেই কার্য্য করিতেছে মাত্র। পুরুষ আপনাকে মরণশাল, পাপপুণ্যের অধীন, পরনদাস বলিয়া মনে করে তাই প্রকৃতি পুরুষেরই এই অতিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই অনুরূপভাবে আপনাকে পরিচালিত করে, আপনাকে একরূপভাবে সম্বন্ধিত করে যেন সে নিজেই সর্ব্ববর্ধা। যাহার কটাক্ষমাত্রাই সে উঠিতেছে বসিতেছে, সেই কটাক্ষ নির্দেশ অনুসারেই তাহারই গুরু, তাহারই পরিচালক বলিয়া নিজেই প্রতীয়মান করে। পুরুষ আপনাকে স্বধী দুঃখী দেখিতে চায়, প্রকৃতিও স্বধী দুঃখী নইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। পুরুষ অবিদ্যার, অজ্ঞানের আনন্দ চাহে, কাজেই প্রকৃতি

তাহার সমস্ত আয়োজনই করিয়া দেয়। কিন্তু পুরুষ যখন আপন স্বরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, প্রকৃতি ও তাহার শক্তি সম্বলন দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সহায়তা করিতে থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই আপন উপকরণগুলি সাজাইতে থাকে। -আপনার অনন্ত, মুক্ত স্বভাবের মধ্যে পুরুষ যে আনন্দ পায় তাহা বিদ্যার আনন্দ। পুরুষের কটাক্ষমাত্রই প্রকৃতি তাহার চারিদিকে ড্রানের, বিদ্যার দলওলি একে একে বিকশিত করিয়া দেয়, পুরুষ তাহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত সেই বিদ্যার আনন্দকেই নুষ্টিমান দেখে।

কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মনের বাসনা আর পুরুষের অনুমতি এক কথা নহে। আমার মনে এখন যে আকাঙ্ক্ষা উঠিতেছে তাহাই যে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তাহা নহে। মনের ভিন্নমুখী আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আশ্বাসনের মধ্যে দিয়া পুরুষেরই আকাঙ্ক্ষা সংসাধিত হইতেছে। মনের সাময়িক আকাঙ্ক্ষা না নিটিনেও নিটিতে পারে, কিন্তু পুরুষের আকাঙ্ক্ষা নিটিবেই, পুরুষকে পরিতৃপ্ত করাই প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে আহ্বান উঠিত হয় না, বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের মনে যে আশ্বাসন কোলাহল উপস্থিত হয় অথচ মনের অন্তরালে লুপ্তায়িত মূল কারণস্বরূপ পুরুষের অনুমতি দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, তাহা কখনই ফলবতী হয় না। প্রকৃতি পুরুষের দাসী, মন ত প্রকৃতির দাস মাত্র।

পুরুষের এই অনুমতির অপর নামই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার মহিমা, শ্রদ্ধার প্রভাব আমাদের মনি ঋষিগণকর্তৃক কত শত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহস্র মুখে সহস্রভাবে বর্ণিত করিয়াও ইহার মাহাত্ম্য শেষ করিতে পারেন নাই, ইহারই উপর সমস্ত শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে, ইহারই উপর ধর্মের বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাই চালকশক্তি (Motive force)। পুরুষ এই শ্রদ্ধা দ্বারাই এই বিরাট উন্মাদ প্রকৃতিকে চানাইয়া নইয়াছে।

মানুষ যে অযথা বল প্রকাশ করিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে চাহে, প্রত্যেক পদে হিমাচ চাহিয়া বেড়ায়, আপাততঃ দৃশ্যমান লাভ ক্ষতি গণনা করিয়াই আপন কার্যের সফলতা ও নিফলতা পরিমাপ করে ও এইরূপ ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিতভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হয় তাহার কারণ শ্রদ্ধার উপর অবিগ্নতা। সমাগুজ্ঞানী কেবলমাত্র শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে, অন্তরাস্তার দ্বারা, অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হয়, প্রকৃতিই তাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া দেয়। কার্যের ভার প্রকৃতির উপর, প্রণালী স্থির করা ও তাহা অনুসরণ করা প্রকৃতির কার্য্য, সে সম্বন্ধে পুরুষের ব্যস্ত হওয়া কোন প্রয়োজন নাই। অবিদ্যাক্ষ পুরুষ চঞ্চলতা ও বাস্তবতার দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহে, মনে করে আমি করিনেই কার্য্য নিশ্চয় হইবে নচেৎ নহে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ কোন কার্য্যই করে না, সে মতই মনে করুক না যে সে কর্তা যথার্থতঃ প্রকৃতিই সকল কার্য্য করে। পুরুষ কেবল অনুমতা মাত্র। এই অনুমতার গভী অতিক্রম করিয়া সে যখন মনে করে যে তাহার অনধিকার

চর্চা করিবার কনতা আছে তখন চাকলা ও বিকোভই উপস্থিত হয়, বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পুরুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে বিলম্ব করায়। মানুষ যতই চকল ও বাস্তব হউক বা না হউক যেরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে সেরূপ সিদ্ধি হইবেই। তবে পুরুষের এই আসক্তির ভাব প্রকৃতির কার্যে অন্তরায় জন্মায় ও সিদ্ধি বিলম্ব হয় আর পুরুষের নিনিগ্ৰভাব প্রকৃতিকে তাহার আপন সরল পন্থা অবাধে অনুসরণ করিতে স্তবধা দেয় ও অতি শীঘ্রই সফলতা আনয়ন করে।

মানুষ তাহার স্বভাবানুক্রমেই শ্রদ্ধাপরবশ। চিরমুক্ত পরমপুরুষের সহিত একান্ততা-বশতঃ তাহার এইটুকু স্বাধীনতা আছে যে সে ইচ্ছা করিলে তাহার শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া নিবৃত্তির পরমা শান্তি অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই শ্রদ্ধার প্রতি অক্ষদৃষ্টি হইয়া প্রবৃত্তির চকল আনন্দ সন্তোষ করিতে পারে।*

* বর্ষ ১৪ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা, সোমবার ১৬ ফাল্গুন ১৩১৩

ভগবানে বিলীন হওয়া

কেমন ক'রে ভগবানে বি
মিলিয়ে যেতে পারে ?

৭ অহংভাবটি একেবা

ক'রে তা ভগবানে

কেমন ক'রে ভগবানে বিলীন হওয়া যায় ? অহংভাবটি একেবারে দূর হয়ে কেমন ক'রে তা ভগবানে মিলিয়ে যেতে পারে ?

প্রথমত এর জন্য চাই অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাই ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, আশ্রয় করা। যতবারই হোনার মধ্যে অহংভাবের উদয় হবে ততবারই তার নাকে নারবে ঝুঁসি, তাহ'লে এমনি নার খেতে খেতে সে ভিনিস হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই সরে পড়বে। সাধারণত কেউ নিজের অহংকে এমনভাবে ত্যাগ করে না, বরং তাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিতে থাকে, তার আধিপত্যকে ও ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতেই থাকে। তার ক্রিয়া শুরু হলেই মনে মনে বলা, "ঠিক কাজই করছি", যদিও অধিকাংশ স্থলে তুমি বুঝতেই পারো না যে সেটি হলো হোনার অহং, মনে ক'রে নাও যে তুমিই বুঝি সে। অতএব প্রথম কথাই এই যে হোমাকে গভীর গুরুত্বের সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প করতে হবে, অহংভাবটিকে কিছুতেই আনি থাকতে দেব না। কিন্তু যখন তুমি এমন কথা বলবে তখন তার অর্থ কি ও গুরুত্ব কতখানি তা বেশ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবে। ওটি খুব সহজ কাজ নয়। কারণ হোনার মস্তিকে যখন ঐ চিন্তা ঘূর্ণপাক খাচ্ছে, "অহংভাব আনি চাই না, ভগবানের থেকে নিজেই আলাদা ভাবতে চাই না," তখনও বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে সে চিন্তাটি কাজ করে না ; স্বার্থের খাতিরে যখনই অহংএর দিক থেকে কিছু ক'রে ফেল তখনই মনে করে সেটুকু স্বাভাবিক তখন আর তাতে ক্লান্ত হও না।

অহং ত্যাগ করা ভিনিসটা কেমন তা আগে ভালো ক'রে বোঝা চাই। পর্যায়ক্রমে এর অনেকগুলি ধাপ রয়েছে। প্রথমেই জানা চাই এই দুইএর মধ্যে কি পার্থক্য—(১) স্বাধিপত্য, (২) আনিয়। স্বাধিপত্য হলো স্থূল ব্যাপার, ওটিকে ত্যাগানো খুব কঠিন নয়, অসুস্থতাপক্ষে ওকে অনেকখানি কনিয়ে আনা যেতে পারে। এ ভাবটি পোষণ করা অতি হীন ও কদম্ব, এই মনে করতে থাকলেই ক্রমে ক্রমে তা ছেড়ে যায়। স্বাধিপত্য মানুষ হয়ে আচরণ করা যে অপরের চোখে কতখানি বিগদৃশ ও হাস্যকর সে কথা আমরা ভেবে দেখি না। স্বাধিপত্য ব্যক্তি কেবল নিজের ভাবনাই ভাবছে, সকল বিষয়ে কেবল নিজের দিকটাই টেনে চলছে, নিজের সামান্য আশিষ্টকে সব চেয়ে সামনে রেখেই তার যত কিছু বিচার বিবেচনা, নিজেই যেন সে সারা বিশ্বে কেন্দ্র হয়ে আছে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও এমনকি ভগবান পর্যন্ত তারই

চারিদিকে ঘুরছে, দুনিয়ার সকল কিছু মধ্য সেই হলো উত্তম পুরুষ। কিন্তু এমন ভাব আসতে না দিয়ে তুমি যদি একটু নিলিপ্ত হয়ে তফাৎ থেকে নিজের দিকে চেয়ে দেখ, যদি এই ভাবটি মনে রেখে একবার আয়নার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলে তখনই দেখতে পাবে যে কতই অকিঞ্চিৎকর তুমি। রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার ফরাসী অনুবাদ আনি পড়েছিলেন, সে এক ছোটো কুকুরখানার গল্প, সেটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছিল। কুকুরটি তার মনিবের কোলে আরাম করে বসে আছে আর মনে মনে ভাবছে সেই বুঝি সারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্বরূপ, তাকে নিয়েই জগতের সকলে মহা ব্যস্ত। এ ছবিটা আমার খুবই মনে লেগেছিল। সত্যিকার একটি কুকুরকেও আনি জ্ঞানতান, সেও ছিল ঐ ধরনের। অনেকেই অমন হয়ে থাকে, হয়তো সকলেই অল্পবিস্তর তাই : তারা চায় যে সকলে তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাক, আর সে চেপ্টায় তারা কতকটা সফলও হয়।

ভগবানের মধ্য নিজে থেকে বিলীন করে দিতে হলে তোমায় এ সব ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্য সম্পূর্ণ একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত অহং ভুবে না। এই "সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব" কথাটির মানে কি জানো? এর মানে তখন নিজের কাছ থেকে তুমি সমস্ত বাইরের প্রভাবকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে। সেদিন এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম, তাতে সে লিখেছে যে কোনো বই পড়তে গেলেই সে ভয় পায় তার কারণ বইএর মধ্য যে কোনো চরিত্র ফুটে উঠতে দেখে তার সঙ্গেই সে একায় হয়ে পড়ে, এই তার স্বভাব; নাটক নভেলের চরিত্রগুলির সঙ্গে অভিনয় হয়ে গিয়ে সে তারই মতো চিন্তা এবং অনুভব এবং ক্রিয়া করতে থাকে। বস্তুত অনেকেই এমন হয়, তার মানে নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। বইটাই যা কিছু তারা পড়ছে তার ভিতরকার সমস্ত ভাব ও ধারণা ও আদর্শ পর্যন্ত তাদের মধ্য গিয়ে ভর করছে, ঠিক সেই রকম তারা তখন হয়ে পড়েছে, অথচ নিজেরা তা বুঝতেও পারছে না। তাদের প্রকৃতির শতকরা নিরানব্বুই ভাগ যেন মাখন দিয়ে তৈরি, আঙুলের একটু টিপ পড়লেই অমনি সেখানে দাগ বসে যাবে। সাধারণের চরিত্র এইরকম হয়। যা-কিছু সামনে এসে পড়ে, হয়তো অপর কেউ নিজের মতামতটি বললে, কোনো বইতে একটা কথা নজরে পড়ল, কোনো একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটল, কোনো পাড়া প্রতিবেশী একটা আজগুবি ইচ্ছার কথা বললে, সবাই একসঙ্গে এসে চোকে আর এলোমেলোভাবে জট পাকায়—একদিক দিয়ে চোকে তো অন্যদিক দিয়ে বেরোয়, আবার নতুন করে চোকে—যেন ইলেক্ট্রিক প্রবাহের আনাগোনার মতো। এ বিষয়ে তাদের লক্ষ্যও থাকে না। নানা জিনিস ভিতরে চোকার দরুন সেখানে বসে বেধে যায়, একটার সঙ্গে অপরটা কাটাকাটি করতে থাকে, প্রত্যেকটাই চায় মাথা উঁচু করতে। আর যার মধ্যে এই কাণ্ড চলতে থাকে সে বেচারী সমুদ্রে ভাসা সোলাখের মতো অনবরত চেউয়ের মাথায় নেচে বেড়াতে থাকে।

এমনি একটা গঠনবিহীন অচেতন জড়পিণ্ডবৎ হয়ে না থেকে আগে তোমাকে আশ-
চেতন হতে হবে। তোমার মধ্যে একটা সংহতি থাকা চাই, ব্যক্তিত্ব থাকা চাই, পারি-
পার্শ্বিকের উপর নিত্য নির্ভরশীল না হয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা চাই,—যা
কিছু পড়লে বা শুনলে বা দেখলে তার প্রভাবে অনবরত বদনাতে থাকলে চলবে না।
বাইরের জিনিসকে যেটুকু নিয়ে নিতে চাইবে সেইটুকুই মাত্র নেবে। তোমার লক্ষ্যের সঙ্গে
যেটা মিলছে না তাকে আপনা হতেই জেঁটে দিতে পারবে যে জিনিসকে নিজের মধ্যে নিতে
চাও না তা এনেও তোমার উপর কিছুমাত্র আঁচড় কাটতে পারবে না। এমনি হতে পারলে
তবেই সেখানে তোমার ব্যক্তিত্বের শুরু হলো। তার পর যখন গেই ব্যক্তিত্বটি ঠিকভাবে
গড়ে উঠেছে, তখনই তাকে তুমি ভগবানে নিবেদন করতে পারো। যে জিনিস তোমার
নিজেরই নেই তা তুমি দেবে কেমন ক'রে? যখন কিছুই তোমার নেই তখন কিছুই দিতে
পারবে না।

অহংসত্তাকে ভগবানে বিলীন করতে হলে তা সম্পূর্ণভাবেই উজাড় ক'রে দিতে হবে,
তার অবশিষ্ট কিছু অদেয় থাকলে চলবে না। আর তেমনভাবে দিতে হলে আগে চাই তোমার
নিজের অস্তিত্ব, যার উপর গড়ে উঠেছে তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব। ঐ দেহটি যদি তোমার
হাড়ের কাঠামোর উপর চামড়া দিয়ে এঁটে একটা বিশেষ আকৃতিযুক্ত না হতো, প্রাণের ওয়রনে
যেমন এনোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে। তেমনি যদি ঐ দেহের অবস্থাও হতো, তাহ'লে তোমার
চেহারাটি তলতলে জেলিনাচ্ছের চেয়েও অপক্লপ হয়ে দাঁড়াতো। তখন একটা অঙ্গ অন্য-
টার মধ্যে ঢুকে তানগোল পাকতে থাকতো, বিণুম্বনার গীনা থাকতো না। তাই গোড়া
থেকেই তোমাদের শক্ত রকমের গঠন দেওয়া হয়েছে। এখন হয়তো তোমরা বলবে এমনি
দেহ নিয়েই তো হয়েছে মুশকিল, শক্ত হয়ে থাকে, কিছুতে নরম হয়ে নুইতে চায় না, ভগবানের
মধ্যে গলে যাবার বতো কিছুতে একে তরল করা যায় না! কিন্তু এর দরকার ছিল এমনি
হওয়া। আবার দেহকে ছেড়ে যদি প্রাণের রাজ্যে চলে যাও তাহ'লে সেখানে গিয়ে দেখবে
কি এনাহী কাও যত রকমের স্পন্দন আর প্রবাহ আর শক্তির দ্রুত ক্রমাগতই সেখানে ছোটা-
ছুটি করছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, নিশে যাচ্ছে, পরস্পরে লড়ে গিয়ে কাটাকাটি করছে, কেউ
কাউকে গিলে ফেনছে, কেউ কাউকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, অনবরত এই চলেছে। সেখানে
কোথায় ঝুঁজে পাবে তোমার ব্যক্তিত্ব, কেবল চলেছে শক্তির ঠেলাঠেলি, প্রকৃতি ও কাননার
আধিপত্য। তার মধ্যেও যে কোনো রূপ নেই তা নয়, কিন্তু সে হলো নানা শক্তির রূপ।
যে সকল শক্তি সেখানে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদেরই রূপ, তারা হয়
দেবতা না হয় দানব!

তার পরে ধরো মনের কথা। মাখার ভিতরকার অর্থাৎ নস্ত্রিকের নিজস্ব বিভাগের কথা
ছেড়ে দিয়ে যদি তুমি দেহগত ননটির সর্বক্কে সচেতন হতে পারো, তাহ'লে দেখবে সেখানেও

চলেছে হাটের হাটগোল কত রকমের ধারণা এবং অনুমান সেখানে ভিড় জনিয়েছে, তারা অনবরত বন্বন্ ক'রে ঘুরছে আর পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধাচ্ছে—কখনো বা তার থেকে দূরতনাও ঘটে যাচ্ছে। তার মধ্যে তোমার সত্যিকার মনটি কোথায় সে তুমি বুঝেই পাবে না।

নিজেকে অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিকে এর ভিতর থেকে শুধু গড়ে তুলতেই অনেক বছর পরিশ্রমের দরকার—খুব যত্নের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অতি ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমন্বিত ক'রে তাকে গড়ে আনা, যাতে তুমি নিজের স্বতন্ত্রভাবে ভাববার মতো হয়ে দাঁড়াতে পারো। তোমরা মনে করো যা কিছু ভাবো তা বুদ্ধি নিজের তরফ থেকেই ভাবছ, কিন্তু তা তো নয়; যাদের সঙ্গে তুমি আলাপ করেছ, যে সকল বই তুমি পড়েছ, যত কিছু ভালোমন্দ প্রভাববৈচিত্র্য তোমার মধ্যে ক্রিয়া করেছে, তারই উপর যে তোমার চিন্তা-ধারা কতখানি নির্ভর করেছে সে ধরন কিছুই তুমি রাখো না। এমন কি তা অনেক সময় আরো অনেকটাই নির্ভর করে তোমার পেটের হজমক্রিয়ার ভালোমন্দ অবস্থার উপর, বন্ধ বাতাসে বা মুক্ত বাতাসে বাস করছ তার উপর, তোমার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী কেমন তার উপর, কোনোদিন রোদ উঠেছে বা কোনোদিন বৃষ্টি হচেছ তার উপর। এগুলিকে তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখ না, কেবল যেমন যেমন অবস্থা আসে কিংবা পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেই অনুযায়ী একই জিনিস সয়ক্কে বিভিন্ন ধরনে ভাবতে শুরু ক'রে দাও, অথচ তোমার নিজের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। তাই বলছি, নিজের চিন্তাকে তেমন সূচিনাস্ত, সুসংযোজিত ও যুক্তিসহ করতে বহুদিনের পুখানপুখ পরিশ্রমের দরকার হয়।

তার পর শেষকালে সবচেয়ে কঠিন কথা হলো এই যে, নিজের মনটিকে যখন তুমি এত কষ্ট ক'রে মজবুত একটা আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে পরোপরি গড়ে তুলেছ, ভগবানের সঙ্গে মিলতে চাইলে সেই গড়নাটিকে প্রথমেই চুরমার ক'রে ভেঙে ফেলতে হবে! কিন্তু প্রথম কাজটি সম্পূর্ণ না হলে তুমি এই দ্বিতীয় কাজটি করতে পারবে না, অর্থাৎ নিজেকে আগে গড়ে না তুললে নিজেকে দিয়ে দিতে পারবে না, কারণ তখনও ভগবানকে দেবার মতো কিছুই তোমার হয়নি। এখন যে জিনিস তোমার মধ্যে রয়েছে সে তো কতকগুলি অসম্পূর্ণ ভাল-পাকানো ব্যাপার, সে তুমি নিজে নয়। আগে আপনি হয়ে ওঠো, তবে তো আপনাকে দেবে।

বর্তমান কালের যে অবস্থা তাতে দেহটাই ভগবানকে নিবেদন করা যেতে পারে। অথচ এটি কেউ করে না। হাঁ, আমি সেই কথাই বলি, তাঁকে নিবেদন করো তোমার দেহ দিয়ে করা কাজগুলি, তোমার দেহেরই যা পরিশ্রমের জিনিস; কাজ তো অনেক রকম করো, কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু থাকে যা সত্য নয়, ঝাঁটি জিনিস নয়।

কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, দেহকে কেমন ক'রে ভগবানের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া যাবে? মন, প্রাণ, চিন্তা, ভাব, ধারণা, আত্মপূহা প্রভৃতির বেলা তা করা যায়, কিন্তু শূন্য দেহের

বেলা কেমন ক'রে তা হবে? সে তো এমন জিনিস নয় যে কড়াইএর মধ্যে ফেলে দিলেই গলে যাবে! অথচ সেহটাই একমাত্র বস্তু যাকে তুমি নিজের নান ধরে অনুকল্প অমুক বলে ডাকতে পারো—যদিও তাও একটা অভ্যস্ত আচার ছাড়া আর কিছু নয়। আয়নার স্তম্ভে ধাঁড়িয়ে যদি নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখে তো স্পষ্টই দেখবে, কুড়ি বছর আগে যে তুমি ছিলে সে তুমি আর এখন নেই, এ একজন অন্য লোক, সেই লোকটিকে এর মধ্যে চেনাই যায় না। তবু এই বোধটি তোমার থাকে এ সেই একই মানুষ, এও সেই তুমি। এই যে পূর্বাপর গঠনপ্রাপ্ত তোমার দেহটি, যার মধ্যে নিজেকে তুমি সব চেয়ে বেশি ক'রে চিনতে পারছ, একে দিয়েই তোমার নিবেদনের কাজ শুরু করো।

বেশিরকম জ্ঞানিতার মধ্যে তোমাদের চানতে চাই না। যদি জ্ঞানতে চাও যে ভগবানের মধ্যে বিশেষ যাবার কিংবা বিলীন হয়ে যাবার উপায় কি, তাহ'লে সব চেয়ে আগে জ্ঞানতে হবে যে তুমি কোন জিনিস, আমি বলতে কাকে বোঝো। দেখাই যাচ্ছে যে তোমার 'আমি' মানেই তোমার অহং। এ জিনিস তোমার মাঝে আছেই। এটি প্রথম থেকে তোমার ভিতরে থাকবার দরকার হয়েছিল, এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা রূপে তোমাকে চেতন ক'রে দেবার জন্য—অর্থাৎ এমন একটা হাটবাক্সেরে জগাখিচুড়ি হয়ে থাকবে না যেখানে সব রকমের জিনিসই একসঙ্গে বিশেষ ভানগোণে পাকাচ্ছে; তোমার মধ্যে বিশেষ একটা স্বাভাব্যের পরিচয় থাকবে। তোমার মধ্যে একটি অহং দেওয়া হয়েছে এইজন্যই, আর তোমাকে আলাদা একটি চানড়া ঘেরা সীমাবদ্ধ দেহসত্তাও দেওয়া হয়েছে এইজন্যই। বাইরের জিনিস অন্য কিছুই ওর মধ্যে ঢুকতে পারে না (যদিও লোনকুপের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু সামগ্রী ঢুকতে পারে, কিন্তু তাও তোমার অনুমোদন ছাড়া নয়)।

নিজেকে আলাদা ক'রে গড়ে তুলবে, নিজের সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন হবে—কেবল সাধারণভাবে নয় কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। প্রত্যেকটি অংশ যাকে তোমার তুমি বলে জানো, সেই সমস্ত অংশকেই কেন্দ্রীভূত করবে একটি জায়গাতে যেটি তোমার দিব্য সত্তা, যেখানে রয়েছে তোমার মূল তুমি, তাহ'লে সকল অংশকে নিলিয়ে এক স্তম্ভযোজিত একত্রে পৌঁছতে পারবে। এইভাবে আপন দিব্য কেন্দ্রকে ঘিরে যখন তুমি এক সঙ্গতিপূর্ণ ও সচেতন ব্যক্তি হয়ে উঠেছ, তখনই ভগবানের কাছে নিজেকে পূর্ণ নিবেদন করতে পারো এবং ভগবানের সঙ্গে বিশেষ যেতে পারো তখনই তার স্তম্ভযোগ ও সময় উপস্থিত হবে, সেই প্রকৃতরূপের মিলনটি তিনি সংঘটিত হতে দেবেন। ব্যক্তির যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখনই তোমার অহং ভগবানের মধ্যে বিলীন হবে, অর্থাৎ তখন তুমি বেঁচে রয়েছ কেবল তাঁকেই নিয়ে এবং তাঁরই জন্য।*

* শ্রীমদীকান্ত গুপ্ত অগ্নি Yoga of Sri Aurobindo, part VIII হইতে To melt ; Divine পরিচ্ছদের অনুবাদ। অনুবাদক—শ্রীগুপ্তি ভট্টাচার্য

যোগের প্রথম পাঠ

কয়েকটি ব্যাখ্যা।

শ্রীঅন্নবিন্দু

প্রশ্ন—জপ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কি দিব্য-জীবনের দিকে অতীপ্সারই চিহ্ন নয়? এগুলি সর্বোচ্চ সত্যো পৌঁছানর পথে সহায় হয় না কি?

উত্তর—কোন মনোভাব নিয়ে এগুলি করা হয়, তারই উপর সব নির্ভর করে। নোকে এসব কিছু করেও অধ্যাত্মিক এমন কি অমৃতও থেকে যেতে পারে।

প্রঃ—তীর্থব্রহ্মণ এবং নানা দেব-দেবীকে পূজা করবার কি কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য আছে? ভাগবত সত্য উপলব্ধি করতে তা কোনও সাহায্য করে কি?

উঃ—সত্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই; এসব হল মানুলি চেতনার ধর্মমূলক অনুষ্ঠান।

প্রঃ—বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্কীর্তনের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ—তার মধ্যে ভক্তি উদ্রেক করার এক শক্তি আছে, বিশেষতঃ প্রাণিক অংশে।

প্রঃ—আনি এক ধর্মগ্রন্থে পড়েছি যে যদি কোন পরিবারে একজন কোনও রকম আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করে, তবে সে-পরিবারের সবাই তার প্রভাবের গুণে মুক্তি পেতে পারে। এ কথা কতদূর সত্যি?

উঃ—এ-কথা সত্যি নয়। প্রত্যেকেরই আছে আপন নিয়তি,—কোনও জীবনে কোনও বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করাটা গোপ ঘটনা।

প্রঃ—রামকৃষ্ণ বলতেন যে যদি কেউ ভগবানকে স্মরণ করে এবং অন্য কারো সামনে তাঁর নাম অল্প সময়ের জন্যও উচ্চারণ করে, তবে তার ফল একদিন ফলবেই, এবং অপর ব্যক্তিটির মধ্যেও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনবে। এ-রকম হওয়া কি সম্ভব?

উঃ—একটা ইন্দুরের কাছে গিয়ে “সিংহ, সিংহ” বলে তাকে যতটা সিংহে পরিণত করতে পারে যায়, বোধ করি এও সেরকম।

প্রঃ—যারা সর্গদশ ভাগতিক জীবনে নিমজ্জিত থাকে, এবং কেবল বিপত্তির ও সঙ্কট নুহুর্ভেট ভগবানকে স্মরণ করে, তাদের কি ভগবানের প্রতি একান্তভাবে ফিরে দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে ?

উঃ—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সকলেরই থাকে, এমন কি যোগ নাস্তিক বা যারা কোনদিন ভগবানের কথা স্মরণও করেন না, তাদেরও।

প্রঃ—যদি নাস্তিক বা যারা কোনদিন ভগবানকে স্মরণ করেন না তাদেরো ভগবানের দিকে একান্তভাবে ফিরে দাঁড়াবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করা এবং সেখানকার বাধাবিঘ্নের সঙ্কুশীন হবার সার্থকতা কি ?

উঃ—না হলে সেই ভাবী সম্ভাবনা সফল হয়ে উঠতে দশ হাজার বছর লাগবে, আর তা-ও আবার যোগ-সাধনা ছাড়া হতে পারবে না।

প্রঃ—সাধারণ মানুষ সঙ্কটনুহুর্ভেট ভাগবত করুণার সাহায্য আহ্বান করে কিন্তু পরে ভগবানকে ভুলে যায়। মানুষের জীবনে সে-করুণার ক্রিয়া-প্রকৃতি কি এই রকমই ?

উঃ—কেবল সাধারণ লোকের ক্ষেত্রেই তা এরকম, ভগবৎ-অনুগমন ক্ষেত্রে অন্য রকম। ভগবানের বিশেষ করুণা তাদেরই উপর যারা তাঁকে চায়। অপরদের ক্ষেত্রে, তাদের কর্ম আশ্রয় করে সক্রিয় এক বিশ্ব-ইচ্ছা।

প্রঃ—ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত করুণার মধ্যে পার্থক্য কি ? তারা কি অভিন্ন নয় ?

উঃ—ভাগবত ইচ্ছা সব কিছুর মধ্যে সক্রিয়—তা সর্বক্ষম। ভাগবত করুণা আসে সহায় হতে, জ্ঞাপ করতে।

প্রঃ—যে-সাধক বর্তমান জন্মে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে খুলে না ধরতে পারে, আগামী জন্মে সে যোগ-জীবন গ্রহণ করবে এবং তার সাধনা চালিয়ে যাবে, এ-কথা কি বলা যায় ?

উঃ—হ্যাঁ, সে তা' করবে, একথা প্রায় নিশ্চিত, তবে পুনরারম্ভের আগে যদি পণের বাধা-স্বরূপ বিরুদ্ধ উপাদানগুলি নিঃশেষ করবার জন্য ব্যাপৃত না হতে হয়।

প্রঃ—যারা এ-জন্মে আংশিকভাবে ভগবানের প্রতি ফিরে জাগতিক লক্ষ্য অনুসরণ করে, আগছে জন্মে পুরোপুরিভাবে তারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, এ-কথা কি-বলা যায় ?

উঃ—তেনন কোনও নিয়ম বাধা নেই—তারা কি হয়ে উঠেছে, তাদের বর্তমান কি অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি হবার অভীপ্সা, সে-সব ধরেই চলবে তাদের বিবর্তন।

প্রঃ—কোনও ব্যক্তি, যে জীবনে কোনদিন ভগবানের কথা চিন্তাও করেনি, তার মৃত্যু-শযায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে যদি তাঁর নাম জপ করে, অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তার আগামী জন্মে তবে সে মুক্তি পাবে, এই জাতীয় এক ধারণা প্রচলিত আছে। এর ভিত্তি কি কোনও সত্য আছে ?

উঃ—না—এ কুসংস্কার চাড়া কিছুই নয়। নৃত্তি যদি অতট সোজা হত, তবে সকলেই সারা জীবনব্যাপা যা-খুসি করে শেষের নুহুর্ভটি কেবল “ভগবান্”-স্বরূপের ভেলকী দিয়ে তরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হত। এ-ধারণা উর্বর মস্তিষ্ক হতে প্রসূত।

প্রঃ—পুরাণে বহু উৎসর্গতন ভগৎ বা লোকের উল্লেখ আছে। মানুষ কি নৃত্তার পর এইসব লোকে যায় ও সেখানেই বাস করে?

উঃ—তার কয়েকটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সবগুলি নয়।

প্রঃ—মানুষের ধারণা যে ষে-ব্যক্তি সং বা ধানিক জীবন যাপন করে, নৃত্তার পর সে স্বর্গে যায়। এ কথা কি সত্যি?

উঃ—নৃত্তার পর ধানিককণ একটা শান্তিনয় অবস্থায় সে থাকতে পারে, তার বেশা কিছু নয়।

প্রঃ—পুরাণে এ-কথারো উল্লেখ আছে যে অন্য জগতে সহস্র সহস্র নরক আছে, এবং যারা এ-জীবনে পাপ করে, নৃত্তার পর তাদের সেখানে গিয়ে বাস করতে হয়। এ-কথা কি সত্যি?

উঃ—ওটা কুসংস্কার। নৃত্তার পর মানুষকে প্রাণিক ও মানসিক কয়েকটা লোক অথবা অতিপ্রাকৃত নৃক্ষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—তা তার এ-জীবনে আপন প্রকৃতি ও কর্মেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরে তারা চৈতন্যিক লোকে চলে যায় এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

প্রঃ—অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে বহুদিন পূর্বে নৃত্ত আত্মীয়দের সঙ্গে আবার দেখা ও কথাবার্তা হয়। এরকম কেন ঘটে?

উঃ—এই শারীরিক জীবনের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য সব তারা রেখে দেয় প্রাণ-লোকে। এই প্রাণ জগতেই তাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়।

প্রঃ—নৃত্তের পক্ষে তার আত্মীয়কে বিরক্ত করা এবং সাধনায় ব্যাঘাত ঘটান সম্ভব কি?

উঃ—কেবলমাত্র সাধক যদি তা করতে দেয়, তবেই।

প্রঃ—যোগে কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোনও স্থান নেই?

উঃ—জ্যোতিষ হল ওহা (occult) বিজ্ঞান—ঠিক ঠিক মনোভাব নিয়ে করলে সব কিছুই যোগের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে; তাবলে নিজেই সে কিছু যোগের অংশ নয়।

প্রঃ—আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ কি জ্যোতিষ-বিদ্যা থেকে কোনও সাহায্য পেতে পারে?

উ:—না ।

প্র:—জ্যোতিষ সম্বন্ধে মানুষের কি ননোভাব হওয়া উচিত ?

উ:—যেমন রাখা হয় অন্য শিল্প বা বিজ্ঞানের প্রতি ।

প্র:—যোগে ওহাশক্তির স্থান কি ?

উ:—অতিপ্রাকৃত স্তরের সূক্ষ্ম শক্তিগুলি জানা যোগের অঙ্গ ।

প্র:—সূক্ষ্ম প্রয়াস 'ও' এই অলৌকিক ক্ষমতার অর্থ কি ?

উ:—কেন্দ্রবিশেষে তার নানা অর্থ । সাধারণত তা হল প্রকৃতির ওপ্ত শক্তিকে কাজে লাগাবার সাহায্য এবং সে-সব শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রয়াস করা । আবার অন্য কেন্দ্রে "ওহা" বলতে অন্য কিছুও বোঝাতে পারে ।

প্র:—সকল যোগীকেই কি এই সূক্ষ্ম প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ?

উ:—না, সে-ক্ষমতা সকলের থাকে না । যাদের নেই, যতদূর না দেওয়া হচ্ছে ততদূর তাদের অপেক্ষা করতে হয় ।

প্র:—ভাগবত-শক্তি আর যোগশক্তি কি একই জিনিস ? অর্থাৎ যে শক্তি যোগীরা তপস্যার সাহায্যে লাভ করেন ?

উ:—ও জাতীয় যোগশক্তি এবং ভাগবতী শক্তি এক নয় । শক্তি আবার অসুর এবং রাক্ষস-দেরও আছে । ভাগবত চেতনা 'ও' তার ক্রিয়াধারার সঙ্গে সংস্পর্শ 'ও' সম্মিলন থেকে জন্মে যে শক্তি তা-ই আসল যোগশক্তি ।

প্র:—সাধকের জীবনে কি দৈব ঘটনা ঘটে ?

উ:—দৈব ঘটনা বলতে তুমি কি বোঝ ? লোকে যা অলৌকিক ব'লে অভিহিত করে, তা 'হল যা-কিছু ঘটে চমকপ্রদভাবে তাদের বুদ্ধির অগম্য কোনও উপায়ে ।

প্র:—ভোক্তবাহী দেখানর মত কোনকিছু করবার শক্তিকে কি যোগসিদ্ধি বলে ? সাধক যদি এ-জাতীয় কোনও শক্তিতেই গিচ্ছিলাভ করে থাকে, তবে তার প্রয়োগ করাটা কি অনায়াস ?

উ:—আমি ইতিপূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে অলৌকিক বলে কিছুই নেই । যদি কোনও উত্পত্তন চেতনা সাধকের ভিতরে কোনও উত্পত্তন শক্তির দ্বার খুলে দেয়, তবে সাধককে এক নতুন চেতনার অংশ বলেই তাকে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে—অহনিকা, স্বার্থপরতা, অভিমান, দম্ব বর্জন ক'রে, ঠিক ঠিক ভাবে ।*

* Elements of Yoga-র অনূবাদ ।

উপনিষদের সাহিত্য-শ্রী

শ্রীঅন্নবিন্দু

উপনিষদই ভারত মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান, ভারত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, গভীর চিন্তা ও বাক্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে সাধারণত : সাহিত্য বা কাব্য বললে যা বোঝা যায় সে শ্রেণীর রচনা এ নয়, গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশনক ভ্যোতিঃস্পর্শ হ'ল আমাদের উৎকৃষ্টতম সাহিত্য। তার একটা বিশেষ অর্থ আছে; তা থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের মনোবৃত্তি অনন্যতুল্য, তার প্রাণের প্রবৃত্তি অসাধারণ।

উপনিষদ সব একাধারে গভীর ধর্মশাস্ত্র, বোধিদীপ্ত তত্ত্বকা এবং অপূর্ণ আধ্যাত্মিক কবিতা; তাতে অতলম্পর্শী সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। সত্যের মর্ম উন্মোচন করেছে তার বোধিলব্ধ জ্যোতির্ময় শক্তির ব্যাপক সব দার্শনিক তথ্য; আর পনোই হ'ক, স্থলনিত গদ্যেই হ'ক, তার অনুপ্রেরণা অবিতর্ক ও অনাদিসিক্ত, তার শব্দযোজনা অমোঘ, তার নানিত্য ও প্রকাশ চমৎকার। - ধর্ম দর্শন ও কাব্য এক হয়ে আছে যে মনীষাতে তাই ফুটে উঠেছে উপনিষদে। কারণ, সে ধর্ম শুধু অনুষ্ঠানে শেষ হয় নাই অথবা একটা নীতিবাদ বা আচাৰের শাসনে জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টাতেই পর্যবসিত হয় নাই। তার উত্থগতির প্রবেশ ভগবানকে, পরমাত্মাকে, আমাদের আত্মার ও অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র সম্বন্ধে অনন্ত বিভাবে আবিষ্কার করেছে এবং প্রদীপ্ত জ্ঞানের পরমানন্দ থেকে, পূর্ণ সংসিক্ত ও ভাবোচ্চল অভিজ্ঞতার হর্ষোন্মাদ থেকে তার বাণী এসেছে। সে দর্শন পরম সত্য সম্বন্ধে অথবা যুক্তিসিক্ত কোন নীমাংসা সম্বন্ধে বিচার বুদ্ধির বস্তুবিচিহ্ন আলোচনা নয়, সে হল অন্তরতম আত্মা দেখেছে, অনুভব করেছে, বিধাহীন আবিষ্কার ও নিশ্চিত্ত অধিকারের আনন্দে চিত্তপটে সযত্নে রক্ষা করেছে যে সত্য তারই রূপ। আর সে কবিতা সৃষ্টি করেছে সাধারণ মনের ক্ষেত্র থেকে বহু উর্ধ্বে আসীন রসবেদী অন্তর, তাতে ছন্দিত হয়েছে অতিদূর্লভ আধ্যাত্মিক সব অনুভূতি এবং মানব আত্মা, ভগবান ও বিশ্ব সম্বন্ধে গভীরতম ভাস্করতম সব সত্যের পরম সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব। বেদের ঋষিদের বোধিদীপ্ত মনীষা ও অন্তরতম চেতনিক অভিজ্ঞতা চরম পরিণতি লাভ করেছে উপনিষদে। ফলে, কঠোপনিষদের ভাষায়, আত্মা তার স্বীয় তনু বিবৃত করেছেন, এমনকি, তা প্রকাশের ভাষারও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং তার ছন্দের যে স্পন্দন জাগিয়েছেন আধ্যাত্মিক শ্রবণে তার নিত্য অভ্যাগে, মনে হয় যেন, আত্মাকে গড়ে তোলেন এবং তাকে পবিত্র ও সম্পূর্ণ করে আত্মজ্ঞানের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপনিষদের এই বিশেষত্বের উপরে জ্ঞান দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ বিদেশী অনুবাদকেরা এম্ফটিক উপেক্ষা করেছে। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থাৎ তারা পরিস্ফুট করতে চেয়েছে কিন্তু তার মূল যা ছিল সে মনন-দর্শনের প্রাণ বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পূনক তারা আদবেই অনুভব করেনি। অথচ সে সময়ে এবং এখনও যারা সে লোকে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে এই সব উজ্জ্বল স্মরণ হয় তাদের শুধু বুদ্ধি নয়, আত্মা ও সমগ্র সত্তা সে-সব প্রত্যাদেশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে ও হচ্ছে। আর তার পুরাতন 'প্রতি' নাম সার্থক, কেননা তার বাণী কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা বা বাক্য নয়, আধ্যাত্মিক শ্রবণ, অন্তরের কানে শোনা সত্তা, ঈশ্বর-প্রণোদিত ধর্মপাত্র।

তবে উপনিষদের তত্ত্ববস্তুর উৎকর্ষ এখন আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার প্রয়োজন নাই, তা সর্ববাসীসম্মত, সব দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তা স্বীকার করেছেন, উপরন্তু দর্শনের সমগ্র ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষে সব গভীর দার্শনিক মতবাদ, সব ধর্ম জন্মেছে উপনিষদ থেকে, তাকেই মূল বলে স্বীকার করেছে সে সবই সেই পরম জ্যোতির উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে—হিমালয়ের ফোড়ে লানিত সব মহতী নদীর মত—দেশের মনপ্রাণ সতেজ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার আত্মাকে সজীবিত রেখেছে, অক্ষুণ্ণ প্রাণপ্রদ বারির উৎসমূলে ফিরে এসে নূতন আলোকের রসায়ন সর্গদা দেশে বিতরণ করেছে, রিক্তহস্তে কখনও কাকেও ফেরায় নি। বৌদ্ধধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সব মতবাদ শুধু নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা ও বিচারের নূতন ভাষাতে উপনিষদের অভিজ্ঞতার বিশেষ একটা দিক বর্ণনা করেছে, এবং নূতন আকার দিয়ে কিন্তু বিষয়বস্তু প্রায় অপরিবর্তিত রেখে তাকে সমস্ত এশিয়া-খণ্ডে ও পশ্চিমে যুরোপের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পিথাগোরাস ও প্লেটোর লেখাতে বচস্থানে উপনিষদের ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং খৃষ্টীয় প্রথম যুগের জ্ঞানবাদের (Gnosticism) এবং প্লেটোর মতাবলম্বীদের নূতন যোগবাদের (Neo-Platonism) গভীরতম তত্ত্বাংশের ত সেই হল উপাদান। ফলে উপনিষদ সাক্ষ্যভাবেই যুরোপের দার্শনিক চিন্তাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। এদিকে সূফির অন্যধর্মের ভাষায় উপনিষদের অভিজ্ঞতারই পুনরুজ্জীবিত করেছে। জার্মান দর্শনের বহলাংশেই, আবার, পুরাতন প্রস্থানে যেসব সত্তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল বিচারবুদ্ধির দ্বারা সে-সবেরই বিস্তার করা হয়েছে। বর্তমান যুগের স্তম্ভীরাও সে-জ্ঞান হ্রত গ্রহণ করছে এমন জীবন্ত ও তীব্র আগ্রহে যাতে ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার ভগতে একটা আসন বিস্তারের আশা জাগিয়ে তুলছে অচল্যতন জড়বাদের বিরুদ্ধে। অনশা সে-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে কোথায়ও বা বাঁকা পথে অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে, কোথায়ও বা সোজাপথে উন্মুক্ত প্রণালী দিয়ে কম বেশী স্বয়ংগতিতে। কিন্তু প্রধান প্রধান দার্শনিকতত্ত্বের মধ্যে কোথায়ও এমন একটাও আছে কিনা সন্দেহ যার মূল বা বীজ বা নির্দেশ এই প্রাচীন রচনাতে নাই;—অথচ, এই সব অমূল্য গবেষণা যে মনীষার,

আছে এক শ্রেণীর পণ্ডিত যারা বলে যে সে মনীষার পুরাকীর্তি, সে মননের পটভূমি, বেদ, অশিষ্ট ও বর্ধরোচিত, অজ্ঞান প্রকৃতিপূতা ও প্রেতগাভ্রণা ! এমন কি বর্তমান তত্ত্ববিজ্ঞানেও আবিষ্কৃত প্রকৃতির ব্যাপকতম সাধারণ নিয়মগুলিও---আমরা অবিরাম দেখছি---গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান থেকে প্রাচীন ভারতের স্মরীরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির সত্যের যে-সব সূত্র দিয়েছেন যে-সবের বৈলক্ষ্য ও ব্যাপকতম অর্থের অনুগামী ।

তবে, এসব সিদ্ধান্ত বুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক অনুসন্ধানের ফল নয় । তা'র প্রক্রিয়া হল তত্ত্বগত বিশ্লেষণের দ্বারা বহু আশ্রয়ে সব ধারণার স্বচ্ছ স্ফুট দিয়ে, তার মধ্যে সত্য ধারণা-গুলি নির্ণয় করা, তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সত্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা, অথবা অস্ত্রের বাস্তব বা বুদ্ধির পছন্দমত কোন ধারণা বুদ্ধির দ্বারা প্রতিপন্ন করা এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা স্বীকৃত কোন একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে, কেবলমাত্র সেই ধারণার সূত্র ধরে সমস্ত জীবনের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে এবং সব-বস্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, সেই কেন্দ্রের ও পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা নিরূপিত করে তৃপ্ত থাকা । এ পদ্ধতির কোন স্থান উপনিষদে নাই । সে ভাবের রচনা হলে উপনিষদের প্রাণ এমন সূত্ৰাঙ্কুরী হত না, তা'র প্রভাব এমন অমোঘ হত না, তার শিক্ষা এমন ফলপ্রসূ হত না, অথবা মানব-জ্ঞানের অপরাপর বিভাগের বিভিন্ন, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত, পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের দ্বারা তার উজ্জ্বল এমন নূতন ক'রে সমর্থিত হত না । এসব ঋষিরা সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেছিলেন, ভেবে বাস করেননি । বোধিতক প্রত্যয় ও অর্থদ্যোতক রূপক চিত্রে সে সত্যের একটা স্ফুট পরিলক্ষ্য তাঁরা দিয়েছেন বটে কিন্তু এমন আশ্চর্য তার স্বচ্ছতা যে তা ভেদ ক'রে অনির্বাচনীয়ার স্বরূপ বিবৃত হয়েছে । কারণ সব-বস্তুর সত্যই তাঁরা আনুল দেখেছেন স্বরূপ অস্তিত্বের আলোকে এবং অনন্তের চোপ দিয়ে ; সেইজন্যই তাঁদের বাণী চিরকাল জমর ও জীবন্ত হয়ে আছে, নিত্যা নূতন তাৎপর্ষের সন্ধান তাতে মিলছে, তার প্রামাণ্য অপরিহার্য রয়েছে ; সেই জন্যই তাকে যেমন সববিষয়ে শেষ কথা বলে গ্রহণ করা যায়, তেমনি আবার সেখান থেকে হয় সত্যের নূতনরূপে নবজন্ম সব গবেষণার সূত্রই চরনসীমা অবাধি অনুসরণ করলে সেই সত্যেই উপনীত হতে হয় এবং যে-সব যুগে, যে-সব স্মরীদের অতৃপ্তি বৈশী খুলেছে, সে-যুগের মানুষ, সে-সব স্মরীরা সেখি আবার সত্যের সেই নির্বাচনেই ফিরে এসেছে ।

উপনিষদকে 'বেদান্ত' বলা হয়, এমন কি বেদের চেয়েও জ্ঞানের তা মহত্ত্বর আকর, কিন্তু 'জ্ঞান' শব্দের ভারতপ্রচলিত গভীরতর অর্থ । জ্ঞান শুধু মনন বা বুদ্ধির বিচার নয়, বীজজ্ঞির দ্বারা সত্যের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ অনুেষণ ও আবিষ্কার করা নয়, জ্ঞান হল সত্যকে আবার প্রদীপে দেখা, অস্ত্রপুরুষের সব শক্তি ও বৃত্তি নিয়ে সর্বতোভাবে তার মধ্যে বাস করা, জ্ঞেয়ের সঙ্গে একপ্রকার একাত্মতার দ্বারা তাকে চিরস্থিতে ধারণ করা । এবং এ ভাবের সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় শুধু সমগ্রভাবে আত্মাকে জ্ঞান হলে,

সুতরাং বেদান্তের ধর্মিকা এই 'আমি'কেই জানতে চেয়েছেন, তার মধ্যে বাস করতে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেছেন। আর এই প্রয়াসের ফলে তাঁরা সহজেই দেখতে পেলেন যে, আমাদের এই 'আমি' ও সববস্তুর সার্বজনীন সত্তা অভিনু, এবং সে সত্তা আবার ভগবান বা ব্রহ্মের সঙ্গে, বিশ্বাতীত পুরুষ বা অস্তিত্বের সঙ্গে অভিনু। সর্বাঙ্গীণ ঐক্যসাধক এই একাত্মদৃষ্টির আলোকে দেখলেন তাঁরা বিশ্বের এবং মানবের আন্তর ও বাহ্য জীবনের সববস্তুর অন্তরতন সত্তা, যে সত্তা তাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন, তার মধ্যে তাঁরা বাস করতেন। এই আত্মজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মহাকাব্যোচিত প্রশস্তিই হল উপনিষদ। দার্শনিক তত্ত্বের বিবৃতি তাতে প্রচুর আছে, কিন্তু সেসব বুদ্ধির গড়া বস্তুবিবিক্ত সাধারণ নিয়ম বা সামান্য প্রতিজ্ঞা নয়, যার কিরণে শুধু মনই আলোকিত হয়, যা প্রাপবান নয়, আত্মাকে যা উৎসাহী প্রেরণা দেয় না। উপনিষদের তত্ত্ব হল সংবোধি ও প্রত্যাদেশ লব্ধ জ্ঞানসূর্যের আলোক ও উদ্ভাপ, একমাত্র সমস্তুর, সর্বাঙ্গীত পরমসেবের তথা সর্বময় পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য ও দর্শন, এবং এই বিরাট বিশ্ব-অভিব্যক্তিতে সব পদার্থ ও জীবের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আবিষ্কার। ঈশ্বর-প্রণোদিত জ্ঞানের সঙ্গীত সে-সব এবং, সব ভক্তনের নভই, ভগবন্মুখী অতীপ্সা ও হর্ষোন্মসই তার প্রাণ, তবে সে উন্মাস ক্রুহ্রতর আনুষ্ঠানিক ধর্মচরণ থেকে জাত হৃদয়াবেগের সংকীর্ণ ও তাঁর উন্মাননা নয়, উপচার পূজা ও বিশেষ ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি অতিক্রম করে তা পরিণত হয়েছে স্বপ্রতিষ্ঠ সর্বময় অধ্যাত্মসত্তার সান্নিধ্য ও একাত্মতা থেকে জাত ভগবানের সার্বজনীন আনন্দে। তারপর আবার, উপনিষদের প্রধান উপজীব্য হল আভ্যন্তরীণ বীক্ষণ, মানবজীবনের বাহ্য কর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তার কোন সম্বন্ধ নাই; অথচ সত্যপ্রকাশ করতে তাঁরা তাকে বে রূপ দিয়েছেন, তাতে যেশক্তি সঞ্চার করেছেন তার জীবন্ত উদ্দীপনা ও স্ফুট তাৎপর্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের ও পুসবতী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সদাচার ও নীতির বিধান। তাছাড়াও তাঁরা নীতি বা পুণ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য সব লক্ষণের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের সঙ্গে এবং সর্বজীবের সঙ্গে একাত্মতার উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক কর্মের মহৎ আদর্শ দেখিয়েছেন। সুতরাং, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রাণহীন হবার পরেও উপনিষদ সব বেঁচে ছিল, তাদের সৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং তা থেকে ভক্তিমূলক সব মহৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম জন্ম নিয়েছে এবং ভারতে বহুমান ধর্মবুদ্ধি প্রবর্তিত হয়েছে।

উপনিষদ সৃষ্ট হয়েছে প্রত্যাদেশ ও বোধিদীপ্ত মনঃ তার জ্যোতিতে আলোকিত সব অভিজ্ঞতা থেকে, এবং তার বিষয়বস্তু সংগঠন, শব্দযোজন্য, রূপকচিত্র, ভাববিস্তারের দ্বারা—সবের উপরেই তার এই মূল বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে। সর্বাশ্রয়ী এই সব পরমসত্তা, একাত্ম-আত্ম-বিশ্বেশ্বরের এই সব সূক্ষ্মদর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে, হয়, এমন স্বল্পাক্ষর ও স্তম্ভের মত দৃঢ়সংহত বাক্যে যাতে অন্তশচকুর সামনে তখনই সেসব ভেসে ওঠে, হৃদয়ের অতীপ্সা ও অভিজ্ঞতার কাছে বাস্তব ও অবশ্যগ্রাহ্য হয়, আর না হয়, এমন কবিত্বময় চিত্রে যার সুস্পষ্ট

প্রকাশে বা ভাবের বর্ণানির অভিযান্ত্রিক্য সমগ্র অসীমকে সসীমের রূপকে ফুটিয়ে তোলে। পরম অধিতীয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু তার বহু বিভাগও প্রকটিত হয়েছে এবং বর্ণনার ব্যাপকত্বের গুণে উভয়েরই সমগ্র তাৎপর্য অকুণ্ণ আছে, এবং যথার্থ শব্দচয়ন ও বাক্যসংযোজনের ফলে স্বতঃই যেন প্রত্যেকটি বিভাগ তার নিজস্ব স্থান ও অপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধের সন্ধান পেয়েছে। সে অনুপ্রেরণার প্রবাহে উপস্থাপিত হয়ে মহত্বের সব তাত্ত্বিক সত্য ও শূন্যাতিসূক্ষ্ম চেতনিক অভিজ্ঞতা যেমন জিজ্ঞাস্য মনের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে তেমনই অনুসন্ধিৎসু চিন্তের কাছে নূতন পথের অফুরন্ত ইন্দ্রিত বহন ক'রে এনেছে। এখানে ওখানে এক একটা শ্লোক ছড়িয়ে আছে, এক একটা বিশিষ্ট বাক্য বা ক্ষুদ্র বাক্যাংশ আছে যার মধ্যে বড় একটা দর্শনের বইয়ের বিনয়বস্ত্র নিহিত আছে; অথচ সে-সব বলা হয়েছে আনুষঙ্গিক ভাবে, অনন্ত আন্তর্জ্ঞানের একটা দিক বা অংশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে। সব উজ্জ্বল স্বল্পপাক্ষর, অর্ধে ভরা অথচ সম্পূর্ণ প্রাণ্ডল, এত কম কথায় মর্মসত্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, এবং এমন অপরিণীত তার সমগ্রতা। ন্যায়ানুগ বুদ্ধির সমগ্রপ্রাণিত, ধীরগতি বাগ্‌বহল বিবৃতির পদ্ধতি অনুসরণ করা এ শ্রেণীর চিন্তার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেকটি বাক্য বা বাক্যাংশ, শ্লোক বা চরণ আসে আগেরটার পরে অনেকটা না-বলা মননের অবকাশ রেখে, সে নিশ্চয়তায় তা প্রতিস্থানিত হয়। সমগ্র বক্তব্যের মধ্যে সে ভাব উহা আছে এবং সে অবকাশের দ্বারা ও তা সূচিত হচ্ছে কিন্তু পাঠককে তা নিজে ভেবে গড়ে তুলতে হবে। আর সে চিন্তার দ্বারাতে এই সব ভাবগর্ভ নিশ্চয়তার অবকাশ বেশ প্রাণন্ত, যেন কোন অতিকায় যক্ষ সীমাহীন মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে একটা পাখর থেকে বহুদূরে আর একটা পাখরে লগ্না লগ্না পা ফেলে। প্রত্যেক উপনিষদের সংগঠনেই আছে অটুট সম্পূর্ণতা, বিভিন্ন অংশের সমবায়ী সম্বন্ধের সামগ্র্য ; কিন্তু তা বিহিত হয়েছে যে মনীষার দ্বারা তা রাশীকৃত সত্য এক পনকে দেখে এবং ভাবে ভরা নিশ্চয়তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় শব্দটি তুলে নেয়। যেমন শ্লোকে তেমনই স্থলনিত গদ্যে, সে ভাষার গতিচ্ছন্দ সর্বত্রই চিন্তার ও বাক্যের রূপ-রেখার অনুযায়ী। প্রত্যেক শ্লোকে চারটি ক'রে চরণ, প্রায় প্রত্যেক শ্লোকার্ধই স্বতঃসম্পূর্ণ, একটা ভাব তাতে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে—দুচরণের দুটা ভাব বা একই ভাবের দু'অংশ সংযোগ ক'রে গোটা শ্লোকার্ধের সে অর্থ আসছে। আর শব্দের গতিও তার অনুরূপ লগ্নে, চলেছে—প্রত্যেক চরণ সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট যতি দিয়ে ভাগ করা, স্বরপ্রবাহের প্রতিস্থানি বহুক্ষণ অন্তরের শ্রুতিতে ঝঙ্কৃত হয়, প্রত্যেকটিই যেন অসীমের এক একটা তরঙ্গ যা সে মহাসাগরের সমগ্র বাণী ও কল্লোল ব'য়ে আনে। এ কবিতাতে বেলে অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে দেখা শব্দ, পরম-চিন্তের গতিচ্ছন্দ; এ জাতীয় কবিতা এর আগে বা পরে কখনও রচিত হয় নাই।

উপনিষদের রূপক প্রয়োগের প্রথা বহুলাংশে বৈদিক প্রথাই পরিণততর রূপ। সাধারণতঃ যেসব চিত্রে বক্তব্য বিষয়ের সুক্করূপ সাক্ষাৎ ভাবে উদ্ভাসিত ক'রে সেই সব উপন্য

ব্যবহারই ঐশ্বর্যের বেশী মনঃপূত। তবে অনেকসময় বেদের সব সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে সেই পুণাতন সাক্ষেতিক অর্থে এবং বেদের কথঞ্চিৎ কম আনুষ্ঠানিক অংশের প্রয়োগ-প্রধার অনুরূপ রীতিতে। উপনিষদের এই অল্প আনন্দের চিন্তা প্রণালীতে সহজবোধ্য নয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তার অর্থবোধ করতে না পেরে ব্যর্থতার আক্রোশে রায় দিয়েছে যে এই সব গ্রন্থে উন্নততম দার্শনিক বিচারের সঙ্গে বিশেষ আছে মানবজাতির শৈশবের অপরিণত মনের অর্ধহীন অর্ধক্ষুণ্ণ বালভাষিত। বৈদিক যুগের মনোবৃত্তি, প্রকৃতি বা মূল ধারণা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপনিষদ নূতন চিন্তার দ্বারা ধরে চলেনি; একই পথে চলে ক্রমশঃ সেসবের পরিণতি সাধন করেছে এবং কতকাংশে, যে গুপ্তবিদ্যা বেদের সাক্ষেতিক ভাষায় আচ্ছাদিত ছিল তাকে মুক্ত আলোকে প্রকাশ করেছে, তাকে রূপান্তরিত করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারের উপযোগী করেছে। বিষয়ের অবতারণা করেছে বেদ ও ব্রাহ্মণের রূপক চিত্র ও মন্ডানুষ্ঠানের সাক্ষেত নিয়ে, তবে তার মুখ ঘুরিয়ে আভ্যন্তরীণ লোকাতিগ তাৎপর্য প্রকটিত করেছে, এবং সেইসব চেতনিক অভিজ্ঞতা থেকে নিজের পরিণততর ও বিদ্বন্ধতর আধ্যাত্মিক তথ্যবিচার আরম্ভ করেছে। অনেক অংশ আছে, বিশেষ করে গদ্য উপনিষদগুলিতে যা অবিকল এই রীতি অনুসরণ করেছে, তাতে জটিল, অক্ষুণ্ণ, এমনকি বর্তমান মনোবৃত্তির কাছে অস্বাভাবিক ভাষায় বৈদিক ধর্মানুসারী মনের সব প্রচলিত ধারণার—যথা, তিন বেদের মধ্যে প্রভেদ, তিন লোকের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সব বিগ্রহের—আত্মিক তাৎপর্য বলা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের চিন্তা তা থেকে উপনীত হয়েছে গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্যে। সুতরাং সেসব অংশকে অর্ধহীন বলে, অথবা শেষ পর্যন্ত যে গভীর চিন্তা এসেছে তার সঙ্গে সম্বন্ধহীন বালোচিত বুদ্ধিবিকৃতি বলে বর্ণন করা চলে না। পক্ষান্তরে, সেসব সাক্ষেতের মর্মে প্রবেশ করতে পারলে দেখা যায় তার তাৎপর্য কত গভীর। তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেহমনের সম্বন্ধজ্ঞান থেকে উপরে উঠে নন ও আত্মার সম্বন্ধ অনুভব করা হয়। সে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমরা গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করি বেশী, বস্তুবাচক বা রূপক সংজ্ঞা ব্যবহার করি কম, অথচ যোগসাধনার দ্বারা যারা দেহাশ্রিত চিন্তের এবং চিন্তাশ্রিত আত্মার সব গুণ সত্য পুনরাবিকার করে, তারা জানে যে সেসব বাস্তবরূপক সম্পূর্ণ প্রাণাণ্য। এই ধরনের বিশেষ রীতিতে আত্মিক সত্য বর্ণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অম্বাতশঙ্কর স্মৃতি ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা (বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি উপনিষদে), প্রশ্ন উপনিষদে প্রাণের ত্বষ এবং তার বৃত্তির বর্ণনা, অথবা যেসব স্থানে বেদোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে কিংবা, ঋক ও সামবেদের মত আবরণ না দিয়ে, পরিষ্কৃত আকারে বৈদিক দেবতাদের চরিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য তাঁদের আহ্বান করা হয়েছে।

বেদের ভাব ও রূপক ফুটিয়ে তোলা হয় কি করে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে-

তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে। তার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকে ইন্দ্রকে স্পষ্টতই দিবা ননের শক্তি ও দেবতা বলা হয়েছে :

“বেদের যিনি বিগুরুপী ঋষভ, পবিত্র চন্দ্রসমূহের কন্যাণে যিনি অনুতনয় সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেই ইন্দ্র বেদা দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। হে দেব, আমি যেন অনুতের আধার হতে পারি। আমার শরীর যেন ‘বিচক্ষণ’ (সূক্ষ্ম দর্শনে পূর্ণ) হয়, জিজ্ঞাসা যেন পরম নমুনয় হয়, কর্ণে যেন ব্যাপক ও বহুবিধ শব্দ শ্রবণ করতে পারি। কাশিণ, আপনি শ্রুকের কোণ, বেদার আচ্ছাদনে গঠিত।”

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঐশোপনিষদ থেকে। সূর্যকে সেখানে জ্ঞানের দেবতা বলে আখ্যান করা হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে ভোয়ান্তির্য রূপ হল পরাচেতনার সঙ্গে একত্ব। ননের ভূমিতে তার রশ্মি বিকিষ্ট হয়ে তৈরি হয় আনাদের চিন্তাধারণার উজ্জ্বল প্রভাবগুলি ; আর তাতে ঢাকা পড়ে যায় সূর্যের অনন্ত অতিমানস সত্য, তার নিজেই দেহ ও স্বরূপ, পরমাত্মার ও ব্রহ্মের সত্য। বলা হয়েছে :

“সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের রূপ আবৃত : হে পুষ্পিতা সূর্য, সে আবরণ উন্মোচন কর সত্যধর্মের জন্য, দেখবার জন্য। হে পুষ্প, হে একমাত্র ঋষি, হে সংযমনকর্তা যম, হে সূর্য, হে পরম পিতার পুত্র, তোনার রশ্মি সব স্তবিন্যস্ত কর, সংহত কর, যে ভেদ তোনার কন্যাণ-তন রূপ সেক্ষপ দেখি ; ওই, ওই, যে পুরুষ সে আমিই।”

এ সব বাক্যে বেদের সাংকেতিক প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে পার্থক্য সবেও সংগোত্রতা সুস্পষ্ট। শেষ শ্লোকটি ত হল পরবর্তী যুগের বিশদতর ভাষায় ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা। অত্রিকূলের শ্রুতিবিদ ঋষির সে মন্ত্রটি হল :

“তোনাদের সত্যে আচ্ছাদিত রয়েছে পরম প্রসব সত্য, যেখানে অশ্রুসব রথ থেকে খুলে দেওয়া হয়, সেখানে দশসহস্র একত্র অবস্থান করে, দেহধারী দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবকে আমি দেখেছি।”

বেদবেদান্তের রূপকচিত্র বর্তমান মনোবৃত্তির অপরিচিত ও ভিন্নপ্রকারের মনোবৃত্তির স্বষ্টি, সে-সবকে সত্যের জীবন্ত সত্ত্বত বলে আনাদের নন নানে না। কারণ, বুদ্ধির শাসনে এখন আর সত্যের অভিযাত্রক করণনার এমন সাহস নাই যে আদ্বিক বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম-দর্শনের সঙ্গে এক হয়ে তার অকুণ্ঠিত রূপ দেবে। কিন্তু কোনমতেই তা আদিনি মানবের বানোচিত বা বর্ধিতোচিত গুচবাদ নয় ; বরং এই প্রাণবান ওজস্বী ও বোধিলীপ্ত কবিতার ভাষা অতি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ।

উপনিষদের বোধিদীপ্ত চিন্তার অবতারণা করা হয়েছে এই সব স্থল, বাস্তব চিত্র দিয়ে। প্রথমে বেদের ঋষিরা সেসব ব্যবহার করেছেন সত্ত্বতরূপে, যাতে সেসব প্রত্যাকলক ঋষি-বাক্যের অর্থ সত্যপ্রপীড়ার কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় অথচ সাধারণ বুদ্ধির কাছে তাদের গভীরতম

তব্ধ আবৃত থাকে। কিন্তু উপনিষদে তার সঙ্গে কথঞ্চিৎ কম গুণার্থক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরিণামে সেগল ঢাড়িয়ে, চমৎকার পরিষ্কৃতি ও উদ্ভলোকে উপযোগী উপমা ও শব্দ-যোজনায় দ্বারা আধ্যাত্মিক গত্যের সমগ্র মহিমা সহজে প্রকটিত করা হয়েছে। গদ্য উপনিষদ-গুলি থেকে আমরা দেখতে পাই কি পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতের মনীষা প্রথম সঙ্কেত ব্যবহার করে তারপর তা থেকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিষ্কৃতি প্রকাশে উপনীত হয়েছে। গুণার্থক ওঙ্কারমন্ত্রের শক্তি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে, প্রণোপনিষদের একটা অনুচ্ছেদে এ পদ্ধতির প্রথম দিককার একটা উদাহরণ পাওয়া যায়

“বৎস গত্যাকাম, এই অক্ষর মন্ত্র ও হল পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, সূত্রবাঃ বিধান ব্যক্তি ব্রহ্মের এই আয়তন অবলম্বন করে এ দুয়ের একটিকে পায়। একান্তিনাত্র মাত্রা বা অক্ষরের যে ধ্যান করে তার দ্বারা উৎকৃষ্ট হয়ে সে সহর পৃথিবীতে সিদ্ধিলাভ করে। ঋক্‌মন্ত্র সব তাকে বনুশালোকে নিয়ে যায়, সেখানে তপঃ, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সে আত্মার মহিমা অনুভব করে। দুই মাত্রা বা অক্ষরের দ্বারা মনে যে সিদ্ধিলাভ করে, যজুর্মন্ত্র সব তাকে অন্তরিক্কে সোমলোকে নিয়ে যায় এবং সেখানে আত্মার বিভূতি অনুভব করে আবার সে প্রত্যাভর্জন করে। আর যে তিন মাত্রা নিয়ে এই ওঙ্কারের দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করে সে সূর্যরূপ তেজোময় লোকে সিদ্ধিলাভ করে। সাপ যেমন জীর্ণদ্বক ত্যাগ করে, তেমনি সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সামমন্ত্র সব তাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মলোকে। এই জীবনমন্ডল লোকে থেকে সে এই পুরীতে শয়ান পরাংপর পুরুষকে দর্শন করে। এ অক্ষর তিনটি মৃত্যুদুষ্ট, কিন্তু এখন তারা অবিভক্ত ও অন্যান্যসংযুক্তভাবে প্রযুক্ত হয়, তাতে আত্মার আন্তর বাহ্য ও মধ্যম ক্রিয়া সম্যকরূপে প্রযুক্ত হয়ে অগ্নি সমগ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর সে জ্ঞান হয় বলে আত্মা আর ত্রস্ত হয় না। ঋক্‌মন্ত্রে লাভ হয় ইন্দ্রলোক, যজুর দ্বারা অন্তরিকলোক, সামের দ্বারা লাভ হয় সেই তৎস্বরূপ যাকে ঋষিরা আমাদের জানিয়েছেন। তাঁরই আয়তনস্বরূপ ওঙ্কারের দ্বারা বিধান সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন যিনি শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয়।”

এই সব সঙ্কেত ও আনাদের বুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু যেসব সূত্র দেওয়া হয়েছে তাথেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক উপলক্ষের বিভিন্ন অবস্থাতে নিয়ে যায় যেসব আত্মিক অভিজ্ঞতা, এসব হল তারই প্রতিরূপ। দেখতে পাই যে, এ তিনটি হল বাহ্য, মানস ও অতিমানস উপলক্ষ এবং তার শেষ উপলক্ষের ফলে আসে পরম সিদ্ধি, অমর আত্মার শান্ত নিত্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্রসত্তার সর্বতোমুখী পরিপূর্ণ ক্রিয়া। তারপরে, বাণ্ডুকা উপনিষদে পাই সব সঙ্কেত ত্যাগ করে এ রূপকের আবরণমুক্ত সহজ তাৎপর্য। আর তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা যে তথ্যের সন্ধান দিচ্চেন বর্তমান কালের মনীষা তার সম্পূর্ণ পৃথক নিজস্ব পথে বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আবার তাতে ফিরে এসেছে; সে হল যে, আমাদের স্থূল বাহ্যচেতনার পশ্চাতে আর একটা মগ্নচেতনা কাজ করছে, পৃথক হলেও

প্রকৃতিতে তা অভিন্ন, এবং আমাদের জাগ্রত মন তারই উপরিচরিত্রা ; আর তা ছাড়াও উর্ধ্ব—আমরা এখনও বসি, হয়ত—আছে আধ্যাত্মিক অতিচেতনা আর, বেশ সত্তাবনা রয়েছে যে, তার মধ্যেই আমাদের সত্যের শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং সমগ্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রশ্ন উপনিষদের উদ্ধৃত-অংশ তিনিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তখনও এ তথ্য জানা ছিল। সুতরাং আবার মতে এ সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, প্রাচীন ঋষিদের এই সব ও তার অনুরূপ সব উজ্জ্বল বাহ্য পরিচ্ছদ আমাদের বুদ্ধিকে যতই বিভ্রান্ত করুক না কেন, বানোচিত গুঢ়বাদ বলে তাকে বর্জন করা যায় না। বরং সে সব হল, তখনকার দিনের মনোবৃত্তির কাছে স্বাভাবিক, রূপকবহন ভাষায় যেসব তথ্যের প্রকাশ, সে সব এখন আমাদের বিচারবুদ্ধি তার নিজের প্রকৃতিতে সত্য বলে, স্মৃতি গভীর সত্য বলে এবং প্রকৃত জ্ঞানের মূল তথ্য স্ব বলে প্রমাণ করছে।

ছন্দোবদ্ধ উপনিষদগুলিতেও এই রকম ভাবগর্ভ সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের প্রকৃতি চলে এসেছে, তবে তার পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত লঘুভার এবং অনেক স্থানেই রূপক ছেড়ে স্পষ্ট প্রকাশের ভাষাই নেওয়া হয়েছে। পরমায়া, চিৎ, ভগবান মানুষে প্রাপীতে ও প্রকৃতিতে অন্তর্ধানী ঐশ্বর্য, এই জগতে ও অন্যান্য জগতে অনুসৃত পরমেশ্বর ও বিশ্বাতীত এক অদ্বিতীয় অনৃত অনন্ত পরমসত্তা—সবের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে মর্মস্পর্শী শ্লোকে, কোন আবরণ না রেখে, তাঁর নিত্য বিশ্বাতীত মহিমায় তথা বহুমুখী আশ্চর্যপ্রকাশের মাধ্যমে। কঠোপনিষদ থেকে নচিকেতার প্রতি ধর্ম ও মৃত্যুর অধিপতি যমের উপদেশের কিছু অংশ নিলেই এ বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে

“এই অক্ষর ঔ, এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম বস্তু ; এ অক্ষরকে যে জানে সে যা চায় তার তাই হয়। এই অবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বন সবার উপরে এই অবলম্বনকে জানলে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া যায়। এই সর্বজ্ঞ জ্ঞানান না, মরেন না, কোথা থেকেও তিনি আসেন নি বা কেহ হন নি। অজাত নিত্য শাশ্বত পুরাতন ইনি, দেহ হনন করাতে তিনি হত হন না।... আসীন থেকেই তিনি বহুদূরে গমন করেন, শয়ান থেকেই তিনি সব-দিকে ভ্রমণ করেন। আনি ছাড়া আর কে জানবে এই পরমানন্দে উল্লসিত দেবকে ? অস্থায়ী শরীরের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ সেই মহান প্রভু আত্মাকে যে জানতে পারে সে ধীর ব্যক্তির আর শোক থাকে না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপন বা বেদা দিয়ে এ আত্মাকে পাওয়া যায় না, তিনি যাকে বরণ করেন তাঁকে সেই পায়, তিনি তাঁর কাছেই নিম্নতম বিবৃত করেন। অসংযমী দুষ্টচরিত্র অশাস্ত ও অসমাহিত বা অস্থিরমনা ব্যক্তি বেদার অভিত বিদ্যার দ্বারা কখনও তাঁকে পায় না। ব্রাহ্মণ ও ক্রিয় উভয়ই যার অনু, মৃত্যু যার উপচার, তিনি কোথায় কে জানে ?... ”

“স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সব বহির্দুর্গ ক’রে সৃষ্টি করেছেন, তাই লোকে বাইরের দিকই দেখে,

অন্তরাঙ্গকে দেখে না অন্তরের অভিনাশী কচিং কোন স্তম্ভী অন্তরের পানে চোখ ফিরিয়ে আঙ্গাকে গান্ধাং করে। বালবুদ্ধি লোকেরা বাহ্যকামনা অনুসরণ করে, তাই সর্গতোবিভূত স্তম্ভার জালে পড়ে তারা আর ধীর ব্যক্তিরা অন্তরকে জানে, এখানে অনিতা বস্তুর মধ্যে নিত্যবস্তুকে পেতে চায় না। এই আঙ্গার হারাট লোকে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ও মৈথুন জানে, আর কি অবশিষ্ট রইল এখানে? জাগ্রত অবস্থাতে কি আছে এবং স্বপ্নের মধ্যে কি আছে এই উভয়ই যার হারা জানা যায়, সেই মহান্ প্রভু আঙ্গাকে জানে স্তম্ভীরা আর তাদের শোক থাকে না। জীবের অতি নিকটে অবস্থিত এই মধুপায়ী আঙ্গাকে, ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা এই ঈশ্বরকে সে জানে; তারপর আর তার কোন জুড়পসা থাকে না। সে দেখে তাঁকে যিনি পুরাকালে তপঃশক্তি থেকে জন্মেছিলেন, পূর্বে যিনি জনরাশি থেকে জন্মেছিলেন, যিনি হৃদয়গুহাতে প্রবেশ ক'রে সেখানে অবস্থান করেন এবং সব প্রাণীর চোখ দিয়ে সব দেখেন। তিনি জানান তাঁর অসীমা ভগ্ননীর অদিতিকে যিনি সব দেবতাদের ধারণ ক'রে আছেন, যিনি প্রাণশক্তি থেকে সম্ভূত হয়েছেন, হৃদয়-গুহাতে প্রবেশ ক'রে সেখানে অবস্থান করেন এবং সব প্রাণীর সঙ্গে সর্গত্র জাত হন। এই হল অরণীরয়ের অন্তর্নিহিত ছাতিবেশা, সর্বজন্মগু অগ্নি, গভিনীর গর্ভের মত যিনি সমস্তে রক্ষিত আছেন; সমা জাগ্রত থেকে আহতির হারা-প্রতিদিন এই অগ্নির অর্চনা করা সব নানুঘেরই কর্তব্য। সূর্য যার মধ্যে থেকে ওঠে, যার মধ্যে অন্ত যায় তাঁতে সব দেবতারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না—ইনিই সে। এখানে যা 'ওখানেও তাই, 'ওখানে যা তারই অনুরূপ এখানকার সব এখানে যে কেবলমাত্র প্রভেদ দেখে, সে স্তম্ভ থেকে স্তম্ভাতে যায়।...অস্ট-প্রমাণ পুরুষ অন্তরাঙ্গা, তিনি ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর, তাঁকে জানলে তারপর আর কোন জুড়পসা থাকে না। এই অস্টমাত্র পুরুষ ধুমটীন জ্যোতির মত, তিনি ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর, তিনি আভ ও আছেন, কালও তিনি থাকবেন।"

এই রকম একাধারে কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক তথ্যকা, বিপদভা ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রচুর আছে উপনিষদে। কিন্তু অনুবাদ থেকে তার ওজস্বিতা ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার কোন ধারণা করা যায় না, কারণ অনুবাদে ধ্বন্যর্থের টঙ্কিত বা ভাংপর্ষের উদাস্ত, সুক্ষ্ম ও উদাসক প্রতিধ্বনির কোন আভাস পাওয়া যায় না। আবার, অনেকস্থলে সুক্ষ্মতম চেতনিক ও আধ্যাত্মিক তথ্যসব সম্পূর্ণ পর্যাণ্ডভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও কবিত্বের পূর্ণ সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং সে সব উক্তি শুধু বুদ্ধিকে আলোক দিয়েই স্ফুট হয় নি, আঙ্গা ও সমগ্র অন্তঃকরণের কাছে সর্বত্রই তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কয়েকখানা গদ্য উপনিষদে আর একটা জিনিষ পাওয়া যায়। জীবন্ত কাহিনী ও আধ্যাত্মের মধ্য দিয়ে তখনকার সর্বজ্ঞের একটা দিকের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, দেখতে পাই অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের সে কি অসাধারণ উদ্দীপনা, পরমজ্ঞানের প্রতি কি

তীব্র অনুরাগ যাতে উপনিষদ সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। দু'এক কথাতে সে পুরাণ ভগবতের সব দৃশ্য আশাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে—তপোবনে আসীন ঋষিরা নবাগতদের পরীক্ষা করে শিক্ষা দিচ্ছেন, রাজ্য, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সম্পন্ন গৃহস্থেরা জ্ঞানের অনুঘর্ষণে ভ্রমণ করছে; রাখারাজ রাজপুত্র ও অজ্ঞাতপিতৃক দাসীপুত্র সম্মান করছে কোথায় কে দিব্যআলোকে উদ্ভাসিত চিন্তা বা ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট বাণী নিজের অন্তরে ধারণ করে আছে। আবার তখনকার দৃষ্টান্তস্থানীয় সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ও চরিত্রের পরিচয় পাই—রাজা জনক, তীক্ষ্ণবী অজাতশত্রু, শকটবাহী রৈক, দ্বিতীয়া ব্যাঘ্রপ্রিয় যাক্ষবল্লভা, যিনি সর্বদা মৃত্যুর জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত, যিনি অনাগজভাবে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ দু'হাতে তুলে নিচ্ছেন আর শেষে সব ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে যিনি গৃহহীন পরিবারকের জীবন নিলেন, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যিনি ঋষি ষোড়শের মুখের একটি মাত্র কথা শুনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন। আরও লেখি সব আশ্রম, আধ্যাত্মিক আদিকার ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিপুণ রাজাদের রাজগতা, বৃহৎ সব যজ্ঞক্ষেত্র যেখানে ঋষিরা বসিত হয়ে তাঁদের অজিত জ্ঞানের তুলনা করছেন। বুঝতে পারি কিভাবে ভারত-আত্মা জন্ম নিল, সে জন্মদিনের মহাগীতি কিরূপে উদ্ভিত হল পাখা বেলে যা জাতির আত্মাকে পৃথিবী ছেড়ে উর্ধ্বতন অধ্যাত্ম স্বর্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হল।

বেদ-উপনিষদ কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শনের মূল নয়, ভারতের সব কাব্য-সাহিত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার সব ধারারও উৎস। যে আত্মা, যে চরিত্র, যে মনীষা তাতে গড়ে উঠেছে তাৎক্ষণিকই সব মহৎ দর্শনশাস্ত্র উৎকীর্ণ হয়েছে, ধর্মতত্ত্ব সব স্থাপিত হয়েছে, রানায়ণ-মহাভারতে তারই যৌবনের বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে, পরিণত বয়সে শ্রেষ্ঠ কাব্যের যুগে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সকল বিদ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রে বেঁধেছে, জড়বিজ্ঞানে বহু মৌলিক আবিষ্কার করেছে, রসবোধি তৈর ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার এমন উজ্জ্বল সম্পদ সৃষ্টি করেছে, আধ্যাত্মিক ও চেতনিক অভিজ্ঞতা তত্ত্ব-পুরাণে পুনরুজ্জীবিত করেছে, বর্ণ ও রেখা নিয়ে মহিমা ও সৌন্দর্যের প্রাবনে নিজেই ভাসিয়ে দিয়েছে, পাথরে ও ধাতুতে তার চিন্তা ও সূক্ষ্মদর্শন রূপায়িত করেছে, পরবর্তী কালে সব প্রাদেশিক ভাষাতে নূতন প্রণালীতে নিজের আত্মাকে প্রকাশ করেছে, এখন আবার গ্রহণ-মুক্ত হয়ে পার্থক্য গের ও সেই একইরূপ নিয়ে নূতন প্রাণের নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে জেগে উঠেছে।*

অনুবাদক—শ্রীমলিনীকান্ত সেন

* (The Foundations of Indian Culture-এর এক অধ্যায়)

বরফের বাগনরাজী*

শ্রীমা

যেখানকার কথা বলছি সে-ভায়গাটার নাম ত্রেনসেং।

ত্রেনসেং দক্ষিণ আলজেরিয়ার একটি সহর। তার চারদিকে পাহাড়, আর পাশেই সাহারা মরুভূমি। পাহাড় অবশ্য খুব উঁচু নয়, তবে ঢিলার চেয়ে বড় এবং ছোট হলেও জাতে পাহাড়ই।

কী চমৎকার সে-অঞ্চল—যেন একটুকরো স্বর্গ। কত রকমের গাছ, কত রকমের ফলের গাছ যে তার দিকানা নাই। ডুমুর, জলপাই আর কমলানেবুতে ছেয়ে গেছে। আর কত অসংখ্য রকমেরই বা ফুলগাছ। সবশেষে সবুজ পাতার প্রাচুর্য নিয়ে শাদীসমুদ্র ঢেকে ফেলেছে উঁচুনীচু পাহাড়ের সর্বাঙ্গ। সে এক গভীর অরণ্য।

সেদিন পর্যন্ত ছিল এই সবুজের বিস্তার। তার আগে, একেবারে গোড়ায়, পাহাড় ছিল নেড়া। তারপর অনেক বছর পার হলে সরকার ঠিক করলেন ওই নেড়া পাহাড়েই গাছ লাগাতে—বানভুনিকে সুপ্রসবিনী করে তুলতে।

বসল সভা—চলল কর্তাদের সলাপসামর্থ। কী গাছ লাগান হবে? পাইন, হাঁ আলজেরিয়ার মাটিতে পাইনগাছই তো বেড়ে ওঠে তর্ তর্ করে, দেখতে না দেখতে। কিন্তু হল না। কী জানি কি কারণে আদেশ হল ফার গাছ লাগাতে—হয়ত, তুলের দরুন, হয়ত খেগালের বশে হল এমন আদেশ। সেই ফারগাছ, খ্রিসমাসের উৎসবে সাজানোর জন্য স্ক্যাগিনেভিয়ার ঠাণ্ডা ভূমি থেকে আসে যে-ফারগাছ।

লাগান হল সেই ফারগাছ—পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে তারা বেড়ে উঠল, পাশের মরুভূমিকে ভোয়াল্লা না করে।

সেদিন ডিসেম্বর মাসের রাত্রি। মাদাম তেরঁ তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে। সানান্য একটু চিৎচিৎ শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। তাঁর ঘুম খুব পাংলা; সানান্য আওয়াজে তা ভেঙ্গে যায়। সেই চম্পইন রজনীতে তিনি দেখলেন কোথা থেকে তাঁর ঘরের মধ্যে একেবারে মেঘের উপর পড়েছে এক টুকরো চাঁদের আলো...আর ওই, ওই যে ওখানে পাশেই দাঁড়িয়ে

* সত্য ঘটনা। মা উত্তর আফ্রিকার এই দেশে কিছু দিন ছিলেন—মাদাম "ভেৎ"র অতিথি হয়ে। মাদাম তেরঁ মাকে এই ঘটনাটি বলেন। মা আবার আশ্বের ছোটবেলাকে বলেন এক গল্পবারের অধিবেশনে।

এক অদ্ভুত কুদ্রকায় ব্যক্তি। তার গায়ের রং নীল, মুখ সবুজ, প্রকাণ্ড মাথা, অপর্যাপ্ত সাশা দাড়ি, লম্বা চুঁচলো টুপী, ঝঁড়ওয়ালা নাগরাই জুতো...সারা গায়ে তার বরফ পড়েছে, ঘরের মধ্যকার গরমে তা এখন ভেঙ্গে গলে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে বেঝের উপর।

—কে ওখানে? কী চাও তুমি? মাদান তেয়ঁ স্ত্রিজাগা করলেন।

উত্তর এল,

—আনি বরফের রাজা।

সে কথার মধ্যে বাচানতা বা চাপল্য একটুও নেই।

—বরফের রাজা? তা এখানে কী চাও?

—হাঁ, বরফেরই রাজা, একটুও মিথ্যা বলছি না...ফারগাছ আনাদের ডাক দিয়েছে, আর তাইতেই তো ছুটে এসেছি আমরা।

—বরফ? এখানে...সত্যি এই সাহারার পাশে?

—কী করি বল? ফারগাছ না লাগালেই হয়। আর যখন লাগিয়েছ তখন বরফকেও যে নিমন্ত্রণ করে বসে আছ।

—খাক, তোমার কাহিনীর সত্য-মিথ্যা তর্ক করতে চাই না। আপাতত দেখতে পাচ্ছি আনার ঘরের মধ্যে জাছিম সব সর্বনাশ করবে তুমি। তার আগেই বিদায় হও।

বাননাটি তখনই মিলিয়ে গেল। স্বপ্ন দেখলেন কিনা ভেবে মাদান তেয়ঁ এলেন জায়-গাটা পরীক্ষা করতে।...আশ্চর্য তো! যেখান থেকে ক্ষুদ্রে লোকটি অদৃশ্য হয়েছিল সে-জায়গাটায় রয়েছে বরফগলা জল, ঘরের মধ্যে একটুখানি পুকুর।

পরদিন সকালে মাদান তেয়ঁ ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অদূরে শাদা পাহাড়শ্রেণীর উপর উঠছে সূর্য, বরফের উপর তার আলো ঝলমল করছে। সত্যিকারের বরফ! ক্রিসমাসের সময়কার মতো বরফ।

সেই থেকে প্রতি বছর ড্রুমসেন্ মরুভূমির পাশে থেকেও তার গাঢ়-গভীর অরণ্যে নিমন্ত্রণ করে এনেছে এই উত্তরাঞ্চলের দূতকে...

মায়ের সঙ্গে কথা।

প্রশ্নোত্তর

এবারকার ১৯৫৭র নববর্ষ বাণীতে আপনি বলেছেন—“অপশক্তিই চেয়েও এক বৃহত্তর শক্তিই শুধু এনে দিতে পারে বিজয়। ভগৎকে উদ্ধার করবে, যে-দেহ আত্মবলি দিয়েছে সে নয়, স্বনামিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে-দেহ সেই।” এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

উত্তর : ভগতে বর্তমানে যে সর্বোত্তম রকমের শুভ ইচ্ছা দেখা দিয়েছে, এই বাণীতে তারই সাফল্য পৌঁছবার পথ বলে দেওয়া হয়েছে, ঠিক ভাবে বুঝে নিয়ে এই নির্দেশকে অনুসরণ করে চললে সেই শুভ ইচ্ছা তার সার্থকতায় উপনীত হতে পারবে। একটা বিরাট ও আত্মিক রকমের প্রচেষ্টা এখানে জেগেছে, যাতে সমস্ত ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাকে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য দূর করে দিয়ে মানবজাতির অন্তরে এক প্রকৃত সৌভ্রাতের সত্যচেতনা উদ্ভূত হয়ে ওঠে, তারই আহ্বান শুনে ঐ বাণীটি আমি লিখেছিলাম।

শ্রীষ্টান ভগৎ থেকেই ঐরূপ শুভ ইচ্ছার আহ্বান এসেছিল, তাই শ্রীষ্টান বিভাবনার ছাঁচেই বাণীটি ঐ ধরনের আকার নিয়েছিল,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ঐ আহ্বানলি দেবার ধারণাটাই ভগতের সর্বত্র দেখা যায়, যদিও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ধর্মে তাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করা হয়। যাকে বলে পার্থিব মূল অস্তিত্বকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা, বাস্তব ভগতের সব কিছুকেই অসার বলে প্রদান করা, সমস্ত ভিনিসকেই নিখা ও নাস্তা বলে বিবেচনা করা,—শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবাত্মিক আগাগোড়াই বলে এসেছেন স্বেচ্ছায় এখানকার জীবনের রাজ্যকে যথেষ্টচাচারী অপশক্তিদের হাতে নিবিবাদে সঁপে দেওয়া, ভগতের সর্বত্র যারা আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবেশ করেছে তারা আজ পর্যন্ত সেই কাজই করে এসেছে। কিন্তু তাতে হবে না, এই কঠিন বাস্তবের অস্তিত্ব মেনে নিয়েই কঠিন বাস্তবভিত্তি সিন্ধির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। নতুবা এই অস্তিত্বকে যদি তুচ্ছ এবং অসার বলে এড়িয়ে গিয়ে স্তূরদূরস্থ নিঃশব্দ নির্বাক্তক পরব্রহ্মের সন্ধান নিযুক্ত হয়ে থাকি, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “চিন্তাকণা দৃষ্টিনিমেষ” (“Thoughts and Glimpses”) বইখানিতে যাকে বলেছেন শূন্য গিয়ে পৌঁছবার অভিযান, নয়ের রাজ্যকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা, তাহ'লে এদিকের ভগতে যত সব অপশক্তিদের দাপট ও অল্পবিস্তর একাধিপত্য যেন চলে চলে থাকবে।

অধ্যাত্ম-শক্তি যদিও অপশক্তির ক্রিয়াকে বরাবর বাধাই দিয়ে এসেছে, তবু তার এমন ক্ষমতা ছিল না যাতে এই বাস্তব ভগতের-রূপান্তর এনে ফেলতে পারে, তাই বহু সহস্র বছরের

মানুষদের ওত উচড়ার প্রচেষ্টা চিরদিন বার্দই হয়ে এসেছে, আর পৃথিবী আগেও যেমন দুঃখ দুঃখিপাক ও অপকৃতি ও অসত্যের রাজ্য ছিল তেমনই রয়ে গেছে। আর একমাত্র সত্য প্রতিকারের উপায় হলো, সেই অপশক্তির চেয়ে প্রবলতর শক্তি নিয়ে তাদের সামনাসামনি লড়াই হবে, সে লড়াই হবে এই বাস্তবেরই স্থরে যেখানে তারা জন্ম দশন ক'রে বসে আছে, আর সেই অধ্যাত্ম শক্তির তেজ এমন হওয়া চাই যাতে সে এই বাস্তব জগৎকে ও তার বাস্তব চেতনাকে ও আমূল রূপান্তরিত ক'রে দিতে পারে। সেই শক্তিরই নাম অতিমানস শক্তি। আমাদের তরফে শুধু এই দরকার যেন আনন্স। বাস্তবের তুরে থেকেই সেই শক্তির ক্রিয়াকে ধারণক্ষম হতে পারি। সেরূপ কিছু না ক'রে এখানকার রাজ্যকে নিবিবাদে শত্রুর কবলে ছেড়ে দিয়ে সুদূর কোনো নির্বাণমার্গে পালিয়ে গেলে আমাদের চলবে না।

ঐহিক জীবনকে অথবা পাণ্ডিত্য শক্তিগুলিকে বিসর্জন দিয়ে জয়লাভ করতে পারা সম্ভব নয়। জয়লাভ করতে পারে কেবল আনন্স, যে আনন্স আসতে পারে কেবল অতিমানস চেতনার সফুরণে, যে আনন্সের মাঝে থাকে শক্তি, থাকে সহিষ্ণুতা, থাকে বীর্য। সব কিছুকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার ক্ষমতার চেয়ে তাকে ডেকে আনতে আরো অনেক বেশি ক্ষমতার দরকার, কিন্তু সংগ্রামে জয়লাভের তাই হলো একমাত্র উপায়।

★

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “চিন্তাকণা দৃষ্টিনিমেষ” (Thoughts and Glimpses) বই খানিতে লিখেছেন—“জ্ঞানার গভী যখন পার হয়ে যাবো তখনই পাবো জ্ঞান। যুক্তিবিচার আগে থাকে সহায়ক, কিন্তু সেই যুক্তিবিচারই এখন অস্তরায়।”

উত্তর এর প্রথম ছত্রে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আমাদের মানসিক সত্তা ও তার ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে, তারই জ্ঞান এবং জ্ঞান আসার মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্যের ইঙ্গিত করেছেন।

জ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান বা কলাবিদ্যা বা দর্শন বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানারূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা ও বিষয়গত শিকার দ্বারা যা কিছু তথ্যকে আপন আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি তাকেই বলি জ্ঞান। অর্থাৎ জীবন ও তার আনুষঙ্গিক সকল কিছুর সম্বন্ধে মানুষের বন বাহ্য অনুসন্ধিৎসার দ্বারা যে সকল তথ্য পরিজ্ঞাত হয়েছে, যে সকল তথ্য গ্রন্থাদিতে লিখিত হয়েছে, কিংবা সরাসরি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা কিংবা বুদ্ধির দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, বিশ্লেষণের দ্বারা, অথবা সাধারণভাবে বলতে গেলে মনের সকল প্রকার পর্যালোচনার দ্বারা যত কিছু অবগতি লাভ করা যেতে পারে তাকেই বলা হয় জ্ঞান।

দ্বিতীয় ছত্রে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীঅরবিন্দ এখানে মনের কাজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো স্থান দিয়েছেন যুক্তির বিচারকে। বস্তুত যতকাল পর্যন্ত মনের উন্মেষ হওয়া চলছে, ততকাল পর্যন্ত তার সকল কিছু কাজের জন্য যুক্তির বিচারগোকেই প্রাধান্য দিয়ে তাকেই সর্বত্র নেনে চলতে হবে, মনের সব রকমের তৎপরতায় ও এমন কি কলপনা করবার বেলাতেও যুক্তিকেই

সালিশী করতে দিতে হবে, যাতে আনন্দ ঠিক পথ ছেড়ে বাঁকা পথে গিয়ে না পড়ি, যাতে ভ্রান্ত ও অস্বাস্থ্যকর চিন্তা এবং কল্পনাকে মনের মধ্যে ভর করবার সুযোগ দিয়ে আমরা প্রবঞ্চিত না হই।

কিন্তু যখন তুমি প্রকৃত জ্ঞানে গিয়ে পৌঁছতে চাইবে, অর্থাৎ যে অধ্যায়-জ্ঞান কেবল নিজে তবু হয়ে তন্ময়তার দ্বারা লাভ করা যায় সেই জ্ঞান যখন পেতে চাইবে, তখন তোমাকে মনের ঐ যুক্তিবিচারের সীমানা পার হয়ে যেতে হবে, মনের চাইতেও আরো উপরের স্তরে গিয়ে তোমায় উঠতে হবে, তবেই তুমি অধিমানেসের কিংবা অতিমানসের জ্ঞানল্যোভির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতে পারবে।

মনের গণ্ডীটুকুর মধ্যে যতক্ষণ রয়েছ তখন যুক্তিই হলো তোমার সঠিক দিশারী ও সঙ্গী; কিন্তু যেখানে তত্ত্বাবগত হবার প্রকৃত জ্ঞান চাইছে, সেখানে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে গেলেনি তা হবে তোমার প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তার মনে এ নয় যে যুক্তিবৃত্তিকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, সে কথা মোটেই বলা হয়নি, তবে উপরের দিকে উন্নয়নের পথে যখন চলেছ তখন যুক্তিকে রাখবে তফাতে, তাকে তখন প্রাধান্য দেবে না। তোমাকে যুক্তি-হীন হতে বলা হচ্ছেনা, কিন্তু উচ্চতর সত্যে এবং আনন্দে পৌঁছতে যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে।

★

কেমন অবস্থাতে যুক্তিকে বর্জন করা যেতে পারে?

উত্তর যখন মনের ক্রিয়াগুলির উপরে উঠে গেছ তখনই যুক্তিকে বর্জন করতে পারো, যখন ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণই নিবেদন করে দিতে পেরেছ তখন যুক্তিকে তুমি ছেড়ে দিতে পারো। যখন নিজের কামনা বলতে কিছুই তোমার থাকবে না তখন যুক্তিকেও কোনো আর প্রয়োজন হবে না। যখন বুঝতে পারছ যে যুক্তি তোমার পক্ষে অপরিহার্য কিংবা তা একটুও তোমার কাজে লাগছে, তখন ঐরূপ অবস্থাকে পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যুক্তিকেই সবার আগে স্থান দিতে হবে। অহং ভাবটি যতদিন তোমার মধ্যে টিকে আছে, কামনা বাসনা যতদিন টিকে রয়েছে, নিজের ইচ্ছা বলে জিনিসটা যতদিন বর্তমান দেখা যাচ্ছে, মনের মধ্যে কোনো ঝোঁক বা আবেগ আর অনুরাগ বিরাগ ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিকারগুলি যতদিন রয়েছে, ততদিন যুক্তিকে ছাড়তে গেলেই নিজের ভারসাম্য ও সম্মতি হারিয়ে ফেলবে।

আরো একটি অবস্থা আছে যেখানে যুক্তিকে বাদ দিতে যাওয়া কোনোমতেই চলে না। যখন বিরুদ্ধধর্মী অপশক্তিদের দিক থেকে কোনো প্রলোভন বা প্ররোচনা আসছে, তখন নিজের ভিতরকার কোনো অংশ দিয়েই যেন তাতে সায় দেওয়া না হয় তারই জন্য। বস্তুত্ব ঐ সকল বিপরীত রকমের ইচ্ছিতে সায় দিয়ে বসার অভ্যাসটি যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে পরিত্যক্ত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিকে বর্জন করা মানেই কাণ্ডজ্ঞান বর্জন করা, তখন তুমি এমনই

অসংলগ্ন আচরণ শুরু করবে যে সকল দিক দিয়ে নাব্যক্ত রকমে বেসামান হয়ে পড়বে। আর যদি তুমি ঐ সব অব্যক্ত প্ররোচনাকে নিজের পারেকাছে ধৈর্যতে দিতে না চাও তাহলে আশ্রয়রূপে বাঁচি ভগবৎপ্রভাবকে সম্পূর্ণভাবেই বরণ করতে হবে।

অতএব বুঝতে পারছ প্রশ্নটি খুব সহজ নয়। নোটের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একেবারে নিবিশেষে রূপান্তরপ্রাপ্ত ও জ্ঞানদীপ্ত হতে না পেরেছ ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তির উপরে নির্ভর করতে থাকোই সব চেয়ে নিরাপদ। ওতে যদিও তার অধীনে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় বটে, কিন্তু তবু একটা আটক থাকে, জগতে যত অধোন্নাদ রয়েছে তাদের দলে নাম লেখাতে হয় না।

যুক্তি হলো একজন ভ্রলোক, স্তব্ধতা ভ্রলোকদের মধ্যে যে ধরনের পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণতা থাকে তাও কিছু কিছু এর মধ্যে থাকবেই কিন্তু তবুও এর উপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। এই যুক্তি ও বিচারবৃত্তি না থাকলে তুমি এমন অনেক কাণ্ডই ক'রে ফেলতে পারতে যাতে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়তে, কারণ যতক্ষণ খুব উঁচুতে উঠে যেতে না পারছ ততক্ষণ এই জিনিষই তোমাকে সমুচিত বিবেক দিয়ে ভালো-মন্দে পার্থক্য চিনিতে রক্ষা করতে পারবে।

অবশ্য একেই সম্পূর্ণ আদর্শ অবস্থা বলা যায়না তবে এখানকার জীবনযাত্রায় এই যুক্তিই তোমাকে পথ চিনিতে নিয়ে যাবে, বেশি কিছু বাড়াবাড়ি ক'রে না ফেল সেন্নিক দিয়ে তোমাকে সামলে রাখবে, এলোপাতাড়ি ভাবে অতিরিক্ত আবেগের ক্রিয়াগুলো তোমায় করতে দেবে না, বিশেষত ঝোকের মাখায় এমন কিছু হঠকারিতা করতে দেবে না যাতে অতলে তনিয়ে চলে যাও।

অহং ভাবটি সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে দিয়ে নিজের সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে যখন তুমি ভগবৎ ইচ্ছার কাছে নিঃশেষে নিবেদিত হয়ে যাবে, তখনই যুক্তির সাহায্য নেওয়া ছেড়ে দিতে পারো।

★

প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেতে চাইলে তার প্রধান ধাপ কি হবে?

উত্তর : মানুষে যা কিছু জানে তাই যে পাকা জ্ঞান, এবং পুরোপুরি জ্ঞান, এই ধারণাটিকে আগে ছাড়তে হবে। কিন্তু এও হয়তো সব চেয়ে কঠিন ধাপটির কথা বলা হলো।

যখন তুমি শিকার সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করো, যেমন নিদ্রানের বিভিন্ন বিভাগের কথা বা দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বের কথা যথেষ্ট করেই জানলে, তখন তুমি এই সব জ্ঞানার আপেক্ষিক মূল্য কতখানি তা আপনা থেকেই ভালো করেই বুঝবে। কিন্তু এর চেয়ে নীচেকার ধাপে মনের সাধারণ ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে যখন অবস্থান করো, যখন

প্রতিদিনের জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন ত্রোমাকে দিয়ে নানারূপ আচরণ করতে থাকে, তখন তুমিও অপর পাঁচজন সাধারণ বিচারসম্পন্ন মানুষদের মতো প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক বিষয়ে এক একটা নিজস্ব ধারণা তৈরি ক'রে নিয়ে তাকেই অনুসরণ করতে থাকো। তাকে জ্ঞান বলে না, সেগুলো হলো তোমার জানা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনার দ্বারা একটা নিজের গড়া অভিজ্ঞতা, ব্যঙ্গ বাড়ানার মাধ্যমে তার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। যদি তোমার বুদ্ধিবৃত্তি খুব বেশি জোরালো না হয়, আর যদি উপরের জগতের দিকে তোমার দৃষ্টির উন্নীলন না থাকে, তাহ'লে ঐ নিজের গড়া জানার গভীর মধ্যেই তুমি থেকে যাও, আর আপন মনে স্বাভাবিকভাবে ধরে নাও যে নিজের অভিজ্ঞতায় যা কিছু তোমার জানা আছে তাই হলো চরম কথা এবং একেবারে তা অবাস্তব। বস্তুত মনের দ্বারা প্রথমে যে মহানত গড়ে নেওয়া হয় সেইগুলোই পরে সত্যের মধ্যে নিবিবাদের ক্রিয়া করতে থাকে। তাতে একটা থেকে অন্যটা এসে পড়া ভিনিসের একটো ভাবে পুনরাবৃত্তি হতে হতে সেই যোগাযোগ সম্বন্ধে এমনি অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় যে, তোমার নিজের সম্বন্ধে ও জীবনের সম্বন্ধে একটা বন্ধন ধারণা গড়া ক'রে নিয়ে তাকে চরম মূল্য দিয়ে শেষে তাকেই পরম সত্য বলে স্থির ক'রে নাও, তা যে ঠিক হচ্চ না ভুল হচ্চ তাই নিয়ে সচেতনভাবে একবারও মাথা ঘামাও না।

এইখানেই হলো সব চেয়ে বেশি কঠিন কাজ, প্রত্যেক রকম জ্ঞানার আপেক্ষিক মূল্য বুঝতে পারা, ইভাবে যা কিছু ভেবেছ তা যে ভুলও হতে পারে কিংবা একেবারেই অলীক হতে পারে তা সম্ভব বলে মনে নেওয়া। কেবল যখন তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতির আশ্পৃহ নিয়ে সেই প্রয়াসের দিকে অগ্রসর হও, তখনই একটা গভীর বিচারণার দৃষ্টি দিয়ে ঐ সকল জানা সিদ্ধান্তের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখতে শুরু করো। আর তখনই আবিষ্কার করো যে এককাল ধরে পরম নিশ্চিন্ত কিসের দাস তুমি ক'রে চলেছিলে, অথচ কিছুই তুমি জানতে না, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাছগুলি আপনা থেকে কলের মতো হয়ে চলেছিল, অবচেতনের ভিতর থেকে তাকে সমর্থন দেবার জন্য কার্য-কারণের শৃঙ্খলগুলি বরাবরই জোঁগানো হতে থাকছিল, অথচ নিজে তুমি তার কিছুই টের পাচ্ছিলে না।

তাই বলছি, সত্যাকার জ্ঞান যদি আয়ত্ত করতে চাও, তাহ'লে তার পক্ষে অপরিহার্য প্রথম ধাপই হবে এই যে, তোমার জানার যে কোনো মূল্য আছে এই বিশ্বাসটিকে ছাড়তে হবে; কারণ তোমার মধ্যে তথাকথিত জানার যে সঞ্চয় রয়েছে, যার উপরে তোমার অগু বিশ্বাস, তোমার কাছে যা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ বলেই প্রতীত হচ্চ, সেইগুলোই দাঁড়িয়ে গেছে তোমার পক্ষে বাধ্যস্বরূপ, সেইগুলোই তোমার উপলব্ধিমূলক জ্ঞান আসার বা 'হয়ে জানা'র পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

★

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “চিন্তাকণা দৃষ্টিনিমেষ” (“Thoughts and Glimpses”)

বইখানিতে নিবেছেন—“চাওয়াকে যখন অতিক্রম করেছি তখনই পানো শক্তি। চেড়ে আগে ছিল সহায়, এখন চেড়েই হয়েছে অন্তরায়।”

উত্তর এখানে এলো প্রাণসত্তার কথা, প্রাণের তরফের ক্রিয়াশক্তির কথা। মনকেই শ্রীঅরবিন্দ মানব জীবনের ভিত্তিস্বরূপ বলে ধরেছেন, কারণ মন জিনিষটি কেনল মানব জাতিরই দখলে। এই মনের দ্বারাই মানুষ তার জীবনের সব কিছু কাজ করে, তার সকল ক্রিয়ার অভিযুক্তি ও সাফল্য মনের চিন্তা দিয়েই প্রথম শুরু হয়। মানুষ হলো চিন্তক প্রাণী; সবার আগে তার মনে একটি চিন্তার উদয় হবে, তার পরে সেটি প্রাণের ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে মিলে একটি সংকল্প বা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হবে। অতঃপর সেই সংকল্প বা ইচ্ছা আপন সার্থকতার জন্য চেড়ায় কেন্দ্রীভূত হবে, সেই চেড়া ও তার শক্তিপ্রয়োগই হবে কর্মের উদ্দীপক।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এখানে ইচ্ছা শব্দটি ব্যবহার করেননি, তার বদলে বলেছেন ‘চাওয়া’। অর্থাৎ সে ধরনের ইচ্ছাক্রিয়া গভীর জিনিস না হয়ে ভাসা ভাসা রকমের জিনিস, যা আসে আনাদের পূর্বোক্ত জ্ঞানার ভিত্তি থেকে, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি থেকে নয়। এই ইচ্ছাগুলি প্রায়ই হয়ে থাকে খেয়ালী ও অস্থায়ী ধরনের, প্রায়ই তা হয় উন্মোচনাত্মক ধরনের তাতেই আনাদের ব্যক্তিগত জীবন ও এমন কি সমষ্টিগত জীবন পর্যন্ত হয় অসম্বন্ধ, বিপৃথক ও অযৌক্তিক।

প্রকৃত যাকে ইচ্ছা বলা যায় তার সঙ্গে এইরূপ চাওয়াকে শ্রীঅরবিন্দ স্বতন্ত্র করে দেখেছেন। প্রকৃত ইচ্ছাকে তিনি বলতে চান এমন জিনিস যা সত্তার গভীরতা থেকে বা উপর দিক থেকে আসবে এবং যার দ্বারা আনাদের যত কিছু জ্ঞানার অভিযুক্তির বদলে প্রকৃত জ্ঞানের অভিযুক্তিই প্রকাশ পাবে। সে ইচ্ছা যখন তার কাজ দেখাবে তখন সেই কাজগুলি হতে থাকবে কোনো গভীরতর বা উচ্চতর শক্তির মাধ্যমে, ব্যক্তিগত চেড়া প্রভৃতির কোনো প্রশ্নই সেখানে থাকবে না। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে প্রকৃত শক্তির কাজ তখনই আসবে যখন আমরা আনাদের চাওয়ার গভীর পার হয়ে যাবো, অর্থাৎ সেখানে কর্মের প্রেরণা মন থেকে না এসে জ্ঞান থেকে আসতে শুরু করবে। প্রকৃত জ্ঞান যখন বাহ্যসত্তাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করবে তখন সেই দেবে তাকে প্রভূত শক্তি।

আমরা চিন্তিত কথায় শুনে থাকি, “তুমি যা ইচ্ছা করবে তা সফল হবেই,” সে কথার আসল অর্থ হলো এই, যদিও আমরা তার একটা হালকা রকমের অর্থ করে নিই। সে ইচ্ছা মানে ঐরূপ ভাবে চাওয়া বা এলোমেলো কোনো একটা কামনা করা নয়, সে হলো প্রকৃত ইচ্ছা, সে হলো স্থিরসংকল্প, যা জ্ঞান থেকে আসে জ্ঞান ইচ্ছার মাঝে থাকে সত্তার প্রভূত তেজ ও শক্তি, তাই সে ইচ্ছা সর্বত্রই অপরাহেয়।

কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি প্রকৃতই পূর্ণ ঐকান্তিকতা আনতে পারা সম্ভব ?

উত্তর নিশ্চয়ই না, যদি সে একজন সাধারণ মানুষই থেকে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজেকে রূপান্তরিত ক'রে নিতে পারে, তার পক্ষে পূর্ণ ঐকান্তিক হতে পারাও অসম্ভব নয়।

প্রথমেই এই কথাটি জানা দরকার যে ঐকান্তিকতা হলো ক্রমবর্ধমান জিনিস ; মানুষের মত যতই উন্নীত হতে থাকে আর বিশৃঙ্খলও তার সত্ত্বতির ক্ষেত্রে যতই ক্রমশ স্ফুরিত হতে থাকে, ঐকান্তিকতাও তদনুযায়ী উন্নতির পূণতা পায়। আবার মানুষের উন্নতির গতি যখন থেমে যায়, তখন দেখা যায় যে গতকালের ঐকান্তিকতা আগামী কালের কপটতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

ভিতরে বাহিরে সম্পূর্ণ ঐকান্তিক হতে হলে কোনো কামনা বাসনা, অনুরাগ বিরাগ, আকর্ষণ নিকর্ষণ, পক্ষপাতযুক্ত পছন্দ বা অপছন্দ তোমার মধ্যে থাকে চলেবে না। সব জিনিসকে দেখতে হবে এক সর্বব্যাপী সমগ্রতার দৃষ্টি নিয়ে। তুমি দেখবে যে প্রত্যেকটি জিনিস তার আপন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন জায়গাটিতে ঠিকই আছে, এই মনোভাব নিয়ে থাকলে তুমি সব কিছুকেই সমভাবে দেখতে পারবে। অবশ্য এই ভাবটি অন্তরে আনা ও যথাধাৰে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন। যতক্ষণ না তুমি ভাগবত স্বভাবে উঠে গিয়েছ, ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাব তোমার পক্ষে খানিয়ে দেওয়া একরূপ অসম্ভব। আর এই বিভিন্ন রকমের মনোভাব যতক্ষণ তোমার মধ্যে ক্রিয়া করছে ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ ঐকান্তিক হতেই পারোনা। তোমার মন, প্রাণ, এবং দেহসহ পৰ্যন্ত আপনা হতেই মিথ্যাক্রিয়া শুরু ক'রে দেবে। আমি এখানে বিশেষ ক'রে দেহসহায় ও উল্লেখ করলাম, তার কারণ দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও মিথ্যাক্রিয়া করতে থাকে ; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে পক্ষপাতযুক্ত পছন্দ অপছন্দের ভাব রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জিনিসকেই তুমি তার বাঁকি স্বরূপে নিতে পারো না ; দেখবার হলেও তা দেখ না, শোনার হলেও শোনো না, স্বাদ হলেও তার আস্বাদ পাও না। যতকাল তুমি কতক জিনিসে সন্তুষ্ট আর কতক জিনিসে অসন্তুষ্ট হতে থাকবে, তোমার মধ্যে তার অন্য আসক্তি ও বিরাগের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে, ততকাল কোনো কিছুকেই তার সত্যরূপে দেখতে পাবেনা, নিজেরই ভিত্তিকার প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সেগুলিকে দেখবে। সেখানে তোমার অনুভূতি বা চিন্তাও যেমন মিথ্যা কথা বলতে থাকে, দেহস্থ ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি মিথ্যা কথা বলতে থাকে। সুতরাং যা তুমি দেখছো বা শুনছো বা ভাবছো বা অনুভব করছো, তাকে যদি স্থনিশ্চিত রকমে নির্ভুল করতে চাও, তাহ'লে আগে নিজেকেই তোমায় পূর্ণ নিরাসক্তির অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এটি যথাধাৰই খুব সহজ কাজ নয় ; কিন্তু অমন অবস্থা না এলে তোমার

বোধশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ক্রিয়া করতেই পারবে না, কাজেই ঐকান্তিকতা ও সেখানে হতে পারবে না।

অবশ্য এ হলো সব চেয়ে সুকৃৎ মায়ের কথা। এর চেয়ে স্থূল রকমের কপটতাও অনেক আছে, যার কথা সকলেই জানে, যার সম্বন্ধে বেশি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। যেমন, মনে ভাবছে এক কিস্তি মুখে বনছে আর, বাইরে দেখাচ্ছে এক কিস্তি ভিতরে কাঁজ কাঁজ হচ্ছে অন্যরকম, ভিতরের ইচ্ছাকে চেপে রেখে বাইরে অন্যরকম ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে, ইত্যাদি। এখানে আমি স্বেচ্ছাকৃত ভাষা নির্ধারণ কথা বলছি না, যাতে চমকে নয় করা যায়, কুটনীতির আশ্রয় নিয়ে এমন প্যাচের কাজ করা যায় যাতে কাজটা একরকম করলেও তার ফল ফলবে অন্যরকম, এক ভাবে কথা বললে তার ফল দাঁড়াবে অন্যরকম, এমন অনেক রকমের পুনঃপা কপটতা আছে যাকে প্রত্যেকেই সহজে চিনে নিতে পারে।

কিন্তু তা ছাড়াও এমন সুকৃৎ কপটতা আছে যাকে নিজের ও দ্বন্দ্ব খুব কঠিন। যেমন, তোমার যেটিকে পছন্দ হলো তার দিকেই তুমি চলতে থাকলে, যেটিকে অপছন্দ হলো তার প্রতি মনে মনে বিমুগ্ধ হলে, এতে তোমার নিরপেক্ষ ভাবটি আর রইলো না। কিন্তু তেমন অবস্থায় তুমি হয়তো নিজেকেই নিজের প্রভাবিত করছো, অথচ নিজের সজ্ঞান চেতনায় সে শেষ তুমি ধরতেই পারছ না। এর কারণ তোমার মনের কপটতার সঙ্গে নিজেরই একটা সাক্ষাৎ রয়েছে। ঐকান্তিকতা ও নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে তার মূলতত্ত্বটি যদিও সর্বত্রই এক, কিন্তু কপটতার ক্ষেত্রে তা সত্য বিত্তি অংশ ও অবস্থা অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রকার।

তবে সকল প্রকার কপটতার উৎপত্তি একই কারণ থেকে, তা হলো কামনা ও স্বার্থ-পরতা, অহং ও তার নানাক্রম বিপ্রণে যত কিছু সংকীর্ণতার বৈচিত্র্য, তার সঙ্গে কামনার সংনিপ্রণে যত কিছু বিকার।

প্রকৃতপক্ষে অহং ভাবটি যতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে তোমার মধ্যে, ততক্ষণ হাজার চেষ্টা হবেও তুমি সম্পূর্ণ ঐকান্তিক হতে পারো না। অহং-এর সীমানা ছাড়িয়ে তোমাকে চলে যেতে হবে, হিসাবের দিকে না চেয়ে আর কোন রকম কিছু বাকি না রেখে নিজেকে ভগবৎ ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণই বিনিয়োগ দিতে হবে। পূর্ণ ঐকান্তিক তবেই হবে, তার আগে আগে নয়।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে এখন যেমন আছে তার চেয়ে আরো ঐকান্তিক হতে চেষ্টা না করে তুমি বলবে—আগে আমার অহং দূর হোক, ঐকান্তিকতা তখন আপনিই আসবে। তার বদলে কথাটি তোমার উদ্দেশ্য করেই বলা উচিত—এখন থেকেই যদি প্রাণপণে ঐকান্তিক হতে চেষ্টা না করি তাহলে অহং আমার কোনোকালেই হুচলে না।

ঐকান্তিকতাই সকল সিদ্ধির মূল ভিত্তি। ঐ হলো তব, ঐ হলো পথ, ঐ হলো লক্ষ্য। ওর অভাবে অসংখ্য বারই তোমার পদস্বলন হতে থাকবে, আর তাতে নিজের ও পরের যা ক্ষতি হলো তাই সামনাতেই অষ্টপ্রহর লেগে থাকতে হবে।

তা ছাড়া ঐকান্তিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের আনন্দও আছে ; ওতে প্রত্যেক কাজেরই একটা সাফল্য বেনে , মিথ্যার কণামাত্র এসে ছুঁতে দেখলেই যে ঐকান্তিক হয় সে তৎক্ষণাৎ সোণিকে দূর ক'রে দিয়ে একটা শুদ্ধতার ও মুক্তির ও এগিয়ে চলার আনন্দ উপভোগ করতে থাকে । ঐকান্তিকতার মতো নিরাপদ আশ্রয় ও নির্ভুল পথনির্দেশ আর বিতায় নেই আর শেষ পর্যন্ত ওতেই রয়েছে রূপান্তরের শক্তি ।

★

“পক্ষপাতের ঝাঝ চলেবে না” কথাটির অর্থ কি বুঝবে ? শৃংখলা ও বিশৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি বিষয়েও কি পক্ষপাতের ঝাঝ চলেবে না ? আর যে যেমনট মানুষ হোক, সকলের সম্মুখেই কি সমান সমান আচরণ করতে হবে ?

উত্তর এখানে তোমরা যাকে পক্ষপাতের বলে ভাবছো, আমি তাকে বলি বাছাই । বাছাই ক'রে চলতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্তেই, কিসে চানছে উপরের দিকে আর কিসে চানছে নীচের দিকে, কিসে এগিয়ে দিচ্ছে আর কিসে পিছিয়ে দিচ্ছে, এর বিচার তো করতেই হবে । কিন্তু একে পক্ষপাতের বলে না, এ হলো দু'টির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া, এটুকু নিত্যসুই অপরিহার্য । তোমরা যাকে বলছ মননের বদলে নির্মনকে ও মন্দের বদলে ভালোকে বেছে নেওয়া, তা বস্তুর সম্পর্কেই হোক বা নীতির সম্পর্কেই হোক, এ কাজটি তার চেয়েও অনেক বেশি । সারাজীবন ধরেই এই বেছে চলার বৃত্তিটি সজাগ থাক। চাই, এ বিষয়ে ঘুনিয়ে ঝাঝ কখনই চলেবে না ; কিন্তু একে আমি পক্ষপাতের বলি না ।

বেছে বেছে নিচ্ছি বটে কিন্তু পক্ষপাতের রাখছি না । ও—দুটি কথার স্বতন্ত্র অর্থ আমার কাছে খুবই পরিষ্কার । পক্ষপাতের হলো অন্ধ, ও একটা ঝোঁকের মতো, একটা আসক্তির মতো ব্যাপার, অনেক সময় নিজের অগোচরে আর অদম্যরূপে ওর ক্রিয়া হতে থাকে ।

তা ছাড়া বাছাইএর কাজের সম্মুখে পক্ষপাতেরের কাজের অনেক বৈপরীত্য দেখা যায় । একটা দৃষ্টান্ত বলি যা প্রত্যাহই দেখতে পাই । কোনো কিছু জটিল সমস্যা এসে পড়লে তুমি তখন এই সিদ্ধান্তটি বেছে নিলে যে ভগবানের উপরেই এর নীমাংসার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যাক, সেখান থেকে যা নীমাংসা আসবে তাই আমি স্বীকার ক'রে নেবো । কিন্তু অপ্রত্যাশিত নীমাংসা এলে তুমি তাতে নিরাশ হও কেন ? তার কারণ, যেমনটি হওয়া তুমি চেয়েছিলে, যেমনটি প্রত্যাশা করেছিলে এবং অল্পবিস্তর চেতনভাবেই কামনা করেছিলে, তা না হয়ে অন্যরকম হলো । এখানে তোমার মধ্যে ছিল কামনার পক্ষপাতের, তোমার আশুতা বা প্রার্থনার ফল সেই কামনার সম্মুখে মিলল না, তাতেই তুমি অসন্তুষ্ট হলে, সে নীমাংসাকে স্বীকার ক'রে নিতে তোমার বিলম্বও বেগ পেতে হলো । কিন্তু ওরূপ পক্ষপাতের যখন

তোমার থাকবে না, তখন তোমার আশ্পৃহা বা প্রার্থনার জ্বাবে যাই কেন আশ্রয় তাকেই তুমি সাধরে গ্রহণ করবে, ঐকান্তিকতার গুণে যা পাবে তাতেই আপনা থেকে খুশি হয়ে উঠবে।

আর বাছাইএর কাজ তোমাকে প্রতি মিনিটেই করতে হবে, তেমন অবসর প্রতি মিনিটেই তোমার সামনে আসবে এতে উপর দিকে উঠবে, না নীচের দিকে নামবে, এতে এগিয়ে যাবে, না পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ওর নামে পক্ষপাতিত্ব নয়, এটির বদলে ওটা পেলে খুশি হই এমন কথা নয়। বাছাই চলবে প্রতি মুহূর্তে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে।

বেছে চলা নামে কান দিকে যাবে তা বুঝে নিয়ে চলা। আর পক্ষপাতিত্ব হলো ব্যক্তিগত কাননার ঝোঁক। যে দিকে চলা বেছে নিলে, তা ইচ্ছা করেই নিলে, তার ফলাফলের প্রত্যাশা নিয়ে নয়; তোমার অন্তরের সত্য যা বলছে, তোমার উচ্চতম চেতনা যা বলছে তাকেই তুমি অনুসরণ করলে, সেখানে ফলাফলের হিসাব নেই, তুমি জানলে যে অন্তর যা চেয়েছে তাই বেছে নিয়েছ। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব থাকলে ঠিক ঐভাবে কাজ হবে না, বাছাই করা তখন বিগড়ে যাবে। সেখানে এসে পড়বে হিসাবের অঙ্ক, লাভলোকসান প্রতিয়ে দেখা; সেখানে নিরপেক্ষতা চাইছে না, নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে না, একটা কিছু মতনর নিয়ে একটা কিছু ফল পেতে চাইছে, তাই থেকে অনেক কিছু এসে পড়তে পারে।

পক্ষপাতিত্ব হলো ফলসাপেক্ষ, আর বাছাইএর কাজ ফলনিরপেক্ষ। প্রতি মুহূর্তেই তার সুযোগ আসছে, যদি তোমার বাছাইএর কাজ সত্যকারী ও ফলনিরপেক্ষ না হয় তাহলে তুমি ঐকান্তিকভাবে ঠিক পথ বেছে চলতেই পারবে না। ফলের দিকে লক্ষ্য থাকলেই বাছাই নিখ্যা হবে। অতএব দেখতে পাচ্ছে। তোমাদের মনের মধ্যে এই দুটি বিষয় নিয়ে একটু গওগোল ছিল।

আর সকলের সঙ্গে সমান আচরণ, তাও এক মস্ত গওগোলের ব্যাপার। ভগবানের বোলাতেও যখন কেউ চায় যে সকলের সম্বন্ধেই তিনি সমান আচরণ করুন, তখনও এই গওগোল হয়। তা যদি তিনি করতে তাহলে জগতে কোনো বৈচিত্র্যই থাকত না, দুটি মানুষ যে একরকম নয় এর কোনো যুক্তিই থাকত না। জগতের এত বৈচিত্র্যের মূল রহস্যটাই নষ্ট হয়ে যেতো।

তুমি অবশ্যই চেষ্টা করবে এবং না পারলে তার জন্য আশ্পৃহা করবে যাতে বিশ্বের সব জিনিসের সম্বন্ধেই তোমার নিজের মধ্যে সমান বোধ, সমান প্রেম ও সমান অনুকম্পা থাকে। কিন্তু তবুও তার বাহ্য অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে, যেখানকার যেমন অবস্থা, ও যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে। অর্থাৎ তোমার অন্তরে যদিও থাকবে একটাই উৎস, কিন্তু তার বাহ্য ক্রিয়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হবে সেখানকার সত্য অনুযায়ী, স্তরঃ দুই স্বতন্ত্র জায়গাতে বিপরীত আচরণও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন করতে পারা সেখানেই সম্ভব যেখানে চেতনার অবস্থা উচ্চতম বা গভীরতম, যেখানে তা সর্ব আত্মপেক্ষিতা

থেকে মুক্ত। সেখানে তুমি বিভিন্ন আচরণের নবোৎপত্তি নূহুর্থে মূল সত্যটিকে দেখতে পাচ্ছ। সেখানে আচরণ বিভিন্ন হলেও ভিতরকার চেতনা একই অবস্থাতে রয়েছে।

এ কথা বুঝতে উঁচুতে ওঠা বা গভীরে প্রবেশ করা দরকার। জ্যোতির্ময় চেতনার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে অনেক উপর থেকে বা গভীর থেকে এককালীন তখন সব জিনিসের সকল কিছুই দেখতে পাবে, ভিতর বাহির দুই দিকেই। আর যদিও চেতনার কক্ষ সেই একই রইল, তবু বাহ্য লক্ষণ অনুসারে তোমার বাহ্য প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা থাকবে, কারণ তুমি জানবে যে একই দিব্য সত্য বাইরে এত বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে রয়েছে, তাকে তেমনি ভাবেই নেওয়া চাই।

বিভিন্ন আচরণ যদি না করো তাহ'লে তো বৈচিত্র্যকে তুমি একাকার এক ক'রে ফেললে, সব কিছুকেই তার আদি অনভিব্যক্ত অবস্থাতে ফিরিয়ে দিলে। কেবল সেই অবস্থাতেই সব জিনিস এক হয়ে থাকতে পারে। অভিব্যক্তির জগতে এসেই তা বহু, তার সঙ্গে বহুরূপেই আচরণ করা দরকার।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, ফলাফলের দিকে নজর না দিয়ে নিজের পথ নিত্য বেছে নেওয়া চাই, আর যেখানে যেমন অভিব্যক্তি হচ্ছে তার প্রত্যেকটিকে সত্য জেনেই তার সম্বন্ধে তেমনি আচরণ করা চাই।*

দ্বিবা-জীবন

[অবতরণিকা]

অনির্বাক

(পূর্বস্বপ্ন)

৩৭

দ্বিবা জীবন

✓ অতিমানস-রূপান্তরের ফলে পৃথিবীতে যে-চেতনার প্রতিষ্ঠা হ'বে, বিজ্ঞানমন পুরুষের স্বরূপের বিবৃতি হতে আনন্স তার একটা আভাস পেলান। এ-চেতনার প্রতিষ্ঠা যে হবেই, তাতে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই, কেননা একে আমরা বলতে পারি প্রকৃতি-পরিণামের অবশ্যস্বাধী নিয়তি। জড় হতে প্রাণ এবং প্রাণ হতে মনের আবির্ভাব আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। মনঃশক্তি মানুষের মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত। তার একটি বৈশিষ্ট্য, চেতনাকে সে ইচ্ছিনির্ভরতা থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছে। মানুষের ভাবনা করণনা স্মৃতি অনুমান—এসমস্তই অতীন্দ্রিয় বৃত্তি। অথচ এগুলোকে সে ইচ্ছিবোধের মতই সহজে এবং স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। তারই ফলে মানুষের চেতনা পঙ্কর চেতনা হতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পঙ্কর-মন হতে মানব-মনের বিশেষ তফাত হল বিজ্ঞানে। মনের ওপারে অথচ তাকে জারিত করে রয়েছে এই বিজ্ঞান। তার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলেছি—একটি সানান্যজ্ঞান (conceptual knowledge), আরেকটি আত্মসচেতনতা (self-consciousness)। এই দুটি বৃত্তির সহায়েই মানুষ ইচ্ছিনির্ভরতা হতে মুক্ত হতে পেরেছে। সানান্য-জ্ঞান প্রধানত তাকে করেছে বস্তুজগতের দৈশ্বর, আর আত্মসচেতনতা তার সামনে খুলে দিয়েছে অন্তর্জগতের ঐশ্বর্যের দুয়ার। এই দুটি বৃত্তির সহায়ে বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির উপরে পুরুষের দৈশনার (mastery) যে-কৌশল, তারই নাম যোগ। যোগ মানসোত্তর বিজ্ঞানের বিদ্যা। এই বিদ্যার সহায়ে কি করে প্রাকৃত-মন অতিমানসের পানে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যেতে পারে, তার একটা সংক্ষিপ্ত নিবরণ আমরা দিয়েছি। তা হতেই মনের পরে বিজ্ঞানমন চেতনার প্রতিষ্ঠা কেন এবং কি করে সম্ভাবিত, তার একটা আভাস পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানমন চেতনা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই যখন লোকায়ত হয়ে প্রাকৃত-চেতনাকে আপন স্বভাবে রূপান্তরিত করে, তখনই পাখির জীবন দ্বিবা হয়। এই দ্বিবা-জীবনের সাধনা সিদ্ধি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে এখন সমগ্রভাবে একটা আলোচনা করব।

সাধাবণত জীবন-সাধনার তিনটি লক্ষ্য আমরা দেখতে পাই। একটি হল বহির্জীবনের ব্যক্তিগত পরিপূষ্টি। উপনিষদের ঋষি একে বলতেন 'বিত্তেষণা'। 'আমার ছাওয়ায় যেন থাকে দুধে-ভাতে'—এই প্রাকৃত উক্তিই তার সহজ প্রকাশ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এর বেশী কিছু চায় না। কিন্তু মানুষ তো একা থাকে না, তাকে থাকতে হয় দণ্ডজনকে নিয়ে। পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া একক জীবনকে সন্মুখ করে তোলাও সম্ভব নয়। তাই স্বার্থপর মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়েই প্রথম পরার্থপর হয়। তারপর পরার্থপরতাই তার স্বভাবে দাঁড়ায়। তখন চনহিত হয় তার জীবনের লক্ষ্য। গীতার ভাষায়, 'তখন সে কর্ম করে 'লোক-সংগ্রহের' জন্য। এই দ্বিতীয় আর্দ্রই অধুনা প্রচারিত মানবতার আদর্শ, যাকে অনেকে অধ্যাত্মসাধনার উপরেও স্থান দিয়ে থাকেন। অধ্যাত্মসাধনা বা অন্তর্জীবনের অভ্যাস হল তৃতীয় লক্ষ্য। এটিও ভোগবাদের নতই প্রাচীন। প্রাণের বৃত্তিকা যেমন মানুষকে বহির্মুখ করেছে, তেমনি মনের জিজ্ঞাসা ও তাকে করেছে অন্তর্মুখ। পণ্ডত্বের একটু উপরে উঠতেই মানুষ বুঝতে পেরেছে, বহিরিঞ্জিয়ের তর্পণের চাইতে অন্তরিঞ্জিয়ের তর্পণ বড়। ফলে মানুষের মাঝে জেগেছে শিল্পবোধ, আত্মসংস্কৃতির প্রেরণা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসা। ফলে প্রবল অন্তর্মুখীনতা মানুষকে করেছে অধ্যাত্মচেতা।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনের এই তিনটি আদর্শ বিভিন্ন মনে হলেও বস্তুত তারা ওতপ্রোত। জীবনের মূলে রয়েছে আত্মতর্পণের তাগিদ। এ-তর্পণ যদি স্থূল হয়, একার হয়—তাহলে বুঝতে হবে মানুষ এখনও পশুর স্তরে আছে। মানুষ তা থাকতে পারে না। তর্পণ স্থূল কিন্তু লোকায়ত, ভোগের আয়োজন আমার একার জন্য নয়, সবার জন্য—এ হল পশুবৃত্তির পরের ধাপ। তর্পণ যখন সূক্ষ্ম হয়, তখন আধ্যাত্মিকতার গুরু। একার অধ্যাত্মসিদ্ধি—এ-আদর্শ ভাল হলেও সমুদ্রপুরুষ বলবেন, এটা হীনমানীর পথ, স্রুতএব প্রণত-পথ। মহা-মানীর অধ্যাত্মসাধনা সবার জন্য, তার সিদ্ধি লোকায়ত। 'পুং বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। পূর্ণযোগী তবুও বলবেন, 'এহোভন, আগে কহ আর।' আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতা যদি বাইরানিকে নস্যাত করে দেয়, তাতে তাঁর আপত্তি আছে। অন্তরের সিদ্ধি বাইরেও রূপায়িত হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়—এই তাঁর লক্ষ্য। আনি আমারই তর্পণ চাই, কিন্তু সে-আনি তো সঙ্কুচিত অহস্তার মাঝে বন্দী নয়—সে'বে ভুতে-ভুতে সন্নিবিষ্ট এক অময় আত্ম-স্বরূপ। তার উন্মাদ যেমন পুরুষের স্বরূপাবস্থানে, তেমনি প্রকৃতির রূপান্তরে। বিশ্ব-প্রকৃতির উর্বরপরিণামে চলছে সে-রূপান্তরের তপস্যা জড়ের মাঝে অন্তর্মুখ চিৎশক্তির প্রসুজিতে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন মহেশ্বরের সায়জ্ঞাফাঙ্কিনী তাপসী পার্বতী, তাঁর সমস্ত জীবনটাই যোগ। পূর্ণযোগীর জীবনও এই যুগলক শিব-শক্তিরই দিব্য বিভূতি। তার মধ্যে জীবনসাধনার তিনটি ধারাই সর্বদা ঘটেছে।

অথওদৃষ্টিতে দেখলে লোকা যায়, জীবনের প্রেরণা আসছে অন্তর থেকে। বাইরের

পরিবেশ ক্ষেত্র মাত্র। বীজের অন্ধুরাণে তা গাঢ়ায়া করে, কিন্তু অন্ধুরাণের শক্তি নিহিত রয়েছে বীজেরই মধ্যে। স্বভাবে যা আছে, আশ্রয়ের মধ্যে তা-ই কুটতে পারে। এই স্বভাবের সাক্ষাৎকার পশুর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাই তার মাঝে দেখা দেয় আশ্রয়োধ। একটা সর্বসাধারণ আশ্রয় হল চেতনার বিস্ফোরণ। মানুষ বৃহৎ হতে চাইছে—এই তার জীবনের মর্মকথা। বীজ চাইছে বনস্পতি হতে। বীজটি হল মানুষের অংশ। আশ্রয়বিস্ফোরণের সে অনুকূলও বটে, প্রতিকূলও বটে। অবিদ্যার ঘোর সম্পূর্ণ না কাটা পর্য্যন্ত অহস্তা পূর্ণবিস্ফোরণের প্রতিকূল। কিন্তু এরই মধ্যে চলে তার বিদ্যার তপস্যা। অন্ধকার ক্রমে আলো হয়ে ওঠে।

ভিতরের প্রেরণায় কুটে ওঠাই জীবনের একমাত্র সাধা হয় যদি, তাহলে বনতে হবে, অধ্যাত্মজীবনই মানুষের সত্যিকার জীবন। অধ্যাত্মজীবনের যে-কোনও ধারার তাৎপর্য হল সত্তার অন্তর্গত মহিমাকে প্রস্ফুট করা। তাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে অস্ত্রজীবনেরই মূল্য বেশী। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমি শুধু অস্ত্রকেই মানব বাইরেরকে নয়, অথবা নিজেকেই মানব পরকে নয়। বীজ যেমন মাটির গভীর থেকে রস তেনে আলোবাতাসের মাঝে অঙ্কুরিত হয়, শাখাপ্রশাখায় আকাশের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, অধ্যাত্মজীবনও হবু তেমনি। অস্ত্রের গভীর গহনে তার শুরু, আর বিশ্রাস্ত্র ও বিশ্রোত্তর বিস্ফোরণে তার সারা। আবার মাঝে আনাকে পেয়ে সবার মাঝে আনাকে পাওয়া, আবার অতিনিউজির উল্লাসে সব পাওয়ায়াকে ছাপিয়ে যাওয়া আকাশের মত—এই হল জীবনায়নের তাৎপর্য।

তাই অস্ত্রের চিন্ময় জীবনের প্রতিষ্ঠাই হল দ্বিবা-জীবন-সাধনার প্রধান পর্ব। তারপর তারই বীর্ঘে সমগ্র বহিঃচর সত্তার রূপান্তর ঘটানো, সমস্ত ভাবনা বেদনা ও কর্মকে পরিণত করা ঐ অস্ত্রচেতনার মন্ত্রশক্তিতে—এই হল সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্ব হল, এই সিদ্ধজীবনের সান্নিধ্যদ্ব্যতিক্রমে বিশেষ বিকীর্ণ এবং অনুবিক্ষেপ করা। কিন্তু সব ছাপিয়ে থাকবে লোকোত্তর মহাপ্রাণের বৈপুল্য—যেমন আশ্রয়সত্তার কেন্দ্রে, তেমনি তার পরিধিতে।

জীবনকে সার্বিক করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন,—অস্ত্রের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেকে জানা, নিজের মাঝে ভূবে যাওয়া, অহরহ আশ্রয় হয়ে বাস করা। মানুষের প্রাকৃত-চেতনার পক্ষে এটা একটা দুঃসাধা সাধনা। কিন্তু এছাড়া আর পথও নাই। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, মানুষের ইন্দ্রিয়ের নোড় বাইরের দিকে ফেরানো, তাই সে কেবল বাইরেরকেই দেখে, ভিতরের দিকে ফিরে নিজেকে দেখতে পায় না। ভিতরের দিকে তাকাতে গেলে সে দেখে কেবল নীরব অন্ধকার। সেখানে ঢুকতে গেলে হয় সে ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো হিচি-বিজি স্বপ্ন দেখে। বাধ্যনিক নানাবিকলন-বিদ্যাও মানুষের অস্ত্রের গিয়ে এই প্রাকৃত-চেতনার আর অবচেতনার নিদ্রমহল ছাড়া আর-কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু এই তো অস্ত্রের পূর্ণ পরিচয় নয়। প্রাকৃত-চেতনার কাছে যা অন্ধকার, যোগীচেতনার কাছে তা-ই

বিজ্ঞানধন দীপ্তিতে ভাস্বর। জাপ্রতে যোগস্থ হয়ে বাস করলে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় যে সূচী-
মুখ তীক্ষ্ণতর আবির্ভাব হয়, তাকে স্বপ্ন ও স্ফুতির গহনেও নামিয়ে নেওয়া যায়। প্রাকৃত
জড়-সমাধি তখন রূপাস্ত্রিতে হয় অপ্রাকৃত চেতন-সমাধিতে। স্বপ্ন ও স্ফুতির স্বরূপ আনোচনা
করতে গিয়ে এসব কথা আগেই বলেছি। অস্তরের জাপ্রত স্বপ্ন ও স্ফুতির মাঝে অভিযান
চালিয়ে যদি তুরায়ের নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তাহলেই নিজের বীজসদৃশকে জেনে
নিজেই জানা আমাদের পূণ হয়। তখন দেখি, অস্তরগহনের ঐ নৈঃশব্দ্যই চিদ্বীৰ্ঘ—
লোকোত্তর জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির উৎস। তার রিজতা প্রাকৃত-আধারেরই রিজতা, ব্রাহ্মী
চেতনার অন্তরসে তাকে ভরে তোলবার আয়োজন। অতএব তা প্রলয়ে অস্তিত্বের নিমজ্জন
নয়, মহত্তর ভূমিতে তার উত্তরণ। এমন করে অস্তরে ঢুকতে পারলেই আমরা পাই অস্ত-
জীবন ও বহির্জীবনের মর্মসত্যের পরিচয়। এই আত্মস্থ জীবনই বীজসদৃশ গুটিয়ে গিয়ে
আবার নিজেই ছড়িয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ধরতে পারে বিশ্বের জীবনকে। এ না করে বহির্মুখ
চিন্তা নিয়ে নিজেই ছড়িয়ে দেবার সর্বাঙ্গীন সাধনাও আমাদের পুরুষার্ধসিদ্ধির একটা অক্ষম
পন্থ প্রচেষ্টা নান্ন। সে শুধুই বেকীর কাপনার, মনকে শুধুই চোপ ঠাঠা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

এমন করে অস্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে নিজের বীজসদৃশকে আবিষ্কার করাকে বলে
'সমাপত্তি' (being)। তারপর অস্তর্গুহ চিংশক্তির প্রবেশে বীজের যে অন্ধরণ ও
বিক্ষারণ, তাকে বলে 'সম্ভূতি' (becoming)। নিখিল প্রকৃতি জুড়ে চলেছে এই সমাপত্তি
আর সম্ভূতির তপস্যা—একটা কিছু রূপায়ণের আকৃতি। সমাপত্তি হতেই সম্ভূতি, বীজ
হতেই বিস্তার এই হল সৃষ্টির ধারা। যতটুকু ভিতরে গুটিয়ে যেতে পারব, ততটুকুই
বাহিরে সার্থকভাবে ছাড়া পাব। অধ্যাত্মজীবনের এই আইন। আত্মস্বরূপ হওয়া বা
নিজেই পাওয়া হল আমাদের পরম পুরুষার্ধ। একবার নিজেই পেয়ে অস্তরের ঐ চিদ-
বিন্দু হতে দেহ-প্রাণ-মনরূপী দিব্যকতার রূপায়ণ এবং সেই লোকোত্তর আত্মভাবনার বীর্ঘে
এই মর্ত্যেরই বুকে গড়ে তোলা দিব্য-জীবনের অন্ত পরিবেশ—এই হল আমাদের সাধ্যের
চরম।

পূর্ণ সমাপত্তির অর্থ হল নিজের সম্পর্কে পূর্ণচেতন হওয়া। যেমন জ্ঞানতে হবে নিজের
পৌরুষেয়-সত্তার অচল প্রতিষ্টাকে, তেমনি জ্ঞানতে হবে আত্মপ্রকৃতির দিব্যবিভূতিকে।
কি আমার স্বরূপ এবং কি আমার শক্তি, দুয়েরই পূর্ণজ্ঞান চাই। এই হল সমাপত্তির প্রথম
সাধন। আবার চাই আত্মশক্তির পূর্ণ সামর্থ্যকে অধিগত করে তার নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগে সিদ্ধ
হওয়া। এই হল সমাপত্তির দ্বিতীয় সাধন। সিন্ধের জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নয়, পূর্ণ-সক্রিয়। তা
শুধু আলোই ছড়ায় না, ছড়ায় তাপও। সেই তাপ জড় ইন্ধনকেও অগ্নিময় করে তোলে।
আবার সৃষ্ট হয় আলো আর তাপ। এই বিসৃষ্টিতেই সমাপত্তির চরিতার্থতা ঘটে বিশৃঙ্খ-
লাবে। আনি শুধু আমার মাঝেই গুটিয়ে থাকি না, ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বময়। এক আনিই

নিকীর্ণ হই বহু আনিতে। ঘণ্টে-ঘণ্টে যে আশ্চর্য্যভাবের অভীপ্সা, তা আমাবই অনিবার্য বৈশ্যমানের চেতনার উদ্ভবশিখা। সবার সত্তা সবার চেতনা সবার আনন্দ সবার শক্তি আমারই আশ্চর্য্যরূপের লীলারন। এই বিশ্বাত্ত্বিকতার অনুভব হল সত্তাপতির তৃতীয় সাধন। আমার বিশ্বাত্ত্বিকতার এই সাধনা সার্বক হতে পারে বিশ্বাত্ত্বিক-ভাবনার সিক্তিতে। পূর্বের ফুল ফোটে পুন্যের বৃক্ষে—এই এক রহস্য। কোনও-কিছুকে ঠিক-ঠিক পেতে হলেই তাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। অহংকে না ছাপিয়ে গেলে আত্মাকে পাওয়া যায় না, তেননি বিশ্বকে না ছাপিয়ে গেলে তাকেও পাওয়া যায় না। বিশ্বাত্ত্বিকতার যে অসঙ্গ রিক্ততা, তা-ই পরম অশেষ হইয়ে ভড়িয়ে আছে বিশ্বকে। এই বিশ্বাত্ত্বিক-ভাবনার সিক্তিই হল সত্তাপতির চতুর্থ সাধন। এমন করে জানে শক্তিতে বৈপুল্যে এবং রিক্ততার নিত্যকে পূর্ণরূপে পেলেই সহজের আনন্দ আপনা হতে জীবনে উঠলে পড়ে। স্বরূপানন্দের এই পনিপূর্ণ আশ্বাদনেই সত্তাপতির পরম সার্বকতা।

‘বুদ্ধ বেদ, বুদ্ধ এবং ভাবিত’—বুদ্ধকে যিনি জানেন, তিনি বুদ্ধই হন। সত্যাকার জানা মানে হওয়া। তা-ই সত্তাপতি। এই সত্তাপতির সাধনা করতে হবে আধারের সব দিয়ে। দেহ প্রাণ আর মন নিয়ে যে এই মর্ত্য আধার, তাকে রূপান্তরিত করতে হবে দেহতার সোন-পাত্রে। তার জন্য তাদের গীমার সঙ্কোচ ভেঙে মুক্তি দিতে হবে বুদ্ধসত্ত্বাবের অনন্ত বৈপুল্যে। এইখানে সত্তাপতির প্রথম তুনিকারূপে নেতিবাদের সার্বকতা। ‘এই সীমিত দেহ সীমিত প্রাণ বা সীমিত মন আনি নই’—অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই এই মন্ত জ’পে জ’পে মর্ত্য অহস্তার অত্যন্ত ভাবনার বোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। বিহার করতে হবে বুদ্ধের আনন্দে। দেহ-প্রাণ-মনকে অনুভব করতে হবে সেই আনন্দেরই বিভূতিরূপে। তাহলে তারা আর আর-চৈতন্যের বাক্য না হয়ে হবে তার স্বয়ং। তাইতে, চিৎশক্তির যে-সানন্দ্য তাদের মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে, তার মুক্তিতে তাদের ঘটেবে রূপান্তর।

দেহ হতেই এ-সাধনার শুরু হতে পারে, কেননা-প্রাকৃত চেতনার কাছে দেহাত্ত্বিকতাই হল সবার চাইতে ঘনিষ্ঠ। তাই বিদেহ-ভাবনাই হল দ্বিবা-জীবন-সাধনার প্রথম পাঠ। দেহকে একটা বস্তুপিরূপে পরাক্-দৃষ্টিতে না দেখে তাকে প্রত্যাক্-দৃষ্টিতে অনুভব করতে হবে বোধের ক্ষেত্ররূপে। এই বোধ যদি স্বচ্ছ ও প্রশান্ত হয়, তাহলে আপনা হতেই তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে পরিব্যাপ্তির ভাবনা। প্রদীপের শিখা চারদিকে আলো ছড়ায়। প্রদীপের পরিপূর্ণ সত্তা এ আলোর পরিমণ্ডল আর শিখা দুটিকে নিয়েই। দেহকেও তেননি একটা অনন্ত-বিচ্ছুরিত চিৎশক্তির কেন্দ্র বলে ভাবা যেতে পারে। এই ভাবনা সিন্ধু হলে বিনোদ-ক্রমে এমনও ভাবা যেতে পারে, চিৎশক্তির আনন্দ্যই গুটিয়ে এসেছে এই দেহে। তারপর দুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে দেহ্যসত্তা রূপান্তরিত হবে চিৎকেন্দ্রে, বিজ্ঞানধন চেতনার শক্তিকূটে। তখন তার মধ্যে জড়বের কোনও সঙ্কোচই আর থাকবে না।

এমনি করে অনিচ্ছানাক্ষিত মনের সঙ্কুচিত চেতনার উর্বে ওঠা, অমনীভাবের ভূমিতে থেকে মনকে ব্যবহার করা যন্ত্রণ মত—এই হল দিব্যজীবন-সাধনার দ্বিতীয় পাঠ। বিদেহ-ভাবনা থেকেই অমনীভাবের সাধনা সিদ্ধ হতে পারে। সেহেতু স্বৈর্যে যে সত্তার বোধ, শুধু 'আছি' বলে যে শব্দ বা শিববৎ শূন্যতার প্রশান্তি, তাকে যদি ছানি চেতনার সমস্ত বৃত্তির প্রতিটাক্ষেপে, তাহলেই আমরা মনের শাস্তা হতে পারি। নিঃসঙ্গ নিখর আকাশে যেমন মেঘের খেলা আলোর মেলাতারার ঝিকিমিকি, তেমনি সেখানি নিস্তরঙ্গ চেতনার বুকে মনো-বৃত্তির বৃহৎ উঠছে আর ভাঙছে। তটস্থ এই দৃষ্টির স্বচ্ছতায় তখন মনের চাওয়ার মূলে ধরা পড়ে আত্মচেতন্যের সঙ্কল্পশক্তির উল্লাস। তার সিদ্ধি সহজ অপ্রতীত এবং চিন্ময়। অন্তরে পাওয়ার পূর্ণতায় তখন বাইরে চাওয়ার দূরাগ্রহ শূন্যতায় মিলিয়ে যায়। মনের আর তখন নিজের গরজের কোনও কাজ থাকে না—ওধু অন্তঃশক্তির নির্দেশে ব্যবহারের মাঝে যোগাযোগ সাধন করা ছাড়া।

এমনি করে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাণকে আত্মার বিভূতি ও সাধনরূপে প্রশাসন ও পরিচালন করা হল দিব্যজীবন-সাধনার তৃতীয় পাঠ। ব্যক্তি-প্রাণের সীমিত আকাঙ্ক্ষার আন্দোলনকে ছাপিয়ে প্রাণ তখন বিশ্ব-প্রাণকে আপন জেনে সমস্ত প্রাণবিভূতির সঙ্গে এক হয়ে যায়। নিখিল হৃদে ব্যক্তি-প্রাণের আকৃতি এবং তপণে সে দেখে এক অন্তর্গত আত্মার নদ্যপ্রাণেরই রসাস্বাদের বৈচিত্র্য।

এসব সাধনারই মূল কথা হল চেতনাকে অবিদ্যার সঙ্কোচ হতে বিদ্যার বৈপুল্যে উত্তীর্ণ করা। সম্ভবিসম্ভব অবিদ্যার কথা আমরা আগেই বলেছি, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যে ইন্ড্রিয়নির্ভর জড়াশ্রয়ী প্রাকৃত-চেতনা কেবল বাইরের বস্তুজগৎটাকেই তার সর্বস্ব মনে করছে, কেবল জাগ্রতের ভূমি ছাড়া চেতনার আর-কোনও গুঢ় ভূমির সম্ভান রাখছে না, একটা আয়ুষ্কালের সীমার মধ্যেই জীবনের তাৎপর্য এবং মহিনাকে সঙ্কুচিত রাখছে, নিজের সীমিত অহংএর মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে—প্রতিপক্ষ ভাবনার-যারা তার এই ঘোর ভাঙতে হবে। সাধককে অবিরাম রূপতে হবে, 'আমি চিন্ময়, আমি গভীর, আমি শাশ্বত, আমি বিরাহী।' তবেই তার সাংস্থানিক চিন্তগত কালগত আর অহংকৃত অবিদ্যার ঘোর ভেঙে উদ্ধৃত চেতনা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, ছাপিয়ে যাবে বিশ্বকেও এবং সেই বৈপুল্যের আবেশে ব্যাবহারিক জীবনও হবে আনন্দের ঋতচ্ছন্দবাসী দিব্য-জীবন।

এমনি করে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে আপনাকে অস্তর হতে ঘোড়শকলায় পূর্ণ করে তোলবার যে অতীপ্সা, তার চিন্ময়ী সিদ্ধি হল দিব্যজীবন-সাধকের প্রথম করণীয়। আগে নিজেই ফোটাতে হবে। তারপর আত্মচেতনার প্রসূত ওপার্শ্ব নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক যোগাযোগকে সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে হবে—এই হল তার দ্বিতীয় করণীয়। তার এ-তপস্যা সাধক হবে বিশ্বময় আত্মচেতনার অখণ্ড

বাস্তবতে—সদাশ্রিত্যের শিক্ষিতে। বিজ্ঞানমন চেতনা ও প্রকৃতিতে উদীর্ণ হবার পথে এ-ভাব স্বভাবতই ফুটে উঠবে সাধারণ মাঝে। কিন্তু তারও পরে বাকী থাকে তৃতীয় একটি করণীয়। চাই এক নতুন জগৎ, চাই শিশুমানবের জীবনধারার গোত্রান্তর। অস্তিত্ব এই পাণ্ডিত্য-প্রকৃতিতে অভিন্নব সিন্ধু-জীবনের একটা সংঘচেতনা ফুটিয়ে তোলা চাই। বিজ্ঞান-মন-জীবনের ব্যক্তিগত আদর্শই হবে এই সংঘ-জীবনেরও আদর্শ।

বিজ্ঞানমন পুরুষের স্বরূপের পরিচয় আগেই দিয়েছি, সংঘের কথাও বলেছি। এখন ব্যবহারিক দিক থেকে এই নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

আগেই বলেছি, উপনিষদের ভাষায় বিজ্ঞানমন পুরুষ শুধু আত্মারানই নয়, তিনি আত্ম-ক্রীড় এবং ক্রিয়াবান। অর্থাৎ তিনি যে শুধু আপনাতে আপনি আছেন কূটস্থ-চেতনায় অচল হয়ে, তা নয়। কূটস্থ থেকেই তিনি ছড়িয়ে পড়ছেন সবার মাঝে, তাঁর জীবন-চেতনায় আছে সবারই আত্মভাবের অংশ-নিবিড় চেতনা। নিজের মাঝে থেকেই তিনি সবার মাঝে বিলসিত, তাই তিনি আত্মক্রীড়, বিশ্বের নিত্যরাস তাঁর চেতনায়। অথচ তাঁর এই উন্নত প্রপঞ্চের উর্ধ্ব একটা তটস্থ শক্তির লীলা শুধু নয়। যেমন পৃথিবীর বত উর্ধ্ব থেকে ও সবিতার ত্রৈল তার মর্মে অনুবিক্ত হয়ে প্রাণ জাগায় ফল ফোঁটায় চেতনার উন্মেষ ঘটায়, তেমনি তাঁর লোকো-ত্তর স্থিতি ও উন্নয়নই আবার আত্মসম্পূর্ণতার চিন্ময় তপস্যায় রূপান্তরিত হয় বিশ্বলোকে। চেতনার প্রসার এবং উর্ধ্বায়নই বিশ্বজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগের পথেই হ'ক বা যোগের পথেই হ'ক, সবাই চাইছে বৃহৎ হতে, উত্তম হতে। আধার-আধারে এই যে আত্মোন্নয়নের আকৃতি, এ বৈশ্বানর বিজ্ঞানমন পুরুষেরই অবস্থা রূপের শিখা। বিশ্বময় তিনি দেখছেন এক চিন্ময়ী মহাশক্তির আত্মস্ফুরণের লীলা। এই দেবলীলায় তাঁর অস্ত-র্জোতির সত্যসঙ্কলপ ও ঋতসংবেগের যে-আবেশ, তা-ই তাঁর কর্ম। সে-কর্মে যেমন বিবিক্ত অহং-চেতনার কোনও দায় নাই, তেমনি নাই সামাজিক অহং-চেতনারও। তাঁর হৃদয়ে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বমানবে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বের ভূতে-ভূতে যে-পরমপুরুষ, তাঁরই মাঝে থেকে তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রবৃত্তিতে জীবন চলে দেওয়া—এই তাঁর দিব্য-কর্মের ছন্দ। এই অর্থেই তিনি ক্রিয়াবান।

সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন বলে তাঁর কর্মে ফোটে এক আশ্চর্য ছন্দোময় সাবলীনতা। বিজ্ঞানমন পুরুষ যে-ভূমিকাতেই থাকুন, জীবন-পরিবেশের সঙ্গে কোথাও তাঁর বিরোধ হয় না। তিনি জানেন, তাঁর দিব্যসঙ্কলপের ছন্দোবাহী এই জগতে কোথায় তাঁর স্থান। তাই, যেমন তিনি শাস্তা বা নায়ক হতে পারেন, তেমনি পারেন অধীন হতে। দুটি ভূমিকাতেই তাঁর সমান আনন্দ। তাঁর অস্তরের স্বাতন্ত্র্য শাশ্বত এবং অব্যভিচারী বলে ঈশনার নিরঙ্কুশ স্ফুরণে

তঁার যতখানি উন্নয়ন, ততখানি উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবকের অধীনতায়। অথচ প্রাকৃত-বৃদ্ধির আদর্শবাদ তাঁকে কখনও বাধিত পারে না। অর্থাৎ সেবা যেমন তাঁর পুরুষা নয়, তেমনি সমাজসেবা রাষ্ট্রসেবা বা মানবসেবা ও তাঁর ঐকান্তিক পুরুষার্থ নয়। কারণ এদের মনঃকল্পিত অর্ধগতাকে ছাপিয়ে ভাগবত-সত্যের দ্বিবা আবেশে আনিষ্টে তাঁর চেতনা, বিশেষাঙ্গীর্ণের পরন-জ্যোতিষ্টে তাঁর জীবনের দিশারী। সত্যতঃ তাঁর মাঝে নিশ্চয়িত্বের প্রেরণা আসে বিশ্বে-দীর্ঘরেই দ্বিবাগতত্বের মুক্তচক্ষু হতে। তাই প্রাকৃত-মনের অনুশাসন মানতে তিনি বাধ্য নন। অথচ তিনি প্রাকৃত-জনেরই সেবক। অধির তাদের অসুখাবীরী ঈশানও।

বিজ্ঞানমন পুরুষের বাহ্য কর্মের এই ধারা। কিন্তু তাঁর আন্তর-কর্মের অধিকার আরও ব্যাপক এবং নিগূঢ়। আনাদের পরিচিত প্রাকৃত-চেতনার শক্তি নিয়েই তাঁর কারবার নয়। সত্য বসতে তিনি অধিচেতন শক্তির কারবারী। এইখানে তাঁর কর্মযোগের রহস্যক্রমের শুরু।

রহস্যশক্তি অবশ্যই সাধারণের ধরাচৌয়ার বাইরে, কিন্তু তাবলে তা অবাস্তব নয়। প্রকৃতির সব শক্তি যে আনন্দা ভ্রমতে পেনেছি তা নয়, জানার চেষ্টা করছি মাত্র। একটা নিঃসান রহস্যানুভবের ভিতর দিয়েই আমাদের জ্ঞানবার অভিযান চলছে। রহস্য যেমন বাইরে আছে, তেমনি আছে অন্তরেও। দুটির আনিজ্ঞিয়ার ধারা এক নয়, যদিও উভয়ক্ষেত্রে আনন্দা মনঃশক্তিরই প্রয়োগ করে থাকি। বাইরের রহস্য আয়ত্ত করার প্রধান সাধন হল ইন্দ্রিয়জ্ঞানাত্মিত অনুমান এবং কল্পনা। কল্পনা অনুমান হতে স্বতন্ত্র বৃত্তি, তাঁর সঙ্গে অতীন্দ্রিয় বোধির যোগ আছে। অস্ত্রবিজ্ঞানের কারবার কিন্তু এই বোধিকে নিয়েই। বোধির সহায়ে কি করে অন্তরের রহস্যশক্তির আবিষ্কার এবং ব্যবহার সম্ভব, তার আলোচনা যোগ-বিজ্ঞানে আছে। সৈ-বিজ্ঞান দুঃসাধ্য, কিন্তু অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয়। চেতনার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে নতুন শক্তির আবির্ভাব হবে, এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। চেতনার উৎকর্ষ ঘটে নিবৃত্তিতে, অর্থাৎ তার শ্রোতকে অস্ত্রুৎ করাতে। চরম নিবৃত্তিকে যোগীরা বলেন 'কেবলা' অথবা পুরুষের স্বরূপাবস্থান। কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি একটি মিথুন-তর অর্থাৎ চেতনা থাকলেই মানতে হবে তার শক্তিও আছে। তাই নিরুদ্ধ বা কেবল চেতনাতে স্বভাবের নিয়মেই ফোটে বিভূতি বা অন্তরের রহস্যশক্তি। যোগীরা বলেন, বিভূতির আবির্ভাব হয় বিবেকখ্যাতি হতে অথবা প্রাতিভ-সংবিৎ হতে। দুটিকে মিলিয়ে বলা যায়, তটন্ত নিস্তরঙ্গ চেতনা হতে বিভূতির আবির্ভাব হয় যেন বিদ্যাতের ঋনকের মত।

সাধনশাস্ত্রে বিভূতির সম্পর্কে সাধককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কারণটা স্পষ্ট। শক্তির একটা বোহ আছে। শিব না হয়ে শক্তির সঙ্গে খেলা করতে গেলে শক্তি বাড় নাটকে দেয়। জীবন হতে সরে দাঁড়াতে চান গাঁরা, তাঁদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানের সার্বকতা নিশ্চয় আছে, কেননা ঋক্ষিকে অঙ্গীকার করলে জীবনের দায় বাড়বেই, নির্জলা মুনুকার পথে

কাঁটা পড়বেই। তাছাড়া ঋক্ষির অলৌকিক সহজেই সাধকের কাঁচা-আমিকে অথবা ফাঁপিয়ে তুলে সর্দনাশ দাঁটাতে পারে। কৈবল্যের অতীপসা গাঁর নাথ, বিভূতির প্রলোভন থেকে স্বভাবতই তিনি সরে থাকতে চাইবেন—কেননা বিভূতি মানুষকে যেমন তুলতেও পারে, তেমনি নানাতেও পারে। ওর অপপ্রয়োগ যত সহজ এমন আর-কিছুই নয়।

কিন্তু কেবল নিঃশ্রেয়স নয়, অভ্যাসও যদি হয় অধ্যাত্মসাধকের পনম পুরুষার্ধ, প্রাণ ও চেতনার প্রসারে আধারে স্বভাবতই যদি অভিনব সামর্থ্যের উৎসারণ ঘটে, তাহলে শক্তিসম্বন্ধ সম্পর্কে কোনও নিষেধ পাটতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানঘন চেতনায় উদ্ভীর্ণ পূর্ণকন্ডের আধারে পরমা-প্রকৃতির দিব্য-বিভূতির উন্মেষ হবে তাঁর স্বাভাবিক আত্মোন্মেষেরই পরিণাম। মানুষের চেতনা মননশক্তিকে যেমন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে, বিজ্ঞানঘন পুরুষও বিজ্ঞানশক্তিকে ব্যবহার করবেন তেমনি। শক্তির অপপ্রয়োগের ভয় প্রাকৃত মানুষের বেনাতেই আছে, কেননা তাঁর চেতনা অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং অসম্যাক-দর্শী। কিন্তু বিজ্ঞানঘন পুরুষ তা নন বলেই অপপ্রয়োগের ভয় তাঁর বেনাতে থাকতে পারে না। তাঁর চেতনায় অধিচেতন-ভূমির ঐশ্বর্যের দূয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় বলে দিব্য আত্মবিভূতির প্রয়োগ হয় তাঁর কর্মযোগের একটা নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য।

পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞানঘন চেতনার সিদ্ধি প্রথমত আসবে একক জীবনেই, কেননা প্রকৃতি বাজি-চেতনাকে আশ্রয় করেই সমষ্টি-চেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে। বিজ্ঞানঘন পুরুষ তাই প্রথমত নিঃসঙ্গ, বাইরের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অন্তরের দিব্যধানে ওদ্বাহিত। তবুও আলোর ধর্ম ছড়িয়ে পড়। তাই অগোচরে হলেও তাঁর চেতনাব লীপ্তি নিঃশঙ্ক সবার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কেউ-কেউ সাড়া দেয়, অন্তরের আকর্ষণে তাঁর কাছে ছুটে আসে। এমন করে একজন সিদ্ধপুরুষকে কেন্দ্র করে সব দেশেই চিরকাল নানাদরনের অধ্যাত্মগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানঘন-সংঘও এমন করেই গড়ে উঠবে। কিন্তু প্রাচীন সংঘ হতে তাঁর আদর্শ হবে একটু ভিন্ন। ইহবিমুখীনতা দিব্যজীবন-সাধনার লক্ষ্য নয়। প্রাকৃত-জীবনকে ছাপিয়ে উঠতে হবে, নইলে অধ্যাত্মসিদ্ধি অসম্ভব—একথা বুঝেই সত্য। কিন্তু চেতনার উত্তরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর বীর্ষকে অবরভূমিতে গহ্বরিত করে তাঁরও রূপান্তর ঘটতে হবে, সিদ্ধজীবনের এও একটা দায়। তুরীয়ার ভাবনা জাগ্রৎকেও অর্গুশিষ্ট করবে, বাস্তব সাধনা হবে বিগ্নেহ, জন্য, আর সমগ্র আধারের ঘটবে আনুল রূপান্তর—তবেই পৃথিবীর বৃকে নবজীবনের আবির্ভাব সম্ভব হবে। বিজ্ঞানঘন সংঘের তা-ই লক্ষ্য।

কিন্তু এট সংঘ যে একদিনেই পরিপূর্ণ মহিমা প্রাপ্তি হতে পারে তা নয়। বহুজনের মধ্যে মর্ত্যপ্রকৃতির পূর্ণরূপান্তর কখনও অতিক্রমিত সিদ্ধ হতে পারে না। তাঁর জন্য যুগব্যাপী অতন্ত সাধনার প্রয়োজন। প্রথমত সংঘের বিবিধ জীবনে এমন-একটি শরৎ-তন্ময়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, যা সবারকনে বাজি-চেতনার দিব্য-পরিণামের অনুকূল হবে।

এইটি হল শক্তি-সংহরণের পর্ব। তারপর ঐ মস্তপূত চিন্ময় পরিবেশে অভিনব জীবনধারার রূপায়ণ এবং উন্মেষ ঘটিতে হবে। এইটি হল শক্তিনিষ্করণের পর্ব। কাজটা যে সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। সাধনার গোড়ায় রূপান্তরের বাধাগুলিই আরও জোরালো হয়ে ফুটেবে। অধ্যাত্ম-জীবনের এটি একটি সাধারণ নিয়ম। কাঠে আগুন ধরাতে গেলে তার তিতরের বসানিই আগে গাঁতলা হয়ে বেরিয়ে আসে। তবে চিত্তের অতীপ্সা যেখানে অত্যন্ত এবং ঐকান্তিক, সেখানে বাধার সঙ্গে লড়বার জন্য শক্তির যোগানও আসে তিতর থেকে। বাধার গাধকতাও ঐখানে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানঘন-সংঘে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং সমূহের সৌম্যমোর মাঝে একটি সমন্বয় ঘটিবে। প্রাকৃত-ভূমিতে ব্যক্তিগত-ব্যক্তিগত বৈষম্যই প্রবল। বৈষম্য ঘটিয়ে সৌম্য আনবার জন্য প্রাকৃত-মন যখন সংঘ গড়তে যায়, তখন সবাইকে সে চালতে চায় এক ছাঁচে। কিন্তু দিব্যসংঘে জীবনের আদর্শ তা নয়। সংঘে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রয়েছে; সে তার স্ব-ভাবের স্বাতন্ত্র্য। আর ভাব সেখানে উর্ধ্বমুখী বলে কারও স্বভাবের সঙ্গে অপরের স্বভাবের বিরোধ হতে পারে না। বিরোধ সেইখানেই দেখা দেয়, চেতনা যেখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে নিজের মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। গার্ব্ভঃ নাই, তার পরও নাই—সবাই আপন। নিজের গভীরে যে ডুবচে বা আকাশের মত সব-কিছুকে যে ছাপিয়ে রয়েছে, বিশ্বে সে দেখে একেরই বহুধা রূপায়ণ। বৈচিত্র্য তার কাছে প্রতিভাত হয় একেরই স্বচ্ছন্দ ঐশ্বর্যের রূপে তাই কোথাও সে বিরোধ দেখতে পায় না।

সবাই একেরই বিভূতি, অতএব দেহের অত-প্রত্যয়ের মত সবাই আপন—এই একত্ব (unity) এবং অন্যান্যভাবনাই (mutuality) সৌম্যমোর (harmony) মূলমন্ত্র। সম্বন্ধ বিজ্ঞানঘন জীবনের তা অনুদ্রবণায় স্বভাবধর্ম।

সমাজ গড়তে গিয়ে একই অন্যান্যভাব এবং সৌম্যমোর অস্তিত আংশিক প্রতিষ্ঠার সাধনা আমরা করে থাকি, কেননা এদের ছেড়ে আমাদের সমাজজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তির অহং মরে না বলে এত করেও আমরা গড়ে তুলি কৃত্রিম একত্বের একটা কাঠামো মাত্র। একই সেখানে একটা নুপোস বা জোড়াতালির ব্যাপার, ভিতরে-ভিতরে সংঘাতটাই প্রবল। কিন্তু বিজ্ঞানঘন চেতনায় অস্তুরে সমস্ত গুণি শিথিল হয়ে যায়—জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের প্রস্তার সঙ্গে সঙ্কল্পের এবং দৃষ্টির সঙ্গে কর্মের কোনও বিরোধ সেখানে থাকে না। ব্যক্তির চেতনা এমনিতর স্বচ্ছ সাবলীন এবং উদার হলেই সমাজে যথার্থ একই অন্যান্যভাব এবং সৌম্যমোর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিজ্ঞানঘন-সংঘের এই দায়। তাকে একটা নতুন সমাজ-চেতনা গড়ে তুলতে হবে। পঙ্ক্তবৃত্ত মানুষের সমাজ তো দেখছিই। আজকাল সংস্কৃতির রূপান্তরের কথা যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা দেখছেন মনস্কীর সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। গড়তে হবে যোগীর সমাজ। ন্যায়-বুদ্ধির (logical reason) উর্ধ্ব গুরু-বুদ্ধির এবং বোধির সহজ বৃত্তি হবে সে-সমাজের ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি।

পাখিব-পরিণামের এই যদি হয় চরন-নিমিত্তি, তাহলে একবার দেখা দরকার উদ্ভা-
য়ণের পথে আমরা এসে কোথায় দাঁড়িয়েছি এতদিনে। বর্তমানে চলছে একটা পর্বসন্ধির
যুগ, এসেছে আমাদের পথ বেছে নেবার তাগিদ। একটা বৈষম্যের ফেरे পড়েছে আজ
মানুষের মন। কোনও-কোনও বিষয়ে যেমন তার অসম্ভব উৎকর্ষ ঘটেছে, তেমনি অন্য-
দিকে সে রয়ে গেছে পথহারা উদ্ভ্রান্তের মত। দেহ-প্রাণ-মনের সকল দাবি সকল ক্ষুধা
মোটাতে সমাজে রাষ্ট্রে বৃত্তিতে ও সংস্কৃতিতে সে এনেছে অভাবনীয় বৈচিত্র্য। একটা অতিক্রম
সভ্যতার সে সৃষ্টি করেছে, অথচ তার প্রমত্ত অহং এবং ক্ষুধিত বাসনা যে কি করে একে মানস
দেবে তা সে ভেবে পাচ্ছে না। জীবনে ঐশ্বর্য অবাঞ্ছনীয় নয়, কেননা তাতে শক্তির প্রকাশ
ঘটে। চেতনার উৎকর্ষে শক্তি দেখা দেবেই। কিন্তু সে যদি শিবের সঙ্গে যুক্ত না হয়,
তাহলেই বিপদ। শিবহীন শক্তিসাধনার পৌরাণিক উদাহরণ হল দক্ষ-যজ্ঞ। আধুনিক
সভ্যতা প্রজাপতির সামর্থ্যের অহঙ্কার করতে পারে বটে, কিন্তু সে-সামর্থ্যের পরিচালক হচ্ছে
ছাগবুদ্ধি। জৈবকামনার তর্পণটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিপদ এইখানেই।

তবুও সমাজে গায় ননদী, তাঁরা একটা আদর্শবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন।
কিন্তু সেখানেও সমস্যার অশু নাই। সভ্যতার প্রগতির জন্য যা প্রয়োজন, তার সঙ্গে প্রগতি-
বিরোধী উপাদানের জটলা পাকিয়ে জীবনসমস্যার সমাধানের একটা বিকল চেষ্টাই চলছে
আজকাল। এমন করে খাড়া করানো হয়েছে জীবনাদর্শের তিনটি ছক ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা
বা সমাজজীবনের পূর্ণতা বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে সমাজের
আদর্শ-সমন্বয়। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিরূপণ অস্বীকার্য না হলে কোনও সমাজই
এগিয়ে যেতে পারে না। এদেশের প্রাচীন সমাজে দুয়ের সম্বন্ধের মাঝে সাধ্যমত একটা
সমন্বয় ঘটানোতে তার ভিত্তিও এতটা পোক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের বদল হয়েছে
বলে প্রাচীন ধারা আজ সবক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারছে না। জীবনের সমস্যাকে আজ
নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ফলে মানুষের চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে একটা
বিধার আন্দোলন। ব্যক্তি কি আজ স্ব-তন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলবে, না সমাজ বা রাষ্ট্রের
কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপই হবে তার জীবনাদর্শ?

অপক্ষপাতে বিচার করতে গেলে দেখি, ব্যক্তি আর বিগু অন্যান্যনির্ভর। বিগুকে
আশ্রয় করে যেমন ব্যক্তির প্রকাশ, তেমনি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিগুর ক্ষুধা। কিন্তু
তাহলেও জীবব্যক্তিই হল প্রকৃতি-পরিণামের মূলসূত্র, কেননা আগ্রোপলক্ষি বা নতুন
সভ্যতার উপলব্ধি হয় জীবব্যক্তির মাঝেই মনোর আগে। ফলে তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমস্ত
মাঝে। ব্যক্তি ও সমস্তের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে সংখ্যা ও আয়তনকে আমরা বড় করে
ভুলি বলে প্রায়ই আমাদের বিচারে ভুল হয়। আগেই বলেছি, প্রকৃতি-পরিণামের মাঝে
জগৎ উৎকর্ষ পিরামিডের চূড়ার মত সর্বত্রই আয়তনে স্বল্প। মানুষের সমাজে কতকগুলি

জৈববৃত্তির দিক দিয়ে আমরা একটা সৰ্বগত সান্নাৎ আনতে পারি, কিন্তু নবোবৃত্তির দিক দিয়ে পারি না। সমাজের সবাইকে সমানভাবে স্বস্থ ও সবল হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু সবাইকে সমান বুদ্ধিমান করা যায় না। যদি-বা কোনও দিন সবাইকে বৌদ্ধিক উৎকর্ষের একটা সাধারণ ভূমিতে নিয়ে আসতে পারি, তবুও উৎকর্ষের প্ৰগতি অব্যাহত রাখবার জন্য ওই মধ্যে নতুন-নতুন প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্যাব্যবী হবে, যারা সৰ্বসাধারণ উৎকর্ষের মানকে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং সমষ্টির প্ৰগতির জন্যই ব্যক্তির অসাধারণ উৎকর্ষের দাবিকে স্বীকার করে নিতেই হবে—নোনাছি বা উইপোকার জীবনায়নের গানাকে আদর্শ ভাবে চলে না।

আধুনিক সমুদ্রবাদের স্রষ্টা হয়েছে প্রতীচো—অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। ভোগের উপকরণ সঞ্চিত হন ব্যক্তির হাতে, সমুদ্র হল বঙ্কিত। তাই সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ব্যাপারটা ঘটেছে ব্যক্তির ধর্মবুদ্ধির অভাবে। অধ্যাত্মচেতনা না জাগলে সত্যাকার ধর্মবুদ্ধিও জাগে না। সে-চেতনার লক্ষণ হল বিশ্বাসভাবনা। অহং-চেতনা যখন রূপান্তরিত হবে স্বগভীর এবং সৰ্বগত আত্মচেতনাত, ত্রৈধর্ম্য তখন হাতের মুঠায় এনেও তা ত আসক্তি পাকবে না। ‘সুতরাং’ লৌপতা ও কাপণ্যও পাকবে না, ভোগের উপকরণ নিয়ে হানাহানির প্রয়োজনও হবে না। এই সর্বাঙ্গভাব এবং অনাসক্তির বীজ মানুষের স্বভাবে রয়েছে, সুতরাং তার অনুশীলন তো কৃচ্ছসাধনা নয়। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার এই ভাব এই মনভা রয়েছে সন্তানের প্রতি, নইলে সন্তান বাঁচত না, বড় হতে পারত না। পরিবারে যা সম্ভব, সমাজে ও তা সম্ভব হবে না কেন? তা সম্ভব করবার জন্য পরিবেশের যেমন বদল চাই, তেমনি ধর্মবুদ্ধিরও উন্মেষ চাই। নতুন সমাজ গড়বার জন্য বিপ্লবই যথেষ্ট নয়,—চাই আত্মবোধের জাগরণ, অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ। যিনি আত্মস্থ, তিনিই সার্বক বিপ্লব ঘটতে পারেন। তিনিই ধর্ম দিয়ে অধর্মকে বিনাশ করতে পারেন। নইলে অধর্ম দিয়ে অধর্মকে বিনাশ করতে গেলে অধর্মের অধিকারই বেড়ে চলে। বর্তমান জগতে হচ্ছে ও তাই। অধর্মচারীর প্রতি যে-বক্তিতের আক্রোশ, সে যদি স্বয়ং ধর্মবুদ্ধি না হয়, তাহলে তার সূক্ষ্ম পাপবুদ্ধিই তার অভ্যুদয়কে ধুলার নুটিয়ে দেবে। তার যারা ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনকালেই হবে না।

প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাব আজ সমস্ত জগৎ জুড়ে। তাকে এড়াবার উপায় নাই, প্ৰয়োজনও নাই—কেননা সেও প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণামের একটা পর্বে এসে দেখা দিয়েছে তিতরের তাগিদেই। তার নূলে আছে যুক্তিবাদ, যাকে বলা চলে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিযোগ। তাতে জীবনের সকল সমস্যার যাচাই হয় যুক্তিশাণিত বাবগারিক-বুদ্ধির বিচার দিয়ে। তার ফলে বাস্তবের প্রেরণায় জীবনকে গড়ে তোলবার সাধনা চলে। লৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিষ্ঠুর ব্যবস্থাই হল তার লক্ষ্য। প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শকে ভাঙিয়ে সে স্রষ্টা করল ‘মানবতা-বাদ’ (Humanism)—যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোনও বালাই রইল না, মানুষের মান-

সিক ও নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনাই হল যার মূল। সমুদ্রবাদ (Collectivism) ও জাতীয়তা-বাদ (Nationalism) এই মানবতাদেরই রক্ষনকর্ম। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ মূল প্রবক্তিত গোষ্ঠিত, ধর্মের সাধুনা তাদের ইহলোকে নয়—পরলোকে। এদের জাগাতে হলে নৈজাতিক বুদ্ধিযোগেরই প্রয়োজন। কিন্তু তাহলে মানবতাবাদ এবং বৃত্তি-গৌরবকে (economic welfare) যদি মানুষের চরম পুরুষার্ণ বনে করি, তাহলে ভুল করব। কারণ আগেই বলেছি, সত্যকার ধর্মবুদ্ধির উদ্দেশ্য না হলে সমষ্টি-জীবনেরও সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু বুদ্ধির কগরত দিয়ে জাতির প্রগতিককে জ্বিয়ে রাখা যায় না বৈশাদিন, কেননা দেহ-প্রাণ-মনের চাইতে বড় একটা তবের দিকে বুদ্ধির নোড় ফেরানো থাকলেই তার দীপ্তি সতেজ থাকে। মানুষের স্বভাব বদলাবে না অথচ জীবনের ধারা যাবে বদলে, এ শুধু জড়বাদীর অযৌক্তিক আশা।

বাইরের নোহে তিতরটাকে উপেক্ষা করলে প্রগতির সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তার সূচনাও দেখা দিয়েছে জগৎ জুড়ে, মানুষের অস্ত্রজীবনের অশান্তি এবং অনৈশিচ্যের পীড়নে। ভোগোপকরণের প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থেকেও তার চিত্তে অসন্তি আশঙ্কা যার হাহাকার। এ-দুর্দৈবের প্রতীকার তো বাইরে নাই, আছে ভিতরে। শক্তির উৎস না উঠলে শক্তির প্রণামন বা সন্তোষ সম্ভব নয়, একথা আগেও বলেছি। তাই লোকোত্তরকেই লোক-জীবনের বনিয়াদ করতে হবে, পুণ্যতার ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শূন্যতার বুকে। কর্মের প্রতিষ্ঠা হবে নৈকর্ম্যে, ভোগের প্রতিষ্ঠা ত্যাগে। চিত্তের আকাশবৎ ব্যাপ্তি এবং রিজুতা হতেই আলোর নিখর স্বরে পড়বে। আধ্যাত্মিকতার এই আদর্শ যে বাস্তব এবং লোকায়ত হতে পারে, তার পরীক্ষা এ দেশে বারবার হয়ে গেছে,—যদিও সৃষ্টি পরিচালনার অভাবে তা স্থায়ী হতে পারেনি। আধ্যাত্মিকতার মাঝে যে-ইহবিন্দুমানতা জীবনকে বাইরে উন্নত করে তুলেছে চিরকাল, আজ শুধু তাকেই বর্জন করতে হবে, আধ্যাত্মিকতাকে নয়। বরং তাকেই করতে হবে জীবনের সমস্ত প্রেরণার উৎস। তার জন্য তার প্রাচীন ধারার অনেক-খানি পরিবর্তন করে নিতে হবে, অতীতের যে-সিদ্ধি কল্যাণকর তাকে প্রত্যাখ্যান না করেই তার অসুগৃহীত বাঙনাকে ব্যবহারিক জীবনেও ফলপ্রসূ করতে হবে।

'অধ্যাত্মজীবন তপঃকৃচ্ছতা এবং অপরিগ্রহের জীবন', বলতে গেলে এ-ধারণাটা আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু দৃষ্টির প্রসার ঘটলে মনে হবে, এও তো অবিদ্যাশাসিত মনের আদর্শবাদের জল্পনা। বস্তুত চরিত্রের সকলক গুচিতা ও অর্থ ও আত্মসংযম নিকান পুরুষের সহজ স্বভাব। ঐশ্বর্য কিংবা দারিদ্র্য তার কোনও বিপর্যয় ঘটেনা। দারিদ্র্য যাকে ক্রুদ্ধ করে কিংবা ঐশ্বর্য যার বিকার আনে, বুঝতে হবে তার অকামতা অথও কি সত্য নয়। বিজ্ঞানঘন পুরুষের একমাত্র পরিচয়—ঠাঁঠ-জীবন দ্বিতীয়-পুরুষেরই সত্যসঙ্কল্পের লীলা। সে-লীলা ফুটে পারে যেমন অতিসারলো তেমনি অতিজটিলতায়, যেমন রিজুতায় তেমনি ঐশ্বর্যে অথবা উভয়ের স্বাভাবিক সমন্বয়ে।

সবই যোগজীবনের উদ্ভব বহন। তা ভোগের প্রমত্ততাও নয়, অথবা বৈরাগ্যের উষ্মতাও নয়। তা স্বনামি আত্ম পুরুষের চিন্ময়্যের স্বচ্ছন্দ বিকিবন। তা-ই জীবনের বিভ্রান্তন নীনাগন, যা অবিদ্যার-সিদ্ধকার চাইতে আরও পূর্ণ যাবও সার্বক আরও বর্ণোচ্চন। তার পূর্ণ সার্বকতা জীবনের অপঘাতে নয়—এই জীবনের মাথেরই তার স্বরূপজ্ঞের চিন্ময়ী

অতিমানসের অন্তরণে সব চিনিষ সবরেই হতে থাকবে, এ সম্ভব বটে, কিন্তু তা যে সর্সরোগকারী মহোষধের মত কাজ করবে, চক্ষের নিমেষে সব পরিবর্তন করে ফেলবে, এমন মোটেও নয়।

*

অতিমানস পৃথিবীতে নেমে এসেও কিছু পরিবর্তন আনবে না, মানুষ যদি তার অহমিকা আঁকড়ে ধরে থাকে।

*

বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে নিরন্ত তিনি আসে দেবের কাছে, মধুর নবীন রূপ ধরে, সেই পুরাতন তিনি—

চিন্ময় সত্তাকে বাস্তব করে ধরতে, ভগবানের মধো সব রূপান্তরিত করে তুলতে।

শ্রীঅরবিন্দ

সৃষ্টির অন্তহীন ধারায় প্রতি অবতার হলেন 'ভাবী অবতারের অগ্রদূত ও পুরোধ'।

তবুও মানুষের সর্বদা প্রবৃত্তি হল অতীতের অবতারকে বড় করে ভবিষ্যতের অবতারের বিরুদ্ধে স্থাপন করা।

ভগবানের কাছ থেকে সবে ১. ভগবানের করুণা প্রত্যাখ্যান করা—এর চেয়ে নৃচুতা আর নেই।

কোন গুরাকাক্সা রাখবে না, কোন কিছু ভাগ করবে না—প্রতি মুহূর্তে যা হয়ে ওঠা তোমার সাধের সীমা, তাই হয়ে উঠবে।

★

কদর্ষা চিন্তা কদর্ষা আবেগ নিয়ে আসে, কদর্ষা আবেগ ভগবানের কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যায়, তোমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে দেয় শয়তানের হাতের মধ্যে—শয়তান চায় তোমাকে গিলে ফেলতে। অন্তহীন তপস্বির ও কষ্টের মূল হল এই।

কথার সঙ্গে অনেক সময়ে পোকা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞা ১সে নীরবতার মধ্যে।

শ্রীমা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭

ালো ত বেড়েই চলেছে। আর ছায়া ?
ছায়া শুধু ছায়া,—আলো যেমন বাড়বে ছায়াও
তেমনি মিলিয়ে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ



শ্রী অরবিন্দ
(জাতীয় আন্দোলনের নেতা, বয়স ১২০৭)

যায়ের প্রার্থনা

নবেম্বর ৭, ১৯১৫—এটার সময়

বাধ্য কোন ইচ্ছিত নাই, অবস্থারও কোন বিশেষত্ব নাই, সময় চলেছে এমন গভীর পদক্ষেপে, ভিতরেও রয়েছে এমন প্রগাঢ় নীরবতা, এমন গভীর বিপুল প্রশান্তি, যে অশ্রু আপনা থেকে ঝরে পড়ে অফুরন্ত ধারায়। দুদিন থেকে মনে হয় যেন পৃথিবী একটা একান্ত সম্বৎকাল পার হয়ে চলেছে, এবার বৃষ্টি স্থলের বাধা আর অধ্যাত্মের শক্তি এ দুয়ে যে সম্মূল যুদ্ধ চলেছে তার একটা মীমাংসা আসন্ন, অন্ততঃ একটা বিশিষ্ট উপকরণ নীলাক্ষেত্রের মধ্যে এসে দেখা দিয়েছে বা দেখা দিতে চলেছে।

এমন সব মুহূর্তে ব্যক্তির মূল্য কি নগণ্য! সে যেন হাওয়ার মুখে ঝড়ের মত, মাটি থেকে উড়ে উঠে যায় উপরে, ঘুরপাক খায় আবার পড়ে যায়, চূর্ণ হয়ে ধূলিতে পরিণত হয়। ব্যক্তির তাই অনুভব করে তাদের অবস্থা সম্প্রহাকুল, সকল রকম প্রাধান্যবঞ্চিত—তাই তাদের মর্মস্তম্ভ দুঃখ শোক তাপ। অপেক্ষা করে থাকাও তাদের পক্ষে একটা চিরন্তন আশঙ্কা, সব-কিছুই তাদের কাছে বিপদের বার্তা নিয়ে আসে।

কিন্তু এই যে স্থল-যন্ত্রণা কেবলি সঙ্কীর্ণ অহমিকা দিয়ে গড়া তার মর্মস্তম্ভে রয়েছে কি মহত্ব, কি পরম সৌন্দর্য! এই বে অপেক্ষায় থাকা তন্ময়তার ফলে প্রায় আরাধনায় পরিণত হয়েছে তার অন্তর ধরে আছে কি উজ্জ্বল-শ্রী—তা দেখা যায় যে মুহূর্তে ব্যক্তিগত অন্ধতার সীমানা ধসে পড়ে, ব্যক্তিগত চেতনা উর্দ্ধে উঠে বৃহত্তর মধ্যে প্রবেশ করে, তোমার সনাতন চেতনার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্যে।

ভগবান, মূক বিনতি নিয়ে তোমার সম্মুখে ব্যথিত জগৎ নতজানু—ক্লিষ্ট জড়বস্ত্ত তোমার পদতলে আনুষ্ঠিত, তার শেষ একমাত্র আশ্রয় সেখানে। তোমাকে বিনতি করা অর্ধ তোমাকে সে পূজা করে, যদিও তোমাকে জানে না বোঝেও না। তার প্রার্থনা উঠে চলে সমুদ্রের আর্দ্রনাদের মত—যে চলেছে লুপ্তির পথে সে কেমন স্পষ্ট অনুভব করে যে তার পুনর্জীবনের সম্ভাবনা আছে—তোমার মধ্যে। সাষ্টান্দ্রে প্রণত হয়ে পৃথিবী তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায়। শোন শোন, কঠে তার বিনতি আর অনুনয়—কি তোমার আদেশ, কি তোমার বিচার-ফল? সত্যময় হে ভগবান, ব্যক্তির জগৎ ধনা হয়েছে তোমার সত্যে, যদিও তাকে সে জানে না এখনো। ভবুও তাকেই সে ডাকে, তার সমস্ত প্রাণশক্তির জোরে সানন্দে তাকেই ধরে রয়েছে।

মৃত্যু তার বিরাট কলবর নিয়ে এল, চলে গেল—তার গতি-পথে সনাতিত-চিত্তে সবই নইল নীরব হয়ে।

পৃথিবীর উপর আবির্ভূত হয়েছে এক অমানুষী সৌন্দর্য—

অতি অপক্লপ মহাস্বপ্নের অপেকাও অপক্লপ কিছু ছানিয়েছে তার গান্ধী।

নবেম্বর ২৬, ১৯১৫

চেতনা সম্পূর্ণ ডুবে ছিল ভগবানের ধ্যানে, সমগ্র আধার ছিল এক বৃহৎ এক পবন মহাস্বপ্ন ভোগে।

স্বপ্ন দেহ, প্রথমে তা নিম্নতর অস্তগুনি, পরে সমগ্রভাবে, একটা পুণ্য-স্পন্দনে শিহরিত ; ক্রমে ভড়তন অনুভবেরও সকল ব্যক্তিগত গোঁমানা থমে পড়ল। সমগ্র বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে উঠল, ধাপে ধাপে, স্থানিয়মিত ভাবে, সকল জ্ঞান ভেঙ্গে দিয়ে, সকল বাধা কাটিয়ে, যাতে সে ধারণ করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে প্রসারে তীব্রতায় নিরন্তর বর্ধমান এক মহা বল এক মহা শক্তি। এ যেন দেহের যাবতীয় কোষ ক্রমে স্ফীত হয়ে চলেছে, শেষে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আকাশের প্রসারে স্তম্ভগভাবে এই যে পৃথিবীমণ্ডল ঘুরে চলেছে, জাগ্রত চেতনার দেহ যেন তাই হয়ে উঠেছে—তবে চেতনা জানে তার পাখিব-বঙলাকার দেহ এ রকমে চলেছে বটে, কিন্তু বিশ্বপুরুষের আলিঙ্গন-বন্ধ হয়ে, তাঁরই কাছে নিজেদের দিয়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে প্রশান্ত আনন্দে বিভোর হয়ে। তখন চেতনার অনুভব হল, তার দেহ বিশ্বের দেহের মধ্যে নিশে গিয়েছে, এক হয়ে গিয়েছে ; চেতনা তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বের চেতনা, তার নিশ্চল সমগ্রতা নিয়ে আবার তার আপনার অন্তর্গত সচল সব অনন্ত-বৈচিত্র্য নিয়ে। বিশ্বের চেতনা আবার ছুটল ভগবানের দিকে, তীব্র আত্মহা আর পূর্ণ সমপণ নিয়ে—দেখলে সে নিকলঙ্ক জ্যোতির প্রভাবওলে প্রসন্ন পুরুষ বচসার্ব এক সর্পের উপর দাঁড়িয়ে, সর্পটির দেহ পৃথিবীকে ঝড়িয়ে ধরেছে অনন্তভাবে। আর সে-পুরুষ তাঁর সনাতনী বিজয়-ভঙ্গিতে সর্পটিকে এবং সর্প হতে নিঃসৃত বিষকে যুগপৎ ধমনে রেখেছেন এবং স্টাট করছেন। সমগ্র বিজয়ী শক্তি নিয়েই তিনি সর্পটির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—সে অদ্বভঙ্গি বিশ্বপ্রাসী সর্পটিকে প্রতিহত করে রেখেছে যেমন, আবার তেমনি নিরন্তর পুনর্জীবিত করে চলেছে। চেতনা তখন সেই পুরুষই হয়ে উঠল, দেখল তার রূপ আবার বদলে গেল, নিলে নিশে গেল এমন একটা জিনিসের মধ্যে যার নিজের রূপ নাই, যাতে রয়েছে সকল রূপ, অব্যয় অক্ষয় জিনিস একটা, ঐশ্বর্য নাত্র সাক্ষী স্বরূপ। আর সে যা দেখে, তাই আছে। তারপর রূপের শেষ-চিহ্ন লোপ পেয়ে গেল, চেতনা পর্যন্ত ডুবে মুছে গেল অনির্বচনীয়ের অবাচ্যের মধ্যে।

ব্যক্তিগত দেহের দিকে প্রত্যাবর্তন ঘটা সভ্যত্ব ধীরে, জ্যোতির শক্তির আনন্দের আরাধনার একটা নিরবচ্ছিন্ন অকৃত প্রোত্ক্ষলতার ভিতর দিয়ে, ক্রম-পরম্পরা ধরে, তবে সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ বিশৃঙ্খল এবং পৃথিবীগত রূপাবলীর ভিতর দিয়ে ফিরে আসার চলে না এসে। এ-গেনে তুচ্ছ এই দেহরূপটিই সনাতনের পরম-সাক্ষীর সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ আধার হয়ে উঠল, কোন নশাবলীকে আশ্রয় না করে।

জানুয়ারী ১৫, ১৯১৬

তোমাকেই ত আমি ডাকতে পারি আমার ভগবান বলে। তুমি হলে সনাতন বিশ্বা-
তীতের ব্যক্তিগত রূপ আর আমার ব্যক্তিগততার কারণ, উৎস, সদ্‌বস্তু। তুমি কত শত বৎসর
ধরে, কত সহস্র বৎসর ধরে, ধীরে সূক্ষ্মভাবে এই জড়বস্তুটিকে গড়ে তুলেছ যাতে এক দিন
সজ্ঞানে সে তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে, শুধু তুমিই হয়ে যেতে পারে; তুমি যে আমার
কাছে তোমার পূর্ণ সমুচ্ছল দিব্যরূপে আবির্ভূত হয়েছ—এই ব্যক্তি-সত্তা তার সমগ্র জটিলতা
নিয়ে, পরম ভক্তিভরে একটা চরম পূজার অর্ধাক্রমে তোমাকে আত্ম-নিবেদন করছে;
তার সর্বদ্বন্দ্বীণ আত্মতা হল তোমার সঙ্গে এক হওয়া, তুমিই হয়ে ওঠা, তুমিই হয়ে যাওয়া
চিরকালের জন্যে, চিরকালের জন্যে তোমার সদ্‌বস্তুর মধ্যে ডুবে যাওয়া। কিন্তু মে কি
তেরী এর জন্যে? তোমার কাছ সেখানে সম্পূর্ণ শেষ হল কি? এর মধ্যে নাই কোন ছায়া,
কোন অজ্ঞান, কোন গীমা? এবার তবে কি তুমি তাকে অধিকার করবে চিরস্থায়ীভাবে,
আর পরম পূর্ণতন রূপান্তর দিয়ে তাকে চিরকালের জন্যে অজ্ঞানের ভগ্নাৎ থেকে উদ্ধার করবে,
বাস কবাবে নিয়ে সত্যের জগতে?

বরঞ্চ হয়ত বা তুমিই হলে আমি—আমি যখন সকল ভ্রান্তি থেকে সকল গীমা থেকে
মুক্ত রিঙ। আমি কি এই সত্যাকার “আমি” হয়ে উঠেছি, অখণ্ডভাবে, সত্যের প্রতি অনু-
পরমাণুতে? তুমি আকাঙ্ক্ষিত রূপান্তর ঘটাবে কি আকস্মিক বজ্রপাতের মত? না তা হবে
আবার সেই মহন ক্রিয়া, একান্তির পর একটি করে প্রতিটি কোষকে তার রাত্রির অন্ধকার
থেকে, তার গীমাবদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে?

বিশৃঙ্খল এবং ব্যক্তিগত সে অনৈতিক দিব্যজীবন সংসাধিত হতে চলেছে কি তবে
এবার?

।নুয়ারী ২২, ১৯১৬

এই তুচ্ছ যন্ত্রটিকে তুমি পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছ—এখনো সে যথেষ্ট নির্দোষ হয়ে
গড়ে ওঠেনি, তার রূপান্তর তার সত্যান্তর সাধন তুমি শেষ করতে পারনি; তবুও তুমি কাজ

আরম্ভ করে দিয়েছ, আধারের প্রতি কোষে, মনে-পিণ্ডে, নরম করে, উজ্জ্বল করে তুলছ, সমস্ত আধারের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দেশ করে, সকলকে শূন্যনিত, সন্নিহিত করে চলেছ। সব সচন হয়ে উঠেছে, পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তোমার দিব্য ক্রিয়া অনুভব হয় যেন এক অবর্ণনীয় আঙনের প্রস্রাবণ, পরিপুষ্ট করে চলেছে, যাবতীয় পরমাণুর মধ্যে বয়ে চলেছে। এই প্রস্রাবণ আধারের মধ্যে এক তীব্র আনন্দ এনে দিয়েছে—পূর্বে অনুভূত যত আনন্দ তাদের সকলের চেয়ে অপরূপ এ আনন্দ। এই যে-বস্তুটি ধরে তুমি কাজ করে চলেছ, তার আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া এই ভাবে সাজা দিয়েছে। আর যন্ত্রটি যতখানি তার নিজের অক্ষমতা দেখতে পায়, তার আশ্চর্য্যও তত তীব্র হয়ে ওঠে।

ভগবান, তোমায় বিনতি করি—সেই পূণ্য-দিন নিকটে নিয়ে এস, তোমার দিব্য অবদান ঘটবে যখন, নিকটে নিয়ে এস সে-দিন যখন পৃথিবীর উপর হবে ভগবানের অধিষ্ঠান।

জানুয়ারী

১৯১৬

এই একান্ত শূন্য রূপের অস্বর্ভাব্য, হে ভগবান! তুমি দেখছ ত সে রূপ হল কেমন বড় সীমার সংগ্রহ নাত্র। এ সব সীমা তুমি ভেঙ্গে দেবে না, যাতে সে-রূপ তোমার আনন্দের অংশী হয়ে ওঠে? তুমি দেখছ ত কেমন আধারে পরিপূর্ণ সে—তোমার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্ধকার সব দূর করবে না, যাতে তোমার আলোর ভাগী হয় সে? তুমি দেখছ ত কেমন অজ্ঞান কালিনায় ভারাক্রান্ত সে—তোমার প্রেমের সর্ব্বভুক বহ্নিশিখায় সে-সব কালিনা কি পুড়িয়ে শেষ করবে না, যাতে সমগ্র আধারটি এক হয়ে যায় তোমার সঙ্গে পূর্ণ সজ্ঞানে?

দেখছ না, পৃথিবী এবং মানবজাতির পক্ষে অহংকৃত বিচ্ছিন্নতার এই অজ্ঞানময় বেদনা-ময় অভিজ্ঞতা যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে? বিশ্বের মধ্যে উভয়োগ কি উপস্থিত হয় নি যখন প্রগতির পথে বর্তমান ব্যবস্থাটির পরিবর্তে আসা উচিত আর একটি যাকে নিয়ন্ত্রিত করবে তোমার একমুখের বিপ্লব বৃহৎ চেতনা।

নিরবচ্ছিন্নভাবে, প্রতি নিমেষে আমার আহ্বান সবেগে উঠে চলে যার তোমার দিকে, ভেঁকে বলে তোমাকে “ভগবান, ভগবান। তোমার রাজ্য তুমি এসে অধিকার কর, তোমার চিরন্তন সান্নিধ্য দিয়ে তাকে উদ্ধার কর; তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন সে, এই যে নিষ্ঠুর ভুল ধারণা নিয়ে সে আছে তা শেষ করে দাও, কারণ তার যে সত্যময় সত্তা, তার যে সারবস্তু সে তুমিই।”

শেষ বাধা সব ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল—শেষ অশুদ্ধি সব নিঃশেষ পুড়িয়ে দাও, এ আধারটির উপর প্রয়োজন হলে হান বহু—ভাতে যদি সে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে!

ঋষি-দৃষ্টিতে মৃত্যু

ত্রিাশলিনীকান্ত ঙ্গ

লৌকিক-সংস্কার প্রাচীন ঐতিহ্য কবিকল্পনা মৃত্যুর একটা চিত্র ংকে দিয়েছে—
বলা বাহুল্য, তার বেশির ভাগই হল অসত্য বা সত্যভাগ বা কল্পনা মাত্র।

তবে ঋষিদৃষ্টিও আছে এবং তাতেই প্রতিফলিত হয় সত্যতথ্য। মৃত্যু সম্বন্ধে ঋষি-
দৃষ্টি কি দেখেছে আশ্রয় আমরা সে-কথাটি কিছু বলতে চাই। এরকম দিব্য-দর্শনের তিনটি
ধারা সর্বপ্রধান হিসাবে আমরা উল্লেখ করব। প্রধানটির নাম দিতে পারি গীতার ধারা,
যদিও গীতা অপেক্ষা তা বহুপ্রাচীন এবং গীতায় ধারার বাহিরেও বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত।
গীতার ধারা বলছি এই জন্য, গীতায় তার একটা অতি পরিকার রূপ, পরিচিহ্ন সূত্র ও বধ্যযথ
সংজ্ঞা পাই।

গীতা বলছে মৃত্যু একটি অতি সহজ সাধারণ ঘটনা মাত্র—এর মধ্যে ভীতির কিছু
নাই, অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যেরও কিছু নাই। জন্ম যেমন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, মৃত্যুও
ঠিক তেমনি। মৃত্যু হল বসন-পরিবর্তন মাত্র। বসন ছিনুজীর্ণ হলে যেমন আমরা ফেলে
দিই, দেহও তেমনি দুঃস্থ জীর্ণ হলে আমরা ফেলে দিই, তারই নাম মৃত্যু। নতুন বসন যেমন
আমরা পরিধান করি, তেমনি আবার নতুন দেহ গ্রহণ করি। মৃত্যুকে দেখতে হবে এই সহজ
দৃষ্টি দিয়ে—জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের চেয়ে তার মূল্য বেশি নাই। মানুষের অন্তরের চেতনায়,
তার নিবিড় সত্য একটা ধারাবাহিকতা, অচ্ছেদ্যতা, ঐক্য আছে—তাই আসল কথা—
খোলসটি থাকল আর গেল তার নিজস্ব মান-মর্যাদা নাই। শরীরকে এই রকম একান্ত
নগণ্যভাবে, উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখাই হল সত্যকার দর্শন, সত্যকার জ্ঞান।

এই হল মূল বা সার সত্য। তবে এর সঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে গীতা আরো দু'একটি আনু-
ষঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করেছে তা প্রশ্নবিধানযোগ্য। দেহ-ধারণ ও দেহপরিবর্তন অর্থাৎ
বস্ত্র পরিধান ও পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু তারও প্রয়োজন থাকে না, যখন হওয়া
যায় “জ্ঞান নির্মূত কল্মষ”—কালিমানস পাখির জীবনাধার যখন পরমজ্ঞানের আলোকে
ধুয়ে মুছে যায়। এ হল মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, অস্তিত্ব
সার্থকতা, ব্রহ্মনির্বাণের কথা। কিন্তু তার আগে মৃত্যুর দুটি প্রধান কার্যকারিতা নির্দেশ

করা হয়েছে। প্রথম, মৃত্যু অর্থাৎ দেহভাগ হ্রাস এ ভগৎ ছেড়ে অন্যান্য আবেগ ভগতে প্রবেশ করবার দৃশ্য—হতো বা প্রাপ্যপাশি স্বর্গঃ। স্বর্গ আছে, নরক বা নিরয়ও আছে—স্বর্গ নরকানি, নরকও রকমানি। প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে, কর্ত্ত্ব অনুসারে গো-সব লোকে যাওয়া যায় বা যেতে হয়, সেখানকার ভোগ অর্থাৎ উপলব্ধি অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়। পৃথিবীতে যে-রকম উপলব্ধি অভিজ্ঞতা হয়, এও তদনুরূপ, পাণ্ডব জীবনেরই এ হল ভ্রম—উপসংহার কিংবা উপক্রমণিকা। কারণ পাণ্ডব জীবন এ দিয়ে শেষ হতে পারে বা নতুন করে আবার শুরুও হতে পারে। এখানেই আছে মৃত্যুর আর একটা শক্তিমত্তা, কার্যকারিতা। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত মানুষের পক্ষে একটা বিশেষ ক্ষণ বা যোগ। এ সময়ে মানুষের চেতনা হয় যেন সংসৃত, সংহত, একাগ্র—সমস্ত অতীত এক বিন্দুতে এসে অভিনিবিষ্ট হয়। স্মৃতির তখন ভাগে যে মূল ভাব ও প্রেরণা তা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে ভাবী গতি ও নিয়তি—দেহাত্মের পরের গতি এবং পরজন্মের পরিস্থিতি পর্য্যন্ত। যং যং বাপি স্মরণভাবঃ তাদ্ভ্যন্তেষু কলৈববন্ (গীতা ৮। ৬)।

গীতার ধারা ছাড়া আছে বনোচ্ছি উপনিষদের ধারা। অবশ্য গীতার প্রধান তথ্যগুলি উপনিষদের মধ্যেও আছে—গীতার দর্শন ও দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত উপনিষদের দর্শন ও দৃষ্টির উপরেই। তবে উপনিষদের বেশিটা আছে দু'একটি বিষয়ে। প্রথমত, উপনিষদ মৃত্যুকে দেখেছে যেন ব্যক্তি হিসাবে, দেব-শক্তি হিসাবে। মৃত্যু একটা প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়, তা হল ঘটনা-অধিষ্ঠিত পুরুষ এক। মৃত্যুর আর এক নাম যমরাজ। গীতার মধ্যেও অবশ্য মৃত্যুকে দেখিয়েই বলা হয়েছে, “কালোহস্মি লোকক্ষয়ক্” কিন্তু তা হল মৃত্যুর বিশ্বব্যাপী বৃত্তি, শক্তি বা ঘটনা হিসাবে যতখানি, ব্যক্তি বা পুরুষ হিসাবে ততখানি নয়। উপনিষদে মৃত্যু কেবল সংহার-শক্তি নয়, তিনি আবার শিক্ষা-দাতা।

কুমার নচিকেতা গেলেন মৃত্যুলোকে, দেখা হল যমরাজার সঙ্গে। যমরাজ তাকে উত্তম অধিকারী দেখে তার প্রার্থনামত দিলেন এক বিদ্যা, যা একা তিনি জানেন—মৃত্যুদেব কি শেখালেন, তিনি কি শেখাতে পারেন? মৃত্যু ছাড়া আর কে জানতে পারে, বলতে পারে জীবনের রহস্য ও মূল্য—অমরত্ব ও অমৃতত্বের গুণত্ব? বন্ধা চাস্য ঋদৃগন্যো ন নভাঃ। কি সে জীবন, কি রকমে নভা সে জীবন মৃত্যু যাকে স্পর্শ করে না, মৃত্যুই যাকে জ্বিইয়ে রাখে—অটুট নিরবচ্ছিন্ন যার ধারাবাহিকতা, অনন্ত ও নিত্য যা?

মৃত্যু ভয় হতে পারে দূরকমে—মুখারায় অমর হওয়া সম্ভব। আমরা বলতে পারি একটি হল অমরতা আর একটি অমৃতত্ব—যদিও দুটিকে প্রায় এক করেই সর্বদা দেখা ও অনুভব উপলব্ধি করা হত। অমরতা হল কালে যে চিরন্তনতা, আর অমৃতত্ব হল কান্যোত্তের বাহিরে যে নিত্যতা। মৃত্যু নচিকেতাকে প্রথম দিলেন প্রথম বিদ্যাটি—এর নাম অগ্নি-

বিদ্যা—স্বর্গা অগ্নি বা “ব্রহ্মজ্ঞ” অগ্নির রহস্য। এ হল জীবের আন্তর অগ্নি, গুহ্যচিত্ত অর্থাৎ অন্তঃসঙ্গত চেতনার প্রোচ্চল শিখা। দেহ-প্রাণ-মন মানুষের এই যে ত্রিবং প্রকৃতি (নচিকেতা তিনটি অগ্নি বা তিনটি স্তরে অগ্নি চয়ন করেছিলেন বলা হয়েছে) এহ নাহ্য এদের অন্তরে রয়েছে মানুষের সত্যাকার বাষ্টি বা ব্যক্তিস্বরূপ, চৈত্যানুরূপ, অস্তঃপুরুষ, অস্তরাত্মা নৃত্যকালে এরই মধ্যে সংবৃত হয়ে যায় দেহ-প্রাণ-মনের সারাংশ এবং এই অস্তরাত্মাই বর্ধে থাকে, জন্ম হতে জন্মান্তরে গ্রহণ করে চলে, আপন চেতনাকে ক্রমেই উপচিহ্নিত সন্মুক্ত করে ধরে—যতদিন না তার ভাগবত স্বরূপে সাক্ষ্যপা সে লাভ করে। অগ্নিস্থূলিন্দ্র যেন ক্রমে জীবনের পর জীবনের অভিজ্ঞতা-ইচ্ছনে ক্রমেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—পরিণামে সূর্যাসন্ধান ভাগবত জ্যোতির অদ্বীভূত হয়ে যায়। এই যে অস্তঃপুরুষের প্রগতি তা চিরন্তন—সেখানে মৃত্যু নাই, কারণ এ হল চিরন্তন শাশ্বত কালজয়ী প্রবাহ। এরই নাম আমি দিয়েছি অনরতা ; এ অনরতা মৃত্যুরই অবদান—কারণ, এ হল মৃত্যুরই বিপরীত দিক। মৃত্যু যেন সারো দাঁড়িয়েছে—ছেদ কাটেনি। ত্রিকালব্যাপী জীবন এ—তিন স্তরে, তিনকালে অনিসর্বাণ চিন্ময় শিখা মানুষের দিবা অমর সত্তা। কিন্তু এই কালগত নিতাতা ব্যতিরেকে, তার উর্দ্ধে রয়েছে আর এক কৈবল্যময় নিরপেক্ষ নিতাতা। ব্যক্তিস্ব, ব্যাষ্টসত্তা তার বিবর্জনগত চৈত্যা বা অস্তঃপুরুষ “সূত্রাত্মা”কে অতিক্রম করে বিবর্জনের বা সৃষ্টির বাহিরে পরম-পুরুষের মধ্যে লাভ করেছে তার জীব-সত্তা। এ হল ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে ব্রহ্মনয়—একেই বলি অন্তর। এ শুধু মৃত্যুর উপর ভয় অর্থাৎ মৃত্যুর অধিপতি হয়ে মৃতশয় হওয়া নয় ; এ হল মৃত্যুকে, শুধু মৃত্যুকে কেন জন্ম-মৃত্যুকে, জীবনচক্রকে অতিক্রম করে গিয়ে আর এক লোকাভীত স্থিতি লাভ।

এই গেল উপনিষদ-জ্ঞান। এ ছাড়া মৃত্যুর আর এক রূপ আছে—যাকে বলব গুহ্যরূপ। মৃত্যুর রহস্য সঘর্ষে দেবতারও বিনুট হয়ে পড়েন, উপনিষদ বলছেন—মৃত্যু নিজে তার নিজের রহস্য ব্যক্ত না করলে, আর কে তা পারে ? তাই উপনিষদ মৃত্যুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন মৃত্যুর তথ্য। যা হোক, যে রহস্যের কথা উল্লেখ করলাম—অভ্যন্তর রহস্য, মৃত্যুর তৃতীয় রূপের কথা—তা গুহ্যবিদ্যার সাধকেরা অনুশীলন করে থাকবেন তবে তার পরিপূর্ণ বিবৃতি পাই আমরা শ্রীঅরবিন্দের “সাবিত্রী” মহাকাব্যে।

মৃত্যু মূলতঃ বা স্বরূপতঃ কি ? মৃত্যু হল অসদ্ব্রহ্ম—অসৎ অর্থাৎ নাস্তি—না বা নাই। এ অসৎ বা নাস্তি শুধু আবার একটা অভাব মাত্র নয়, বস্তুর অভাব, তা একটা বস্তুই। যে আদি সৎ সত্তা বা অস্তি হতে গড়ে উঠেছে এই সৃষ্টি, তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছে, বরাবর চলেছে একটা অসৎ, অসত্তা, নাস্তির ধারা। যা-কিছু রূপ পায়, তা চিরকাল থাকে না, তা কালে কালগত হয়, ধ্বংস পায়। শুধু তাই নয়, যে মুহূর্তে তুমি সে-কোন সদ্বস্তুরকে,

সত্যকে দেখ ও প্রতিষ্ঠা করতে চাও ভাণ্ডারে, ঠিক সেই মূর্ত্যুই তার গড়ে অপনিহার্য। সত্যের
হিমাবে এসে উপস্থিত হয় একটা বিরোধী শক্তি, সে চায় না, প্রতিপদে বাধা দেয়, অসত্য
বলে ঘোষণা করে, প্রমাণ করতে চায়। অনন্ত জ্যোতি গড়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত অন্ধকার
—পূর্ণ চেতনার অপব পিঠ হল পূর্ণ অচেতনা। জড় যে একটা স্থূল সত্তা বা সত্য নাত্র তা
নয়—জড় অর্থ নিশ্চেতনা, অজ্ঞান-ঘন—এবং এই নিশ্চেতনা বা অজ্ঞানের জের বহুদূর
অবধি চলে গিয়েছে সৃষ্টির উৎসেরই মধ্যে। অচিৎ, মায়া, মার, ময়তান, আদ্রিমান এই
সব নানা নামে ও রূপে বিবিধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিয়েছে সেই একই “না” বা
মহাশূন্য—মৃত্যু।

মানুষের—মানুষের বলি কেন, বিশ্ব প্রকৃতিরই—কোন প্রচেষ্টা পূর্ণ ফলবতী কোন
দিন যে হয় না, সবই এখানে রয়ে যায় অপূর্ণ অসমাপ্ত, মৃত্যু এসে নাথপথে যে একটা ছেদ
ফেনে দেয় তার হেতু সকলের পিছনে রয়েছে এই বুভুক্ষিত নাস্তিময়ী অবিদ্যা। শ্রীঅরবিন্দ
তার এই বর্ণনা ও ব্যাখ্যান দিয়েছেন

“একটা অসীমতা ছিল সেখানে—অনান্ত, রিক্ত, প্রকৃতি এক, শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার
করে যে। বিখ্যা আনন্দের দ্বার, নয়কারী কৈবল্যের নিত্যতা—অধ্যাত্ম সব-কিছুর বিশাল
নেতি। চিন্ময়লোকে ছিল যা-কিছু আত্ম-দীপ্ত, তারা প্রত্যেকে হয়ে উঠল আপন আপন
ছায়াচ্ছন্ন বৈপরীত্য। সম্ভবত চূর্ণ হয়ে মিলিয়ে গেল একটা লক্ষণ-হারা রিক্ততার মধ্যে
—তবু এ শূন্য আদি-বিন্দু ছিল লোকসমুদয়ের জনমিতা...অনামা শক্তি এক, তামস
সঙ্কলপ এক উঠে দাঁড়াল, বিপুলকার, আমাদের এ বিশ্বের পরধর্মী...বৃহৎ অনন্তি পরিগ্রহ
করলে রূপ এক, অচেতন অতলের সীমাহীন নিশ্চেতনা শাশ্বতকে শূন্য দিয়ে আবৃত করল...
সহস্র-সরল আলো-রেখার পথে এসে পড়ল ছায়া—ঘোর অপশক্তি এই ভাবে জন্ম নিল...
শাশ্বত বিশ্বনাতার মহাকায় অনুকরণ করে সে, জ্যোতির্গ্রয় অনন্তকে পরিহাস করে, রাত্রির
কোনে তার এক বিকৃত ছায়ামূর্তি ফেলে।” (সাবিত্রী ২।৮)

কিন্তু মানুষে বলছে আবার—ইহৈব তৈজিতঃ—এখানেই জয় হয়, এখানেই জয় করতে
হবে এই নিশ্চয়ি, এই নিত্যকার অপূর্ণতা, এই চিরন্তন নাস্তি। মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে কি
মৃত্যুর উর্ধ্বে উঠে যাওয়া যায় বটে—কিন্তু তার অর্থ মৃত্যুরই অধীন হওয়া, গভীরতর অর্থে
ও চেতনায়। মৃত্যু কেবল দেহপাত নয়—আসল মৃত্যু চেতনারও পাত বা নয়। সমাধি
মৃত্যুরই মহিমানম্য মূর্তি।

শ্রীঅরবিন্দ তাই “সাবিত্রী”তে দেখিয়েছেন নানবজীবনের সার্থকতা মৃত্যুকে জয়
করায়—তার অর্থ দেখে চিরজীবী হয়ে থাকা নয়, অথবা দেহাতিরিক্ত চেতনায় অনন্ত কালের
বা কালাতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়েও নয়, তা হল উর্ধ্বতম অসৎকে নিম্নতম অচেতনাকে ভেদ

করে দীর্ঘ করে, তার ভিতর থেকে পরম সম্ভবকে আবিষ্কার করা, পরমা চিন্ময়ীকে মূন্ময়ীর মধ্যে অনুসৃত করে একীভূত করে ধরা—

মৃত্যুর ও বেদনার নিয়তি খণ্ডন করে,

অজ্ঞানের সমস্ত নুহে দিয়ে,

প্রকৃতি মরতা থেকে মুক্ত হয়ে দাঁড়াবে,

পৃথিবীর অন্ধ শক্তি সব সঞ্জীবিত হবে চিন্ময়ের বহিঃস্কুনিদ্রে।

(“সাবিত্রী”)

মাদাম দাভিদ-নীল

গল্পটি বৌদ্ধ-ধর্মীদের সংক্রান্ত। অনেকের জানা থাকতেও পারে। আধুনিক গল্প, তবে গানগল্প নয়, বাঁচি সত্য। ওনেছি যার মূখে তাঁর নাম আলেকজান্দ্রা দাভিদ-নীল (Alexandra David-Neel)। তিনি বৌদ্ধধর্মী, প্রথম যুরোপীয়া মহিলা হিসাবে লামা প্রবেশ করে যশস্বিনী। তাঁর তিব্বত-যাত্রা কত বিপজ্জনক, কত রোমাঞ্চকর। এ-রকম যাত্রার এক ঘটনা-কাহিনী তিনি স্বমুখে বলেছিলেন আমাকে—আমি তারই পুনরাবৃত্তি করছি।

একদা তিনি একজন পণ্যাত্রীর সঙ্গে দু'টে তিব্বত যাচ্ছিলেন। ইন্দোচীনের দিক থেকে রাঙা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে তাঁরা সেই পথ নিয়েছিলেন। ইন্দোচীন দারুণ অরণ্যময়। সে-সব বনে আবার বাঘের আড্ডা। তাদের কেউ কেউ আবার হয়ে ওঠে মানুষ-পেকো। তখন লোকে তাদের নাম দেয় 'ইসিয় বাঘ' বা 'বাঘ মশায়'!

এমনি এক দিন পথচলার মাঝে সন্ধ্যা। পথ বনের মধ্যে। প্রাণ বাঁচাতে হলে সে-বন পার হতেই হবে। কিন্তু তখন মাদাম দাভিদ-নীলের ধ্যানের সময়। মাদাম রোজ, দিক একই সময়ে, ধ্যানে বসতেন। এর ব্যত্যয় ঘটিত না। ধ্যানের সময় উপস্থিত বলে তিনি সঙ্গীদের ডেকে বলতেন "আপনারা হাঁটতে থাকুন, আমি বসে একটু ধ্যান করে নিই, ধ্যান-শেষে আপনাদের ধরব গিয়ে। ততক্ষণ ভালো জায়গায় উঠে তাঁবু গাড়তে লেগে যাবেন।" একজন কুর্নী ভীষণ আপত্তি জানাল : "না, না, মাদাম, কক্ষণো না, অসম্ভব, তা হতেই পারে না।" সে অবশ্য বলছিল তার আপন মাতৃভাষায়। সে কথা বললান তার উদ্দেশ্য এই তথ্য জানানো যে মাদাম দাভিদ-নীল তিব্বতী বলতেন তিব্বতীদের মতোই। সে বলল, "বনে 'বাঘ মশাই' রয়েছেন, এই তাঁদের খাদ্য অনুঘর্ষণের সময়। আপনাকে আমরা ফেলে যেতে পারি না, আপনিও ওরকম বসে থেমে যেতে পারবেন না।" মাদাম অবশ্য বললেন তিনি নিরুপায়, নিরাপত্তার চেয়ে ধ্যান তাঁর কাছে বেশি জরুরী, অন্যরা চলে যেতে পারেন, তিনি একলাই থামবেন।

বেশ অনিচ্ছাসহেও ফিরে গেল সঙ্গীরা। এমন লোককে যুক্তি দেখানো বৃথা। একবার যখন তিনি একটা ঠিক করেছিলেন তখন কেউ আর তার নড়চড় করাতে পারবে না। তার। সত্যগতাই হাঁচি দিল। একটা গাছের তলায় স্বচ্ছন্দে বসে মাদানও ধ্যান শুরু করলেন। ঋণিকবন্ধন বাদে তাঁর কি রকম একটা অস্বস্তিকর জিনিসের উপস্থিতি বোধ হল। কি জিনিস দেখবার জন্য তিনি চোখ খুললেন...মাত্র তিন চার পা দূরে তিনি কি দেখলেন? বাঘ নশায়! জনহ্যাস্ত বাঘ নশায়—উল্লাসে উৎফুল্ল চোখ-জোড়া। খাঁটি বৌদ্ধধর্মীর মতো মাদান তখন সঙ্কল্প করলেন, “নির্বাণলাভের এই যদি আনার রাস্তা, তবে উত্তম—একেই আমি গ্রহণ করলাম। এই দেহত্যাগের পক্ষে অনুকূল নিষ্পেক্ষে যেমন তৈরী দরকার তেমনি করব, যে-মনোভাব দরকার তা-ই নিয়ে আসব অবশ্য।” তারপর নিশ্চল নিরুদ্ভাব তিনি ভবে গেলেন ধ্যানে—বেশ গভীর ধ্যান, বেশ প্রগাঢ় ধ্যান। পৃথিবীর মায়া মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যান তিনি—নির্বাণের দুয়ারে পৌঁছান একেবারে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘন্টা কেটে যায় এভাবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর না। তারপর ধ্যানভঙ্গের সময় হলে তিনি চোখ খুললেন। কোথায় বাঘ! বাঘ বেচারি এমন নিশ্চল দেহ দেখে তাকে আর খাদ্যের উপযুক্ত বিবেচনা করেনি। এক হায়না ছাড়া বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু মৃতদেহ খায় না, আক্রমণও করে না। এই দেহের নিশ্চলতা দেখেই—ধ্যানের গাঢ়তা বললাম না, যেহেতু বোধ করি ধ্যান সম্বন্ধে বাঘ কিছুমাত্র কৌতূহলী নয়—সে সরে পড়েছিল এবং মাদানও নিজেই ফিরে পেলেন একাকীই, বিপন্ন নুজ। তিনি পথ চলতে লাগলেন আবার, অল্পক্ষণের মধ্যে দলে পৌঁছালেন, বললেন, “এই তো এসে পড়লাম।”

এই আনার গল্প। এখন এস, মাদান দাতিদ-নীলের মতো ধ্যানে বসি—তবে নির্বাণে যাবার জন্য নিজেই তৈরী করতে হয়, আনাদের চেতনাকে আরো বড় আরো গাঢ় আরো গভীর করে তুলতে।

মাদাম তেয়ঁ

(ভ্রুংসেন)

মাদাম তেয়ঁ-র জন্মস্থান আইল অব ওয়াইট (Isle of Wight)। তাঁর স্বামী মাস্টার তেয়ঁ-র সঙ্গে তিনি থাকতেন ভ্রুংসেনে। মাস্টার তেয়ঁ অলৌকিক বিদ্যায় (Occultism) বহুদর্শী। ঐ একই বিদ্যায় মাদাম তেয়ঁ-র ক্ষমতাও কম ছিল না, তিনি সুকৃদর্শী, চমৎকার

মাধান বা 'মিডিয়ান' এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন। একেত্রে এক পূর্ণাঙ্গ ও শ্রমসাধ্য শিক্ষাও লাভ করেছিলেন তিনি। ফলে নিজেই ভিতরকে তিনি নিজের বাহিরে এনে দেখতে পারতেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এক সুক্ষ্মদেহ ধরে তিনি বেন হয়ে আসতে পারতেন স্থূল দেহটির মধ্যে থেকে। এ বকনে ক্রমে বেন হয়ে পারতেন একবার নয়, দু'বার নয়, পর পর আরো বার পূর্ণ জ্ঞান রেখে। তার অর্ধ সত্তার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে তিনি যেতেন সজ্ঞানে, আপন স্থূল দেহে যেমন সেখানেও তেমনি বাস করতে পারতেন, তারপর এই সুক্ষ্মদেহটিকেও সমাধিস্থ রেখে, সেখান থেকেও বেন হয়ে যেতে পারতেন, এরকমভাবে আরো বার নিজের ভিতর থেকে বেন হয়ে যেতে পারতেন—যতক্ষণ না শেষে রূপনয় জগতের অস্তিত্ব গীমানায় পৌঁছান যায়। সে-কথা বলব পরে—যখন আমার বক্তব্য বৃদ্ধিতে পারবে। এখন বলি কয়েকটি ছোট ঘটনা—তুমসেন-এ আমার স্বচক্ষে দেখা, আর তাঁর মুখ থেকে শোনা একটি গল্প।

ঘটনোত্তর স্থূল জগতের, তবে খুব চিত্তাকর্ষক। মাদান তেয় প্রায় সর্বদাই ধ্যানস্থ থাকতেন আর তাঁর শরীর এতখানি তনুয়িত ও স্তব্ধবস্থিত হয়েছিল যে যখন এই রকম ধ্যানের অবস্থায় থাকতেন অর্থাৎ যখন তাঁর দেহের এক বা একাধিক অংশ দেহ ছেড়ে বেন হয়ে আসত তখন তঁর শরীরটি তার নিজস্ব ভীষনী শক্তিতে চলত, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই চলতেন ফিরতেন এবং অনেক ছোটখাট কাজও করে যেতেন। তিনি কাজও করতেন অনেক। ধ্যানে তিনি কথা বলতেন অবাধে, বলতেন তখন তিনি যা দেখতে পেতেন। তাঁর সেসব কথা লিখে রাখা হত, পরে সেগুলি নিয়ে পুস্তকাকারে তাঁর শিক্ষাসাধনা প্রকাশিত হয়েছে। এ সব বাহ্য ও সুক্ষ্মজগতের কাজের দরুণ প্রায়শ তাঁর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তখন তার পুনরায় প্রাণশক্তিসঞ্চয় করতে হত—সূক্ষ্মভাবে নয়, একেবারে স্থূলভাবে দৃশ্যভাবে।

সেদিন তিনি বিশেষভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে বললেন, “দেখ, কি রকমে আমি পুনরুদ্ধার করি শক্তি।” তাঁর ছিল এক প্রকাণ্ড বাগান—বাগান না বলে চন্দ্রারী বললে চলে। কত বছরের পুরাতনো চন্দ্রপাই গাছ, ডুমুর গাছ। অমন আর কোথাও দেখিনি। সমস্ত ভূমি থেকে প্রসারিত হয়ে পাশাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত সে-বাগান। তাকিয়ে দেখবার মতন। বাগানে বহু লেবু, কমলা আর বাতাবিলেবুর গাছ। কমলালেবুর ফুলের চেয়েও বড় এবং বেশি স্তগন্ধি এই বাতাবিলেবুর ফুল। এ ফুল বেশ বড়। এর থেকে এক রকম আতর তৈরী করতেন মাদান তেয়—তার এক বোতল আমাকে উপহারও দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন ছিলেন শুয়ে—বিছানার উপর। গিয়ে দেখলাম ঠিক নাতিশ্বনের উপর প্রকাণ্ড একটি বাতাবি লেবু দু'হাতে ধরে রয়েছে। তিনি বিশ্রাম করছিলেন, তবে শ্বনের ঘোরে নয়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এক ঘণ্টা পরে আসবে।” এক ঘণ্টা পরে আমি গিয়ে দেখলাম বাতাবিলেবুটি হাতেগড়া রুটির মত চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে।

এমনভাবে প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারতেন না। যে ফলটির থেকে সম্পূর্ণ প্রাণরস আহরণ করে সেটিকে তুলতুলে নরম চ্যাপট করে ফেলতেন। এ আনার স্বচক্ষে দেখা। তখনরা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পার, তবে সফল হতে পারবে না।

*

*

*

আর একটা গল্প। যে আরো মজার ব্যাপার। তবে তার আগে ভেঁসেন-এর পরিচয় একটু দিতে চাই। তখনরা বোধহয় জানও না জায়গাটা। দক্ষিণ আনডেলিয়ায় সাহারা মরুভূমির পায়ে ছোট একটি শহর এটা। একটা উপত্যকার মধ্যে এই শহর—চারদিকে পাহাড়, খুব বড় নয়, তবে বেশ উঁচু। অতি উর্বর এই সবুজ অনুপম উপত্যকা।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই আনব, ধনী ব্যবসায়ী। আভকের কথা জানি না, তবে আমি বলছি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। ভেঁসেন-এ অনেক ধনী ব্যবসায়ী ছিল, এবং মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে আরবীরাও মাঝে তেঁয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। তারা ভানত না কিছুই গুটবিদ্যাব, বৃথতও না কিছু, তবে কৌতুহল তাদের অপরিণীত।

একদিন এরকম একজন এসে ঠাট্টাভরে প্রশ্রুবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। মাদাম তেঁয় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন “দাঁ ৷ও একটু মজা করা যাক।” ঘরের বারান্দায় ছিল মস্ত খাবার টেবিল—অতিকায় টেবিল, এদিকে চারটি ওদিকে চারটি করে তার আটটি পায়া। যেমন তার গভীর চেহারা, তেমনি তার ওজন। টেবিল থেকে একটু দূরে রাখা হয়েছে চেয়ারগুলি। এক প্রান্তে বসলেন তিনি, অন্য প্রান্তে মাদাম তেঁয়। মঁসিয় তেঁয় এবং আমি অন্য খালি স্থান অধিকার করলাম। আমরাই চারজন। টেবিলের খুব কাছে কেউ ছিল না, প্রত্যেকেই বেশ তফাতে। আগেই বলেছি ভদ্রলোক বিদ্রূপভরে প্রশ্রু কনছিলেন—অলৌকিক শক্তি অর্জন নিয়ে, ‘ম্যাজিক’-এর ক্ষমতা নিয়ে।...মাদাম আমার দিকে একবার তাকালেন। তবে তিনি কিছু বললেন না, একটু নড়লেনও না। হঠাৎ তখনাম এক আর্ন্ত ভয়ার্ত চিৎকার। টেবিলটা একটু নড়ে চড়ে, একপাশে উপবিষ্ট লোকটিকে এক দারুণ আঘাতে আক্রমণ করে। সে আঘাত যেন কাউকে এক প্রচণ্ড কনুইয়ের ঝাঁতো মারা। মাদাম তেঁয় টেবিলটি স্পর্শ করেননি, অন্য কেউও করেনি। তিনি টেবিলটির উপর নিজের বনঃসংযোগ করেছিলেন, নিজের প্রাণশক্তির বেগে তাকে সরিয়েছিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটি সেই যে চম্পট দিলেন, আর ফিরলেন না।

*

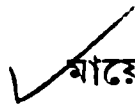
*

*

মাদাম তেঁয় স্থূল জিনিসকে নিলিয়ে শূন্য করে আবার তাকে স্থূল আকারে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। তবে তা কাউকে হাঁকডাক করে বলতেন না, তা দিয়ে অহনিকাভরে বলতেন না, “দেখ আমি কি করছি।” নিজে তিনি এ জিনিস করতেন নীরবে, কোনো গুরুত্ব

আরোপ না করে। তিনি জানতেন এসব জিনিস কেবল প্রমাণ দেয় একান্ত জড়শক্তি ছাড়া আর অন্য নানা শক্তির অস্তিত্ব।

মাদাম তেয়ঁ কুচিং বাইরে বেরুতেন। আগে বলেছি, তিনি প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকতেন এবং ঘরের ভিতরে থাকতেই পছন্দ করতেন। আমি রোজ বেড়াতে যেতাম। যেতাম আমার ঘরে তালচাষি দিয়ে—যাতে কেউ ঘরে না ঢুকতে পারে। কিন্তু ফিরে এসে রোজ বানিশের উপর দেখতাম ছোট্ট একটি ফুলের মালা। এ ফুল বাগানে ফুটত। তোমরা চেন এ ফুল—সঙ্কামালতি—ফোটে বিকেনে, অতি সুগন্ধি। মাদাম তেয়ঁর বাগানে এদের এক উঁচু বীধিকা ছিল। এই একই গাছে লাল, হলুদ, শাদা, দোরঙা নানারকম ফুল ফোটে। মাদাম তেয় এ ফুল রাখতেন আমার বানিশের উপর—কারণ বড় মিষ্টি গন্ধ এর। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গাছ থেকে এ ফুল তুলতেন তিনি। আমি যখন ফিরি এ ফুল ততক্ষণ আমার ঘরে চলে যায়। তিনি এ রহস্য কখনো বলেন নি, আমার ঘরেও তিনি ঢুকতেন না। একবার একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে, “তোমার ঘরে ফুল নেই?” আমি বলি, “হ্যাঁ, আছে তো!” কিন্তু ই পর্যন্ত। অবশ্য এ থেকে আমি বুঝলাম কে আমার ঘরে পাঠাত ফুল।



মায়ের সঙ্গে কথা

প্রস্তোত্তর

বিগ্ৰহস্কাণ্ড বলতে স্বয়ং ভগবানকেই বোঝায়, আর ভগবান বলতে বোঝায় মূলতঃ এক আনন্দচেতনাকে। আনন্দ থেকে এবং আনন্দের জন্যই সারা বিশ্বের সৃষ্টি কিন্তু সেই আনন্দের অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকতে পারে যতক্ষণ শ্রুতার সঙ্গে সৃষ্টির পরিপূর্ণ মিল থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ এট মিলনকে বলেছেন এক ধরনের পারস্পরিক তৃপ্তি বা দখলিকার। মূল দখলদার যিনি, অর্থাৎ যিনি শ্রুতা, তিনিও তাঁর সৃষ্টিকে দখল ক'রে যাচ্ছেন, আবার সেই সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিও তাঁকে দখল করে আছে। এট হলো মিলনের মূল সূত্র, আর এর থেকেই সকল আনন্দের উৎপত্তি। কিন্তু ওর মধ্যে ভেদ এসে গেলে যিনি শ্রুতা তিনিও তাঁর সৃষ্টির তেমন দখল পান না, আর সৃষ্টিও সেই শ্রুতার তেমন দখল পায় না, ফলে আগে যেখানে আনন্দ ছিল সেখানে তার বদলে এসে ভোটে অজ্ঞানতা। আনি তাকে অজ্ঞানতাই বলছি, নির্জ্ঞান বা জ্ঞানাতাব বলছি না। এ হলো সেই মূলগত মিল ও মিলন মধ্যস্থ অজ্ঞানতা, শ্রুতা ও সৃষ্টির অভেদই মধ্যস্থ অজ্ঞানতা, আর নির্জ্ঞানের অবস্থা হলো এই মৌলিক অজ্ঞানেরই এক পরিণাম এই অজ্ঞানই হলো সকল দুঃখের মূল। সৃষ্টি যখনই তার শ্রুতার সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেললে, তখন থেকেই অজ্ঞান সেখানে তার আধিপত্য শুরু করে দিলে, আর তার ফলেই এসে পড়ল যত কিছু দুঃখ দুর্ভোগ। আজ পর্যন্ত জগতে যিনিই আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনিই আপন অভিজ্ঞতার দ্বারা এ-কথা জেনেছেন এবং বলেছেন যে, যে-মুহূর্তে শ্রুতার সঙ্গে মিলন ঘটে সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর সমস্ত দুঃখ দুর্ভোগ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেবল এক সম্প্রদায়ের সাধক এবং ঋষিরা, আর বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ মতের সাধকেরা অন্যভাবে দেখলেন যে সৃষ্টির মূল কোনো আনন্দ নয়, অর্থাৎ সৃষ্টির বা জগৎ বিকাশের বা গভুতির হেতু আনন্দ নয়, সৃষ্টির মূল রহস্য হলো কামনা। অতএব গোড়াকার মিলনের যে অবস্থাটি ফিরে পেলে মূল অভিব্যক্তি ও গভুতির উৎসে গিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারবো আর সঙ্গে সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সে পথে তাঁরা গেলেন না। তার বদলে তাঁরা এই কথা বললেন যে পথ এবং লক্ষ্য দুইই হলো জন্ম এবং অস্তিত্বের সর্বৈব কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা, এবং সব-কিছুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এক অনস্তিত্বের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছানো। তাই নির্বাণই তাঁদের কাম্য।

এই ধরণের বিভাবনা কিন্তু খুবই দ্রুত। এই সাধনাতে মুক্তির যে উপায়গুলির সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও আত্মানুভূতির পক্ষে খুবই সহায়ক,—কিন্তু এই নির্দিষ্ট ধারণাটি, যে কামনার দ্বারা জগতের সৃষ্টিকার্য বজায় রয়েছে বলে এর আগাগোড়া সব-কিছুই নশ্ব, এমন নশ্বে ভরা জগৎ থেকে যত শীঘ্র যেমন ক'রেই হোক মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, এরই প্রভাব মানবজাতির ইতিহাসে সমস্ত অধ্যাত্ম জীবনকে খুবই বিকৃত ক'রে দিয়েছে। চরিত্র তখনকার দিনের অবস্থায় এমন বিভাবনার প্রয়োজন ছিল, কারণ জগতের ইতিহাসে প্রত্যেক জিনিসেরই কিছু না কিছু সার্থকতা রয়েছে; কিন্তু এখনকার দিনের পক্ষে এই নিয়ে আর কাজ চলবেনা। এখন এমন সময় এসেছে যখন একে অতিক্রম ক'রে আরো উচ্চতর এবং আরো মূলগত সত্যের দিকে ফিরে চাইতে হবে, সৃষ্টির আনন্দ-উৎসের চূড়ান্তস্থানে গিয়ে আনন্দের উঠতে হবে, দিব্য বিকাশ ও দিব্য মিলনের মূল গিয়ে পৌঁছাতে হবে।

এই নতুন ধরণের যে দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়াসভঙ্গী, নতুন অর্থাৎ পাণ্ডিত্য জীবনেরই চরিতার্থতার পক্ষে যা নতুন, তাই এখন আগেকার কালের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে প্রতিষ্ঠানান্ত করবে, আর মানুষকে তা নিয়ে যাবে এক নবতর উপলব্ধির দিকে, সেই হবে অতিমানস উপলব্ধি।

কেবল আনন্দ, বাঁটি দিব্য আনন্দই এনে দিতে পারে চূড়ান্ত বিজয়লাভ। কিন্তু অন্য-রকম আনন্দের সঙ্গে তার যেন গুণগোল করা না হয়। আমি বলছি যা দিব্য আনন্দ তারই কথা, যা তোমাদের সাধারণ ভ্রম বা সম্ভ্রমের একেবারে উল্টো জিনিস। সেই আনন্দের কথা জানতে হলে ঐ সব জিনিসকে একেবারেই ছাড়তে হবে। তবেই মিলবে সেই আসল পরমানন্দ, যা আসতে পারে কেবল মূল আনন্দেরই বিকাশ থেকে।

*

*

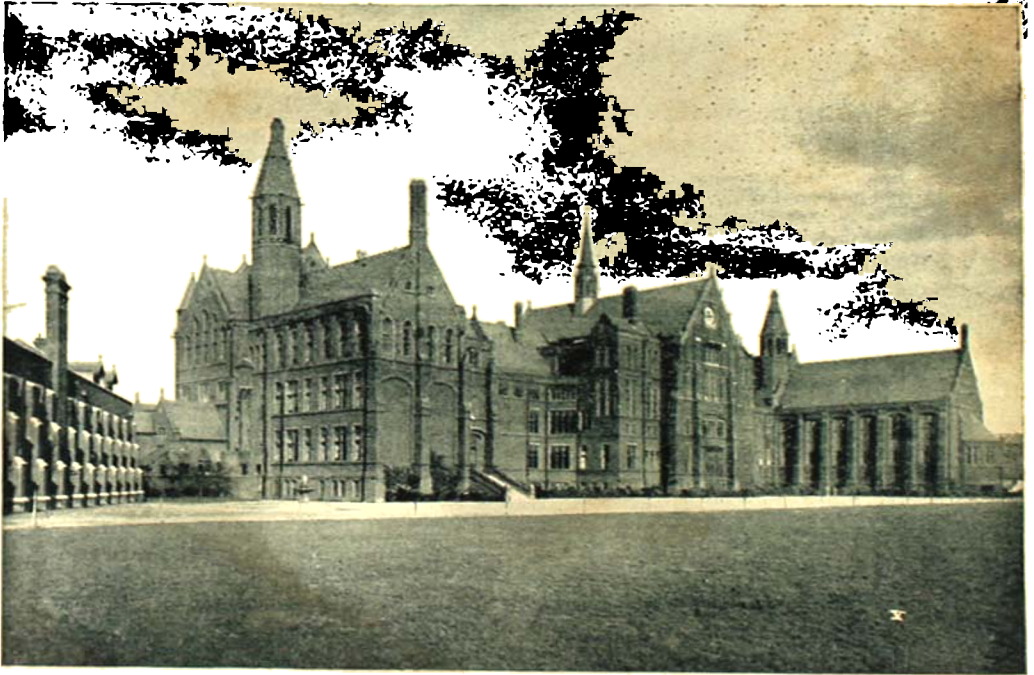
*

প্রশ্ন : নতুন যে দিব্যশক্তি পৃথিবীতে এখন সক্রিয় হয়েছে, তা কি এখনকার ব্যক্তি-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কাজ করবে, কিংবা তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে নিজের জোরে কাজ করবে?

উত্তর : তাই নিয়ে বিরোধ কিসের? শক্তি যখন কাজ করে তখন সে কোনো ব্যক্তি-প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না ক'রে আপনা থেকেই কাজ করে; কিন্তু তার ক্রিয়াতে মানুষের ব্যক্তিপ্রচেষ্টাও ওঠে জেগে, এবং শক্তিটি তখন তার সমুচিত সম্ভাবহার করতে থাকে। এ কথা মনে করাই ভাল যে ব্যক্তিপ্রচেষ্টার কর্তা হলো কোনো ব্যক্তি। তবু যদি কেউ মনে করে যে বিশ্বশক্তির যা করবার থাকে তা সে নিজেই করুক, আমি কেন ওর মধ্যে মাথা গলাতে যাই, আর এই অজুহাতে যদি সেখানে সে নিজের কোনো সমর্থন দিতে না চায়, তাহ'লে তার সেই শক্তিটির সঙ্গে কোনো আনুকূল্য এবং যোগাযোগ রইল না। অথচ বিশ্বশক্তি



বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহ



এই সেন্ট পল্‌স স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ পাঁচ বছর (১৮৮৪-৮৯) অধ্যয়ন করেছিলেন



শ্রী অরবিন্দ

স্বরত কংগ্রেসে (১৯০৭) লোকমান্য তিলকের পাশে উপবিষ্ট

এরূপ ভাবেই কাজ করে, সে আনাদের ব্যক্তিগতচেষ্টাকেই তার কাজে ভুড়ে দিতে চায়, সেই হয় তার এক অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্রস্বরূপ। বস্তুত তোমার যে ব্যক্তিগতচেষ্টা তার মধ্যে সেই শক্তিটিই এসে কাজ করছে, আসলে তা হলো সেই শক্তিরই একটা ব্যক্তিগত রূপান্তর মাত্র।

কিন্তু এই কথায় তোমার মধ্যে হয়তো দেখা দেবে প্রাণগত অহমিকার যত প্রতিক্রিয়া “ওহো, এমন কথা! আমি খেতেবুটে যা কিছু করলাম তা নাকি আমার করা নয়, আমার ইচ্ছাতে কোনো কিছু হয় না, কোনো কাজটা আমার শক্তি করে না! তাই যদি হয়, তাহ'লে আমি নিজে আর নাইবা এত কিছু চেষ্টা করতে গেনাম, এমনি চুপচাপ বসেই থাকি।” তার মনেটা এই ঠাঁড়াচ্ছে যে, “চেষ্টার জন্য স্বেচ্ছাতি যদি আমার নিজের প্রাপ্য না হয়; তাহ'লে কেন আমি অত কষ্ট করতে যাবো?” এই প্রতিক্রিয়াটি লোকের মনের মধ্যে প্রায়ই হতে দেখা যায়, এটি নিজেদের ক্ষুদ্র অহমিকার অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর বদলে সত্যিকার প্রতিক্রিয়া যা হওয়া উচিত তা হলো, পরম আনন্দে সেই শক্তির সঙ্গে নিশে যথাসাধ্য আনুকূল্য করতে থাকা, সেই শক্তি যে খেলাটি খেলতে চাইছে তাতে আপন চেতনার সমস্ত উৎসাহ ও সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ ক'রে সর্বাঙ্গতঃকরণে যোগদান করা। এই ভাবে সেই শক্তির কর্মধারার অনুকূলে চলতে শুরু করলে তখনই তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার কাজে উপর থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছে, তোমার চেয়ে অনন্তগুণে বৃহৎ কোনো শক্তি তোমাকে সেই কাজে প্রেরণা যোগাচ্ছে আর তাব ক্রিয়া একেবারে অসামান্য, সে তোমাকে ব্যবহার করছে এক দানী যন্ত্রের মত, সেই তোমাকে প্রয়োজনমত ক্ষমতাও দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে প্রয়োজনমত আশ্রয় দিয়েও তোমাকে রক্ষা করছে। তুমি স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে তোমার সমস্ত কাজগুলি তাই নিরাপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তোমার ভুল ভ্রান্তি আর কিছুই হচ্ছে না, কারণ তোমার মধ্যে তখন যা কাজ করছে সে হলো এক চূড়ান্ত প্রজ্ঞা তাই, যা কিছুই তুমি করতে যাবে সমস্তই সফল হতে থাকবে উত্তম কৃতকার্যতার সঙ্গে পরম আনন্দের সঙ্গে।

এই হলো সত্য কর্মপদ্ধতি; তুমি এতে জানতে পারবে যে তুমি যেটা ইচ্ছা করছ তা প্রকৃতপক্ষে তোমার মতো একজন ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ব্যক্তির ক্ষুদ্র ইচ্ছা নয়, তা হলো এক অনন্ত বিগুণশক্তির ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই কাজ করছে তোমার মধ্যে এসে। এতে তোমার ইচ্ছাটির দান সহগ্রন্থও বেড়ে যাবে কারণ যে শক্তি তোমাকে অমন ইচ্ছা করাচ্ছে তা হলো মূল সত্যেরই শক্তি।

প্রশ্ন। নিজেদের মধ্যে কোনো বিপরীত বস্তুবাদের মনোক্রিয়া হতে থাকলে কেমন ক'রে তাকে তাড়ানো যায় ?

উত্তর। আগে চেতন হতে শোষণ, উদ্ভবোদ্ভব আরো সচেতন হতে থাকে। লক্ষ্য রেখে দেখে যে কেমন ক'রে সেই মন ক্রিয়াটি হচ্ছে, বিপরীত আসছে ঠিক কোন দিক থেকে, আর তার আসার পথের মাঝখানে এমন ভাবে ঘাঁটি আগলে দাঁড়াও যাতে সে কোনোরূপে তার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। নিজের কোনো দোষকে যদি শোধরাতে চাও, কিংবা কোনো মন ছিনিয়ে আনতে যদি চেষ্টা করে চাও, তাহ'লে তার একমাত্র উপায় আছে সর্বদা সচেতন ভাবে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে থাকা।

প্রথম কথা, তোমার নিজের গন্তব্য বা চরম লক্ষ্য কোথায় মোটা আগে সুস্পষ্টভাবে ছেনে রাখা দরকার। কিন্তু সে কথা জানতে মনের উপর নির্ভর করবে না, কারণ তুমি নিজেকে দেখতে পাবে যে মন তোমার চক্ৰ, তার বজ্রবা অনবরতই বদলাচ্ছে। যেমনি তুমি একটা কিছু স্থির ক'রে বসাবে, অমনি দেখবে যে মনটি তার বিরুদ্ধে কতরকম যুক্তি এনে হাঙ্গির করছে, তোমার মধ্যে কত কিছু সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে; আর তুমি তখন দোচানায় পড়ে ক্রমাগতই ইতস্তত করতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কোনো নীমাংসায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। অতএব উচিত হলো প্রথম থেকেই নিশ্চিতভাবে ছেনে রাখা যে কী তুমি চাও কিন্তু মন দিয়ে জ্ঞান নয়, গভীরতম ধ্যান দিয়ে জ্ঞান, পূর্ণ চেতনার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আপন আত্মপূহা দিয়ে জ্ঞান। এইটি আসলে খুবই দরকারী কথা।

অতঃপর ধীরে ধীরে ক্রমশ আপন পর্যবেক্ষণের দ্বারা, নিত্যকার আপন সজাগ অনু-বোধের দ্বারা তুমি এমন একটি পথ আবিষ্কার করে নেবে যা নিতান্তই তোমার নিজস্ব, অর্থাৎ যা কেবল তোমার নিজের বেলান্তেই ঠিক স্থাপ খেয়ে যায়। প্রত্যেকেই আপন আপন পদ্ধতি বেছে নেবে, আর যতই তাকে তুমি বাস্তবের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে ততই তা তোমার কাছে আরো বেশি বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠবে। তার কোনো একটি দুর্বল অংশকে যেমনি শুধরে নিতে থাকবে অমনি আরো একটি নতুন কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে। কিছুকাল এই ভাবেই তুমি বেশ অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে।

তার পর কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখবে যে তোমার সামনে এসে পড়েছে এক বিরাট বাধা, তাকে কোনোরূপেই অতিক্রম করা যাচ্ছে না। তখন তুমি হতাশ হয়ে ভাবতে শুরু করবে যে, এ পর্যন্ত যা-কিছুই ক'রে এসেছিলে সবই বৃথা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবিক তা কিছুই নয়; যখনই অমন এক দুর্ভেদ্য দেয়াল দেখবে সামনে, তখনই জানবে যে এবার নতুন কিছু আসছে। তুমি বরং আরো জোর ক'রে দুর্দমনীয় অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে তোমার নিজের

পদ্ম অনুসরণ করবে, তাতেই একসময় দেখবে যে সেই মেয়ানটি পার হয়ে তুমি ওপারে চলে গেছ। আর তার পরে তুমি তখন এক নতুনতর চেতনা পাবে, নতুনতর শক্তি পাবে, নতুন রকমের রাস্তা দেখতে পাবে যাকে অনুসরণ ক'রে আরো বেশি অগ্রসর হতে পারবে।

এমনি বারবারেই হতে থাকবে, আর এইভাবে চলতে চলতে কিছুকাল পরে ওটি তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর কোনো কিছুতেই হতাশ হয়ে ছান ছেড়ে দেবে না, প্রত্যেক বারই তোমার একাগ্রতা ও আত্মসম্মতির নাম্বা আরো বেড়ে যেতে থাকবে; আর নতুন যে সাহায্য তখন আসবে তাকে তুমি আত্মার সঙ্গে গ্রহণ করবে, আশেপাশের যে পন্থায় চলছিলে তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে আরো উৎকৃষ্টতর পন্থা আবিষ্কার করবে।

ধাপের পর ধাপ এইভাবে তুমি এগিয়ে চলবে। কিন্তু প্রতি ধাপেই পূর্ব নবোন্মেষের সঙ্গে উপনয়ন করা চাই যে সেই অবস্থার মধ্য থেকে তুমি কি পেলি আর কি শিখলে। প্রতি ধাপের সেই সব অভ্যন্তরীণ উত্তীর্ণতিকে যদি বাস্তবের ক্ষেত্রে ও না ব্যবহার করো, তাহ'লে কিছুকাল পরে এমন সময় আসবে যখন তোমার আর এগিয়ে চলা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে তোমার যে বাহ্য সত্তাটি অপরিবর্তিত অবস্থাতে রয়ে গেছে সেই তোমাকে তখন শিকন দিয়ে আটকে রাখবে, এগোতে না দিয়ে সে তোমাকে পিছনের দিকে টানতে থাকবে।

তাহ'লে এই হলো এক মস্ত জরুরী কথা যতটুকু যখন জানলে তাকেই কাজে লাগাও, আর এই ভাবে চললে শেষ পর্যন্ত তোমার নিশ্চিত সাফল্য মিলবে। বাধা বিপত্তিগুলো আর মন্দ জিনিসগুলো পুনঃ পুনঃ আসতেই থাকবে। কেবল যখন শেষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছ তখনই সব কিছু বিপত্তি এককালে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : জীবনে অনেক রকমের ছোটোখাটো জিনিসও তো রয়েছে, যেমন কোনো একটা কাজ কিংবা খেলা—সেগুলির বেলাতেও কত বাধাবিপত্তি এসে জ্বাটে—তাতে কি তারও গুরুত্বমূল্য বেড়ে যায়? তাতে কোনরকম বোঝাবে যে, বাধা পেলি আনাদের সেদিক দিয়ে আর চেষ্টা না করাই ভালো, অথবা বোঝাবে যে বাধা সবেও আরো বেশি অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই চেষ্টা করতে থাকা দরকার, যেহেতু ওর দ্বারাই আনাদের অগ্রগতি ও সাফল্যের স্বযোগ দেওয়া হচ্ছে?

উত্তর : যদি তুমি যোগের পদ্ধতিতে চলো, তাহ'লে কোনো একটি কাজ শুরু করার আগে তোমাকে ভেবে দেখতে হবে যে তোমার মধ্যে যে প্রেরণাটি আসছে তা ঠাঁটি জিনিস কিনা, অর্থাৎ উপর থেকে তা আসছে কিনা, অথবা কোনো বাহ্য ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে তোমার

নিজেরই প্রাণের বা মনের মধ্যে সেই ঝাঁকটা আসছে। এটুকু জানা খুবই দরকার, তাঁকে দৃষ্টি নিয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সঙ্গে এটি তোমার ভালো ক'রে বোঝা চাই।

কিন্তু আগের থেকে এত কিছু না ভেবে লোকে অনেক কাজই ক'রে থাকে; ঘটনাচক্র যখন যেমন এসে পড়ে তারই অনুগামী হয়ে অনেক সময় চলতে হয়। এমনি যে সব কাজ দৈনন্দিন জীবনে মানুষ প্রায়ই ক'রে থাকে, তার নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু যেমন ধরনের মনোভাব নিয়ে সেগুলি তুমি ক'রে যাচ্ছেছ তারই যত কিছু গুরুত্ব। একটা কিছু কাজ যখন মাননে তোমার এসে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে সেটি তোমাকে করতেই হলো, বাহ্য জীবনে বাস করতে হলে এমন অনেক কিছুই করবার দরকার হয়। যদি সে কাছের ফনাফল তোমার জীবনের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে তাহ'লে তার একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে বৈকি : যেমন মনে করো বিবাহ করা, কিংবা এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে বসবাস করা, কিংবা কোনো একটা নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বন করা। এই সব ব্যাপারকে লোকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করে, আন কতক পরিমাণে সে কথা ঠিকই। কিন্তু যোগের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ কাজগুলির নিজস্ব গুরুত্বের চেয়ে সেই কাজ সম্পর্কে তোমার ভিতরকার মনোভাবের গুরুত্বটাই অনেক বেশি। তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে অন্য যে সব ছোটোখাটো কাজ গিটাই করা হয় তার গুরুত্ব প্রায় কিছুই নেই, এ জানা কথা।

তবে এমন অনেক নৃতন্ত্রে প্রকৃতির মানুষ থাকে যারা সব-কিছুতে কেবল সমস্যারই সৃষ্টি করে অথচ নীমাংসায় কোনোমতে আসতে পারে না, সেগুলিকে আরো উৎকর্ষ রকমে ভাটল ক'রে তোলে। এক খিওসফিষ্টে ভরুণী সাধিকার কথা আনি জানি, তিনি একদিন আমাকে ভিজ্ঞাসা করেছিলেন “আমরা তো এইরকমই শিক্ষা পেয়েছি যে যা-কিছুই আমরা করতে গারো তার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছার প্রেরণা রয়েছে কিনা তা দেখা দরকার; কিন্তু মনে করো, সকালে উঠে যখন প্রাতরাশ খেতে বসেছি, তখন কফির পেয়ানাতে দুই চামচ চিনি দেবো না তিন চামচ দেবো, কোনটা ভগবান ঠিক পছন্দ করছেন, সে কথা আমি কেমন ক'রে জানবো?” মহা মুশকিলের কথা; আনি অনেক কষ্টে তাকে বোঝাই যে কয় চামচ চিনি দিতে হবে তার বিচারটাই এখানে বড়ো কথা নয়, তুমি কেমন মনোভাব নিয়ে সেই কফি পান করবে, কেমন চেতনার সঙ্গে খাদ্যগুলি খেতে বসেছ, তাই হলো বড়ো কথা।

প্রতি মুহূর্তে যে-সব ছোটোখাটো জিনিস তোমরা ক'রে থাকো তাও অনেকটা এই রকমেরই ব্যাপার। কিন্তু ভগবৎ-চেতনা আমাদের মানুষের মতো ধারায় কাজ করে না, কফির পেয়ানাতে কয় চামচ চিনি দেওয়া দরকার তাই নিয়ে সে মাথা ঘানায় না। সে চায় যাতে ক্রমশ তোমার মধ্যে সত্য ও গঠিক মনোভাবটি জেগে ওঠে, যাতে তোমার মধ্যে নমনীয়তা ও আনন্দানের ভাবটি এসে পড়ে, যাতে তোমার আত্মহা ও সদিচ্ছা বাড়তে থাকে, ক্রমো-

নৃত্তির দিকে যাতে চেঁচা ছাগে। প্রতি মুহূর্তের ডোঁটোখাট ব্যাপারে কোনটি করবে আর কোনটি না-করবে সে বিচারের অপেক্ষা ঐগুলোই হলো আসল কথা।

প্রতিটি কাজ করবার আগে বুঝে দেখতে চেঁচা করবে যে সমুচিত জিনিস কি হবে ; কিন্তু তোমার মনের বিচার বা মনের সমস্যা ধরে সে কথা বোঝা যাবে না। কেবল ভিতরে যখন এমন এক আভ্যন্তরীণ বোধ ও সঙ্গতির চেতনা এনে ফেলতে পারবে যাতে আপনা থেকে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল ক্রিয়াটি সহজে ধরে নিতে পারবে, তখন তাই হবে ঠাঁটি জিনিস।

সেই আদর্শ মনোভাবটি আসবে সমগ্রতার দিক দিয়ে, আর তার কাজও হবে স্বতঃস্ফূর্ত, যেন বাইরের কোনো কার্য-কারণ অনুযায়ী তা হচ্ছে না, হচ্ছে আর একটা কিছু স্বতন্ত্র রকমের নির্দেশ অনুযায়ী। অবশ্য সেই আদর্শ অবস্থাটি লাভ করবার জন্য তোমায় রীতিমত আত্মপূহা করতে হবে, কিন্তু সে আত্মপূহা যে একেবারেই সফল হবে এমন কথা নয় ; তার জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার। যতকণ পর্যন্ত উপযুক্ত সময়টি না আসছে ততকণ পর্যন্ত অনবরত সতর্কতার সঙ্গে চেঁচায় লেগে থাকা চাই যাতে সমুচিত মনোভাবটি এসে যায় আর যাতে সত্য প্রেরণাটি তুমি পেতে পারো। নতুবা ব্যায়ামের একটা কসরও তুমি করবে কি না, কোনো একটা বিভাগের শিক্ষা তুমি গ্রহণ করবে কি না, তাই নিয়ে বিচার করতে যাওয়াই খুব দরকারী কথা নয়। আসল দরকারী কথা হলো অদম্য আত্মপূহা নিয়ে আপন অগ্রগতি বজায় রাখা, ক্রোনোতির দিকে জীবন্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে রাখা।

সাধারণ নিয়ম হলো এই যে, তোমার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে যে কাজই তুমি করতে শুরু করো তা হাজার বাধাবিপত্তি এলেও অটুট অধ্যবসায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক'রে যাওয়া চাই, যদি নিতান্ত এমন কিছু অপরিহার্য বিঘ্ন না এসে পড়ে যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে-কাজ তোমার পক্ষে করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু অতটা পর্যন্ত বিঘ্ন খুব কমই হয়। সাধারণত সকল কাজই আপন আপন ধারা অনুসরণ ক'রে চলে, তার পর যখন সে কাজ শেষ হয়ে যায়—সমাপ্তির দ্বারাই হোক বা কান্যা পরিণতির দ্বারাই হোক—তখন বুঝতে পারা যায় যে বাধাবিপত্তিগুলি কেন এসেছিল। বাধাই হোক, বা বৈগুণ্যই হোক, বা আনুকূল্যই হোক, এগুলিকে কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত মনে ক'রে তুমি চলবে না, কারণ তার বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন রকমের তাৎপর্য থাকতে পারে যা তুমি জানো না, সেই সব বাইরের ঘটনার প্রতিকূলতার অজুহাতে তোমার আরক কাজটির ভালোমন্দ বিচার করতে কখনই যাবে না।

যে কাজে তুমি খুব একাগ্রতার সঙ্গে মনঃসংযোগ ক'রে লেগে গেছ, তার ভালমন্দ মূল্য সম্বন্ধে বোঝবার মতো কিছু আভাস হয়তো কোনো আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রি়ের সাহায্যে তুমি পেতে পারো। যদি সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সে কাজটি শুরু ক'রে থাকো, অর্থাৎ তোমার চেতন

সত্যের সমগ্র অংশ দিয়ে যথেষ্ট ইকান্তিকতার সঙ্গে যেটি যথাসাধ্য ভালোভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ভালো মন নিয়ে তাতে লেগে থাকো, কিন্তু কোনো কারণে যদি তা তোমার পক্ষে অনতিশ্রুত জিনিস হয়,—তাহ'লে তখনই তোমার নানির ভিতরকার স্নায়ুকেস্ত্রে এক রকমের অহেতুক অস্বস্তি বোধ হতে থাকবে,—যদিও তা প্রবল হয়ে উঠবে না, কিংবা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমেও তা দেখা দেবে না, কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখলেই সে জিনিস তুমি টের পেয়ে যাবে, মনে হবে তা যেন একটা বিষুবতার মতো, একটা নিরুৎসাহের মতো। এমন কি মনে হতে পারে যে ভিতর থেকে ভেমন কোনো সহযোগিতার সাড়া মিলছে না; কিন্তু তা ঐ পর্যন্ত, তার মধ্যে কোনো জোর নেই, কোনো জিৎ নেই, কোনো স্পষ্ট প্রতিকূলতা নেই, কোনো বাধার চিন্তনানিও নেই; সামান্যই খানিক অস্বস্তি হতে থাকে মাত্র। যদি ঐ ভাবটিকে তুমি অগ্রাহ্য ক'রে উড়িয়ে দাও, তাহ'লে তোমার ভুল কাজটি অগ্রসর হতে থাকার সঙ্গে ওটিও যে বেড়ে চলবে তা নয়, বরং ক্রমে ক্রমে ঐ ভাবটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, ঐ অস্বস্তির চেতনা তখন চাপা পড়ে যাবে। ঐ সামান্য একটু ইঙ্গিতকে অব্যস্ত নির্দেশ মনে করা চলেনা, কারণ ওকে ত্যাগিত্য করলেই ওটি আপনা থেকে মিলিয়ে যায়। কিন্তু ওটিকে যদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বলে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করো, তাহ'লে ঐ সামান্য একটু ইঙ্গিতই তোমার পক্ষে এক বহুলা নির্দেশের স্বরূপ কাজ করবে।

আম যদি ঐরূপ কোনো অস্বস্তির লক্ষণ তোমার মধ্যে না আসে, তাহলে যে কাজটি তুমি আরম্ভ করেছ তা নিবিবাদে শেষ পর্যন্তই তোমার ক'রে যাওয়া উচিত, তাতে অন্তত ঐ বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতাটিও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। কেবল আগে যে কথা বলেছি তাই আবার বলছি, যদি সেই কাজটি সম্পর্কে তুমি অপরিহার্য রকমের কিছু বিপরীত নির্দেশ পাও, যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেই কাজটি করা তোমার পক্ষে কোনে:মতে উচিত হচ্ছে না, তাহলে তখন সে কথা হবে স্বতন্ত্র।

★

★

প্রশ্ন : যে জিনিস আমার পাওয়া খুব দরকার তা ভগবানের কাছ থেকে পাবার উপায় কি ?

উত্তর তোমার ঐ দরকার কথাটির অর্থ কি হবে ? হয়তো ভগবানকে আশ্রয় ক'রে তুমি বললে “আমার এমন আত্মীয় বন্ধুর দরকার, এমন ভালোবাসা পাওয়া দরকার, এমন জ্ঞান-জ্যোতি পাওয়া দরকার, এমন সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার।” যাই তুমি বলো, তা কি তোমার সত্যিকার দরকার ? না তেমনি তোমার মনের একটা ধারণা, একটু কামনা, তোমার অজ্ঞান মনের ক্রিয়াতে তাই বলছ সে সৎকে নিজে তুমি কিছুই জানো না।

শুধু তাই নয়, সত্যই দরকার কিনা তা নিজে কখনো পরীক্ষা করেও দেখনি। এমনই

তোমার মনে একটা বিশ্বাস হচ্ছে যে অনুক জিনিসটা আমার পাওয়া দরকার, তাই সেটা আমার ইচ্ছা জাগছে, তাই তুমি বলছ যে ভগবান আমার এই ইচ্ছাটিকে পূরণ ক'বে দিবে,—অধিকাংশ স্থলে হয়তো ভগবানের কাছে তার জন্য কোনো প্রার্থনাও জানাওনি—অথচ তুমি চাইছ যে তোমার আশেপাশের পরিস্থিতির ভিতর থেকে কোনো বাহ্য বিপর্যয় এনে ফেলে ভগবান তোমার সেই চাহিদাটিকে নিটিয়ে দিবে।

তার পরে আরো এখানে প্রশ্ন রয়েছে, যে ভগবানের কাছে তুমি চাইছ, তাঁর সঙ্গে আজ পর্যন্ত নিজের কোনো কি একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছে? তাঁর সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি কখনো? বাস্তবিক অর্থাৎ মনোভাব নিয়ে তাঁর দিকে একবারও কি ফিরেও কখনো চেয়েছ? কোনোটাই তুমি করোনি।

অথচ তোমার যা ভূমিকা ছিল তাই তুমি উন্টে দিতে চাইছ। কথা ছিল যে ভগবানের যা ইচ্ছা হবে তাই তুমি এখানে মেনে চলবে, কিন্তু তার বদলে তুমি চাইছ যে তোমার যা ইচ্ছা হবে ভগবান তাই মেনে চলুন। সেই কারণেই তাঁকে তুমি বলতে পারছ, “আমার অনুক জিনিসটা দরকার”। তিনি তাই দেওয়া দরকার মনে করছেন কিনা, সে বিষয়ে একবারও কিছু জ্ঞানতে চাও না; কেবল নিজের দিকে থেকেই বলছ, “আমার ওটা দরকার অতএব আমার ওটা পাওয়াই চাই, আমার তা পাবার অধিকার রয়েছে, ভগবানের এখন উচিত হচ্ছে কোনোগতিকে ওটা আমাকে পাইয়ে দেওয়া, তাই যদি না পারলেন তাহ'লে আর তিনি ভগবান হলেন কেন ক'রে!”

কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান, সেই হেতু অস্তিত্ব তোমার চেয়ে তিনি একটু বেশিরাঃ বোঝেন, তোমার পক্ষে যথার্থই কতটা কি দরকার সে কথা তোমা অপেক্ষা তিনি ভালো করেই জানেন। সেইরকম জিনিসই তোমাকে তিনি পাইয়ে দিচ্ছেন ও দেবেন।

তবুও যদি তোমার ইচ্ছাকে জোর ক'রে তাঁর সম্বন্ধে চাপাতে থাকো, তাহ'লে হয়তো তোমার ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি সে ইচ্ছাও পূরণ ক'রে দিতে পারেন, যাতে তুমি নিজের থেকেই বুঝতে পারো যে সত্য প্রয়োজনের দিক থেকে সে জিনিস বাস্তবিক তোমার দরকার ছিল না। কাজেই তখন তাতে ভালোর বদলে মন্দ ফলই হতে দেখবে, আর অমনি তোমার নতুন রকম নালিশ শুরু হবে : “হায় হায়, ভগবান, আমাকে এমন দুঃখটা দিলে কেন?” তখন তুমি একদম ভুলে বসে থাকবে যে ঐ জিনিস তুমি নিজেরই চেয়েছিলে। আবার ভগবান যদি তোমার সেই কামনাটি পূরণ না করেন, তাতেও দোষ হবে, তখন তুমি এই বলে নালিশ করতে থাকবে : “এ কি অবিচার, যা আমি এত করে চাইছি, যা আমার নিতান্তই দরকার, তা কেনই বা আমি পাবো না?” কাজেই ভগবান যা-কিছুই করুন, নালিশ তোমার ঘূচবে না, সব-কিছুতেই নালিশ চলতে থাকবে।

কিন্তু ঐ দরপেন দরকারের জিনিস চাওয়ার বদলে যদি এই একান্ত আশ্পৃহা নিয়ে থাকে যে, আগে আপন সত্তার যা সত্য বস্তু এবং যা সত্য প্রয়োগজন তাই তুমি গুঁজে বের করবে, যা সকল জিনিসের মূল, যা সর্বোত্তম নীমাংসা, যা সকল প্রণেত্র উদ্ভব, যা সকল সমস্যার সমাধান, তাই তোমার চাই যদি সেই চূড়ান্ত আশ্পৃহার পূরণের জন্য তোমার মনে অকপট ও তীব্র ব্যাকুলতা জাগে, তাহলে আর তুমি ভগবানের কাছে অমন প্রার্থনা জানাতে যাবে না “আমাকে এটা দাও কিংবা এটা দাও, আমার এই দরকার কিংবা তাই দরকার।” এমন বলার বদলে তখন তুমি বলতে শুরু করবে “আমার জন্য যা দরকার বুঝবে তাই তুমি করো, আমার সত্তার যেখানে সত্য পরিণতি সেই দিকে আমাকে নিয়ে যাও তোমার অসীম প্রজ্ঞাতে যা দরকার মনে হবে তাই আমাকে দিও।”

এমন অবস্থায় তুমি নিশ্চিত জানবে যে কোনো ভুলই তোমার হতে পারবে না, এমন কিছুই তোমাকে পেতে হবে না যাতে বাস্তবিক তোমার অনিষ্ট হয়।

সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে তুমি আরো এক উপায় গ্রহণ করতে পারো, কিন্তু তাতে পূর্ণ আত্মত্যাগ ও পূর্ণ আত্মদান থাকে। চাই, স্মৃতিরঃ এখানে সে কথা বলছি না। কিন্তু যে নির্ভরতার সম্বন্ধে এই মাত্র বললাম তাতেও যথেষ্ট কাজ হবে, ভগবানকে “দাও দাও” বলার চেয়ে ও সেই মনোভাব পোষণ করার চেয়ে তাতে অনেক বেশি ভালো ফল হবে।

কারণ খুব কম লোকেই জানে যে তার সত্যিকার প্রয়োজন কী। এ কথার প্রমাণ এই যে তারা বরাবরই চায় যে তাদের কামনার পূরণ হোক, সেই চেষ্টাই তারা সর্বদা করতে থাকে, আর যেননি সেই কামনাটি নিটে যায় অমনি আর এক নতুন কামনা নিয়ে পড়ে।

যখন তুমি অনেক কিছুই চাইবে, অনেক কিছুই ভুল করবে, অল্পবিস্তর অনেক কষ্ট ভোগ করবে, অনেক ব্যর্থতা সহ্য করবে, তার পরে কোনো সময়ে কিছু জ্ঞানলাভ করতে আরম্ভ করে তোমার মনে অনুসন্ধান জাগবে যে এই অজ্ঞানপ্রসূত কামনা ও নিত্য চাহিদার বেড়াভাল ভেদ করে ওর বাইরে বেরিয়ে পড়বার কোনো রাস্তা আছে কিনা।

তখন সেই হবে তোমার পক্ষে এক পরম মুহূর্ত, যখন তুমি ভগবানের দিকে দুহাত বাড়িয়ে অকপট চিত্তে বলতে পারবে “এই নাও আমাকে, আমার সব-কিছুকে, আমার পক্ষে সত্যিকার যে পথ সেই দিকেই আমাকে নিয়ে চলো।”

★

★

★

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “Thoughts and Glimpses” (চিন্তাকণা দৃষ্টি-নিবেশ) বইখানিতে লিখেছেন—“আমাদের সত্তার প্রত্যেক বেদনা ও নির্ধাতনের মধ্যে এক তীব্র আনন্দের শিখা রহস্যের মতো লুকিয়ে থাকে, তার তুলনায় আমাদের শ্রেষ্ঠ রকমের পাখির স্তম্ভগুলিকে মনে হবে মিটমিটে জোনাকিবিম্বের মতো।

উত্তর আগে ভেবে দেখে বাধা বেদনা কোন বহুমোর পারেরিয়ে পৌঁছতে চায় ?

ভাগা ভাগা রকমের অপরিণত বুদ্ধিতে মনে হতে পারে যে আত্মাই বন্ধি চাইছে ই জিনিসকে। কিন্তু তা ঠিক কথা নয়। আত্মার প্রকৃতিই হলো চির-আনন্দময়, তার সে আনন্দ নিরবকাশ, নিরবগ্রহ, নিতা হর্ষে ওতপ্রোত।

কিন্তু একথা ঠিকই যে তুমি যদি ভগবৎ-কৃপাতে অটুট আত্মা নিয়ে ধৈর্য বীর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে বাধা বেদনার সম্মুখীন হও, যদি তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালানোর বদলে আত্মহা নিয়ে স্বেচ্ছায় তার নির্ধাতনের মধ্যে প্রবেশ করো, আর জ্যোতির্পর্য সত্যের তীরে উপনীত হবার মন নিয়ে আগাগোড়া তাকে প্রাপ্ত থেকে প্রাপ্ত পর্যন্ত অকুতোভয়ে অনুসরণ করতে থাকো—যে সত্য তার অপরিবর্তনীয় আনন্দস্বরূপ নিয়ে সব কিছুই কেন্দ্রে অবস্থান করছে তার কাছে গিয়ে পৌঁছতে চাও—তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে স্বপ্ন না স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে সেই বেদনাই হবে সেখানে গিয়ে পৌঁছবার পক্ষে অনেক সোজা ও সহজ রাস্তার দরজা।

স্বপ্নের তরফ নিয়ে কোনো-কিছু বলতেই চাই না। কারণ স্বপ্ন এই সৃষ্টিবা ও সত্যিকার আনন্দের দিক থেকে সর্বদাই মূখ ফিরিয়ে ধরে দাঁড়ায়। স্বপ্ন হলো আমাদের পথ ভুলিয়ে বিপথগামী করার জন্য এক রকমের ছেনেভুলোনো ভাণ মাত্র, ওতে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করবেই, তাই তাড়াতাড়ি যদি সত্যের কাছে গিয়ে পৌঁছতে চাও তাহ'লে স্বপ্নকে কখনই তোমার কামা বলে মনে করবে না। স্বপ্ন আমাদের হালকা ক'রে দেয়, আমাদের প্রবঞ্চিত ক'রে রাখে, কেবলই ভুল পথে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু বেদনা গভীরতর সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে, নিবিড়তরভাবে একাগ্র হতে আমাদের বাধ্য করে, আমাদের সহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয়, তাইতে যে জিনিস আমাদের পিষ্ট করছে তারও সম্মুখীন হতে অনায়াসে পারা যায়। তুমি যদি শক্ত হয়ে থাকো তাহ'লে বেদনার ভিতর দিয়েই তোমার শক্তিকে সহজে ফিরে পাবে। আর ওর ভিতর দিয়ে তোমার মূল বিশ্বাসকেও ফিরে পাবে, যে বিশ্বাসের দ্বারা তুমি আপনা থেকেই জানবে যে বেদনার পরপারে এবং তার উপরেও একটা কিছু আছে।

স্বপ্ন পেতে চাইলে তার দ্বারা নিজেকে তুমি এলোমনো বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলবে, ছেঁড়া মেঘের মতো। হারিয়ে ফেলবে, জীবনকে আর সোজাসুজিভাবে দেখতে পারবে না, আসল জিনিসই তুমি ভুলে বসে থাকবে—ভুলে যাবে যে এক মহাসমস্যা তোমার সমাধান করবার রয়েছে, একটা কিছু হুঁজু পাবার বাকি রয়েছে। এখানে তুমি জেনেছ এবং বেঁচে রয়েছ কেবল অনর্থক ঋনিকটা সময় কাটিয়ে যাবার জন্য নয়, কোনো-কিছু শিক্ষা না নিয়ে বা কোনো কিছু না ক'রে এমনি শুধু শুধু চলে যাবার জন্য নয়; স্বপ্ন নিয়েই যদি থাকো তাহ'লে তোমার সমস্ত সময়টাই নষ্ট করা হলো, যে সন্যোগটি এখানে পেয়েছিলে তাও তুমি নষ্ট করলে। অস্তিত্বের এই সন্যোগ পাওয়া অসাধারণ কিছু না হলেও তা বহুবল্য জিনিস, এই অস্তিত্বের

অবস্থানিক তুমি পেয়েছ যাতে এর মধ্যে থেকেই কিছু উন্নতি ক'রে নিতে পারো। শাশ্বত কালের মধ্যে এইটুকুই তোমার বিশেষ মুহূর্ত, এরই মধ্যে তোমাকে জীবনের রহস্য আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে, অস্তিত্বের আসল কারণটি তোমাকে জেনে নিতে হবে। গভীরতর সত্যের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাবার যে সম্ভাবনা তোমার নিলেছিল, স্বপ্নের মধ্যে তুলে থাকলে সেটুকু তোমার নষ্ট হয়ে যাবে, মূল রহস্যের যে আবিষ্কারের দ্বারা তুমি দিব্য জীবনের শাশ্বত আনন্দের পরিচয় লাভ করতে পারতে সে আবিষ্কারটি আর হতে পারবে না।

তাই বলে দুঃখকষ্ট ও বেদনাকে ইচ্ছাপূর্বক চেনে আনা, সেও একরকম অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর জিনিস, এমন বিকৃত মনোভাব থাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়, সে-কথা আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি। কিন্তু আপনা থেকে কোনো বেদনার অবস্থা এসে পড়লে দুর্বল মনে তাতে ভীতিগ্রস্ত হয়ে কোনোগতিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, স্বপ্নের আবেষ্টনের মধ্যে মুগ্ধ লুকিয়ে বা কোনো উদ্বেজনীয় অভ্যুত্থান এনে ফেলে তাকে তুলে যাবার চেষ্টা করা, এ হলো কাপুরুষতা। বেদনাদায়ক জিনিস যখন কিছু এসে পড়েছে, তখন সে তোমাকে কিছু শিক্ষা পাইয়ে দিতেই এসেছে। যত শীঘ্র সেই শিক্ষাটি নিয়ে নিতে পারো, তত শীঘ্রই তার প্রয়োগজন্যতা ফুরিয়ে যাবে। আর আমরা যখন ঐ মূল রহস্যের কথা জেনে ফেলব, তখন কোনো বেদনাই আর আমাদের কাতর করতে পারবে না; কারণ আমরা তখন তার ভিতরের কথাটি জেনে গেছি, কোথা হতে ওর উৎপত্তি আর ওর হেতু কি তাও জেনে গেছি, কেমন ক'রে উদ্ভীর্ণ হওয়া যায় সে উপায়টিও জেনে গেছি।

সে উপায় হলো নিজের অহংএর গভী কাটিয়ে বেরিয়ে আসা, আমাদের অহংভাবে সংকীর্ণ জ্ঞানখানার থেকে বেরিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে নিশে যাওয়া, এমন ভাবে ভগবানের মধ্যে ভরল হয়ে তলিয়ে যাওয়া যাতে কোনো-কিছুতেই ভগবান থেকে আমাদের তফাৎ ক'রে ফেলতে না পারে। এই নিগূঢ় রহস্যের কথা যখন আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেলব, যখন এই সত্যকেই আমাদের সমস্ত মধ্যে উপলব্ধি করতে থাকবো, তখন কোনো বেদনারই উপস্থিতির সার্থকতা না থাকায় তা আপনা হতে দূর হয়ে যাবে। এই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে জোরালো পন্থা,—কেবল গভীরতর সমস্ত বা আত্মার বা অধ্যাত্ম চেতনার দিক থেকেই নয়, কিন্তু আমাদের প্রাণ ও দেহের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এমন কোনো ব্যাধি নেই, এমন কোনো বিকলতা নেই যা এই গূঢ় রহস্যের অনুভূতিকে ও তার বাস্তব প্রয়োগকে প্রতিহত করতে পারে, কেবল সমস্ত উচ্চাংশগুলির সম্পর্কেই নয়, কিন্তু সর্বনিম্ন স্থূল দেহ-কোষগুলির সম্পর্কেও।

তুমি যদি সেই সব বেদনাদায়ক আক্রমণকারীদেরকেও শিখিয়ে দিতে পারো যে তাদেরও অস্তরালে কোন অনুভূতি লুকিয়ে রয়েছে, যদি দেখিয়ে দিতে পারো যে কোন মূল কারণ

থেকে তাদের উপস্থিতি ঘটেছে, তাহ'লে তারাও দাঁড়িয়ে যাবে সর্বব্যাপী বিশ্বসত্যের অংশ-স্বরূপ, কাজেই যে সকল মৈত্রিক বাহ্য বিকলতা থেকে রোগব্যাদির সৃষ্টি হয় তাও তখন গভীর-তর সস্তার অন্যান্য বিকলতার মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু এর জন্য তোমাকে আগে সাহসী হতে হবে, কাপুরুষ বা ভীতু হওয়া চলবে না। মৈত্রিক বিকলতা যখন কিছু দেখা দেবে তখন সবচেয়ে তাকে এড়াতে চাইলে চলবে না। সংসারের সঙ্গে, অন্ধ অচঞ্চলতার সঙ্গে, দৃঢ়তা ও স্থনিশ্চয়তার সঙ্গে রোগটিকে বিখ্যা জিনিস জেনে নির্ভয়ে তার সংশ্লীশ হতে হবে,—তার পরে যদি পূর্ণ স্থিরতা ও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ভগবৎ-কৃপার দিকে চেয়ে তার কাছেই নিজেকে মগ্নে নাও, তাহ'লে সেই কৃপা তোমার দেহকোষের পরতে পরতে ঢুকে ক্রিয়া করবে, যা সস্তার গভীরেও হয়ে থাকে, আর স্থল কোষগুলিও তখন শাশ্বত সত্যের ও আনন্দের ভাগ পাবে।

*

*

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “Thoughts and Glimpses” (চিন্তা-কণা-দৃষ্টি-নিবেশ) বইখানিতে লিখেছেন—“জীবনের কাছে প্রকৃতি যে নিরন্তর প্রশ্ন করে চলেছে তারই নাম মৃত্যু। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রকৃতি জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবন এখনও তার নিজেকে ঝুঁজে পায়নি। মৃত্যুর তাড়না যদি না থাকতো, তাহ'লে জীব চিরদিনই একভাবে একটা অসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেতো। মৃত্যু তাকে তাড়না করছে বলেই জীব পূর্ণতর জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে এমন সজাগ, কি উপায়ে তাই সত্ত্ব হবে এখনও তারই খোঁজ করছে।”

উত্তর মৃত্যু কেন আছে ?

যাদের মধ্যে কিছুমাত্র চেতনা জেগেছে, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে অন্তত একবারও এ প্রশ্নটি উঠেছে। জীব মাত্রেরই অন্তরে রয়েছে আপন জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার, তাকে ফুটিয়ে তোলবার ও বাঁচিয়ে রাখবার এমন এক অদম্য প্রেরণা, যে তারা মৃত্যুর আভাস মাত্রই সশঙ্কিত ও সংকুচিত হয়ে ওঠে ; কোনো কোনো নরন প্রকৃতির লোকের মনে ওতে বিভীষিকা জাগে, কেউ কেউ অতিশয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে : “এ কী ভয়ানক রকমের প্রহসন, যাতে বাধা হয়ে আনাকে অংশগ্রহণ করতেই হবে, যদিও আমি তা না চাই এবং তার কিছু না বুঝি ? মরতেই যদি হয় তবে জন্মানোই বা কেন ? মানুষের বেড়ে ওঠবার, এগিয়ে চলবার, গুণের উৎকর্ষ ঘটাবার এত আগ্রহই বা কেন, যদি সমস্তই একদিন নিবে যাবে, সবই লোপ পেয়ে যাবে ?” মৃত্যুর হাত এড়াবার কোনো উপায় নেই দেখে কেউ কেউ নিশ্চেষ্ট হয়ে নির্দয় নিয়তির কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, কেউ

বা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ডানায়, আর যারা তেমন শত্রু মানুষ নয় তারা কিছুই না ক'লে দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে থাকে। আর বারে বারে এই একই প্ৰশ্নটি নানাভাবে সকলের সামনে এসে উপস্থিত হয়। যদি মনে হয় যে কোনো চেতন ঠাট্টা এর পিছনে ক্রিয়া করছে, তাহ'লে তাকে অতি ভয়ংকর জিনিস বলেই বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু ঐশ্বরবিন্দু এখানে বলতে চাইছেন যে ভড় চেতনার মধ্যে ক্রমিক পূর্ণতা ও ক্রমোন্নতির তাগিদ ভাগিয়ে তোনবার জন্য এই উপায়টি হলো অপরিহার্য। এই জিনিসটি না থাকলে জীব যেমন অবস্থাতে আছে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে অনন্তকাল ধরে এক ভাবেই থেকে যেতো, কিছুমাত্র বদলাতো না।

তা ছাড়া আমরা জানি যে সব-কিছুই বধিষ্ণু, সব কিছুই অগ্রগামী, এই সৃষ্টি ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাও একটা পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছে, আর যতই আমরা এগোচ্ছি ততই পূর্ণতার গীমা আরো সরে সরে যাচ্ছে। আগে এক সময় যাকে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হতো, পরবর্তী সময়ে আর তা হচ্ছে না। সভ্য-চেতনার যে সব চেয়ে সূক্ষ্মতম ও উন্নততম অবস্থা দেখা দিচ্ছে, তারও গীমা বেড়ে বেড়ে সেই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। জীবাবস্থার যে সব চেয়ে সূক্ষ্মতম পরিণতি, তাও এই দিবা অগ্রসরতার ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার নাগান ধরে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভড়বস্তুর প্রকৃতি অনড়, তার ভিতরকার রূপান্তরের ক্রিয়া নিতান্তই মন্থর, কালের অনুপাতে মনের চেতনার দ্বারা তা প্রায় ধরাই যায় না। সুতরাং তাকে নিয়ে চলতে ভিতরের দিকের ক্রতগামী সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সঙ্গে বাইরের দিকের স্থূল মন্থর ক্রিয়ার একটা অসামঞ্জস্য থেকেই যায়। এই যে অসামঞ্জস্য, অর্থাৎ বাহ্য দেহের পক্ষে ভিতরের উন্নতির ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার পক্ষে এই অপারগতা, এর কারণেই মাঝে মাঝে বাহ্য আকৃতির ধ্বংস ও পরিবর্তন নিত্যন্ত আবশ্যক হয়ে থাকে।

কিন্তু যদি আমরা এই ভড়দেহের উপাদানবস্তুর মধ্যেও এমন কতকটা চেতনা এমন ফেনতে পারতাম, যাতে সভ্যর আভ্যন্তরীণ সূক্ষ অংশগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তারও সঙ্গতি রক্ষিত হতো, আর দেহবস্ত্র যদি এতটাই নমনীয় হতো যে ভিতরের উন্নতির সঙ্গে বাইরের দিকের এমন দৃঢ় অসামঞ্জস্য না আসতো, তাহ'লে ভিতর বাহির দুইরকম অংশের মধ্যে একটি ভারসাম্য থেকে যেতো, এবং তাতে তাহ'লে মৃত্যুর এমন প্রয়োজন না হতো পারতো।

এখন বর্তমান অবস্থায় এসে আমরা কতক জানতে পেরেছি যে তেমনই সামঞ্জস্যকারক রূপান্তর আনা আমাদের পক্ষে সাধ্য হতে পারে। অতএব আমাদের এখন তাকে যথাসাধ্য সম্ভব ক'রে তুলতে হবে,—এবং তাই নিয়ে উচ্চশক্তির কাছে, মহাচেতনার কাছে, সদ্য

আবির্ভূত মহাশক্তির কাছে নিবেদন জানাতে হবে, কারণ সেই শুধু এনে দিতে পারে জড়ের মধ্যে এমন কিছু চেতনাস্পন্দন যাতে সেখানে রূপান্তরের কাজটি শুরু হয়ে যায়, যাতে এই জড়বস্তুও যথেষ্ট নমনীয় ও পরিবর্তনীয় ও বিকাশোন্মুখ হতে পারে।

এই রূপান্তর আনার পক্ষে আমাদের সব চেয়ে যা কঠিন বাধা, তা হলো বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে তার প্রতি একটা দূরপন্থেয় আকর্ষণ। আর প্রকৃতিও চাইছে তাই। বিশ্বপ্রকৃতি তার সকল ক্রিয়ার ভিতর থেকে দেখছে যে, কিছু গভীর ধরনের চেতনা যারাই পেয়েছে তারাই খুব তাড়াতাড়ি উন্মত্তির পথে এগিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু প্রকৃতির পছন্দ হলো বিনবিত্ত রকমের বক্র গতি, যাতে বারে বারে পরীক্ষা চলেতে থাকবে, বহুবার তা বার্দ হয়ে যাবে, আবার গোড়া থেকে নতুন করে তার কাজ শুরু হবে, নতুন নতুন তার উপায় উদ্ভাবিত হবে। পথের অব্যবস্থিত খেয়ালী ভাবটাই সে পছন্দ করে, আর পছন্দ তার অকস্মাৎ অভিজ্ঞতা লাভ। এ কাজের যত বিলম্ব তত তার কাছে কৌতুকপ্রদ।

কিন্তু খেলা যতই কৌতুকজনক হোক, তার মাঝেও ক্রান্তি এসে পড়ে। এমন এক সময় এসে পড়ে যখন মনে-হয় এ খেলা এবার বদলে যাক।

আর তখন তুমি এমন নতুন ধরনের খেলার সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করো, যাতে উঁচুতে ওঠবার জন্য এমন ধ্বংসের প্রয়োজন হবেনা, তার আগ্রহ এতই বিরামহীন ও সন্তোষ প্রাপক যে নিতাই তুমি নতুন নতুন রাস্তা পেয়ে নতুন নতুন বিকাশের দিকে ধুকবে, সেই সমগ্র আগ্রহের ফলে সমস্ত আলস্য ও জড়তা, সমস্ত অগতি ও ক্রান্তি ও উদাস্যকে তুমি নিতাই অতিক্রম করবে।

খানিকটা পথ হেঁটে গেলেই আমাদের দেহের পক্ষে বসে পড়বার দরকার হয় কেন? দেহ তখন ক্লান্ত হয়ে বলে “দাঁড়াও বাপু, একটু জিরিয়ে নিট”। এই জিনিসই তাকে নৃত্যের দিকেও নিয়ে যায়। ওর মধ্যে যদি এমন বিরামহীন আগ্রহ এসে পড়তো যে উত্তরোত্তর সে ভালোর চেয়ে আরো ভালো কাজ করতে ছুটছে, তার কাজ স্ফুট থেকে স্ফুটতর, সুন্দর থেকে সুন্দরতর, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ বল এবং ভাষা ও তরুণ হয়ে চলেছে, তাহলে তার জোরে তুমি প্রকৃতির এই ভয়ংকর নিয়মটাকে এড়িয়ে যেতে পারতে।

প্রকৃতির নিজের কাছে ও-জিনিসের বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। সে দেখে একটা সমগ্রতার দৃষ্টি থেকে, সে দেখে যে ওতে শেষ পর্যন্ত কোনো-কিছুই তো খোঁয়া যাচ্ছে না, অগণ্য আগুণীকণিক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানগুলিকে নিয়ে একবার ভেঙে আর একবার গড়া হচ্ছে মাত্র, একটা জিনিস ভেঙে আবার অন্য একটা নতুন জিনিস তৈরী হচ্ছে মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির কাছে হলেও সকলের কাছে এমন ধরনের খেলা প্রীতিপ্রদ না হতে পারে। এই প্রকৃতির মতো ব্যাপক এবং ওর চেয়েও শক্তিশালী চেতনাকে যদি আনি আয়ত্ত

করতে পারি, তাহ'লে ঐ খেলাই কেন আরি ওর চেয়ে ভালো রকম উপায়ে খেলতে চাইব না ?

এই সমস্যাই এখন এসে পড়েছে আমাদের সামনে । তা ছাড়া এখন আরো কিছু নতুন জিনিস এসে যোগ দিয়েছে, অতিমানস শক্তির নতুন রকম সহায়তা এখন আমাদের মধ্যে কাজ করছে, স্মৃতিশক্তি এখন কেন আমরা ঐ ভয়ংকর খেলাটিকে আরো সুন্দর, আরো সুসঙ্গত এবং আরো সত্যের অনুরূপ ক'রে, অর্থাৎ আরো দিব্যতর প্রণালীতে খেলতে চাইব না ?

এমন শক্তিমান নস্তিক যদি কয়েকটি মাত্রও থাকে, যারা এই অতিমানস শক্তিকে নিজেদের মধ্যে সম্যকভাবে গ্রহণ করতে পারে ওর সমুচিত সাফল্যের জন্য তদুপযোগী বাস্তব ক্রিয়ার প্রবর্তন করতে সক্ষম হবে, তবে তাতেই যথেষ্ট । এমন কয়েকটি শক্তিশালী চেতনার দরকার, যারা প্রকৃতিকে দেখিয়ে দিতে পারবে যে তার পদ্ধতির চেয়ে অন্য এক রকমের পদ্ধতিও রয়েছে ।

কথাটা হয়তো পাগলানির মতো শোনাচ্ছে । কিন্তু ভগতে প্রত্যেক নতুন জিনিস-টাই আগে পাগলানির আকারে দেখা দেয়, এবং পরে তা বাস্তবরূপে সত্য হয়ে ওঠে । এই পাগলানিটিও তেননি সত্য হয়ে ওঠবার সময় এখন এসেছে । যেহেতু আমরা কেন যে এ ভাবে একত্রে সমবেত হয়েছি তার কারণ তোমরা প্রায় সকলেই জানো না—যদিও সেকারণটি নিজে সম্পূর্ণ সচেতন,—তাই আমি তোমাদের আহ্বান করছি, এস, এই পাগলানিকে সার্থক ক'রে তোল । জীবনধারণের এই মহাঝগাটের একটা সার্থকতা অন্তত তাতে পাওয়া যাবে ।

প্রশ্ন প্রকৃত আনন্দকে জানার উপায় কি ?

উত্তর প্রথমত প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের দ্বারা যথার্থভাবে এই কথাটি বুঝে নিতে হবে যে কাননা ও তার পূরণের দ্বারা যে অনিদিষ্ট রকমের সুখ বৈলে তা অতি অনিশ্চিত, নিশ্চিত, ক্ষণস্থায়ী, ও শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তিদায়ক । এইটি জানা থেকেই কাজ শুরু হবে ।

তার পরে, কাননা মাত্রকেই তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতে হবে, আর সোটিকে পূরণ করা তো দূরের কথা, বিনা ওজরে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে । এই ভাবে অগ্নিসর হতে থাকলে বহুদিন কিংবা অল্পদিনের মধ্যেই, বুদ্ধ যা জেনেছিলেন ত্রিনিও তাই জানতে পারবে, যে কাননার পূরণের দ্বারা যে অস্থায়ী ও নিশ্চিত রকমের সুখ পাওয়া যায়, তার চেয়ে তাকে

সংযত ও বর্জন করতে পানলে অনেক বেশি উচ্চদের আনন্দ লাভ হয়। এই হলো দ্বিতীয় ধাপ।

এই ভাবে সর্বদা সংযম অভ্যাস করতে থাকলে তুমি দেখবে যে কামনা তোমার থেকে তফাতে গড়ে থাকবে, আর সে তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। তখন ওর কবল থেকে মুক্ত হয়ে তুমি তোমার সম্ভার আরো খানিক গভীরে প্রবেশ করতে পারবে, আর আপন আত্মপূরণ নিয়ে পরম আনন্দমূলের দিকে, ভগবানের দিকে, ভগবৎ-স্বপ্নার দিকে আপনাকে উন্মীলিত করে ধরতে পারবে। অকপট আত্মনিবেদনের ভাবটি নিয়ে যদি এই কাজ করা হয়, অর্থাৎ কোনো কিছু প্রতিদান পাবার প্রত্যাশানাত্ম না নিয়ে নিজে থেকে যদি একেবারে মগ্ন হয়ে পড়ো, সমর্পণ করতে পারো, তবে দেখবে তোমার গদয় ভরে গিয়েছে এক মধুর, নিবিড় ও প্রদীপ্ত কবোক্ষতায়। এই হলো প্রকৃত আনন্দের পূর্বাভাস।

তার পরে খুব সহজ রাস্তা।

তবে এ কথাও তোমাদের বলে রাখি যে আনন্দ পাবারই বিশেষ উদ্দেশ্য মনে রেখে যদি এই প্রণালীতে চলতে থাকো, তাহলে কিন্তু সে আনন্দ দেখা দিতে অনেক বিনয় হবে কারণ তাতে তোমার প্রয়াসের মধ্যে অসং ভাবটি লুকিয়ে রইল। তেমন হলে তাকে নিবেদন বলা চলে না, সে হলো চাহিদা—তাতেও আনন্দ মিলতে পারে, কিন্তু তা হবে অনেক দেরিতে, অনেক পরিণাম ও প্রয়াসের পরে; তার চেয়ে কিছুই যদি তুমি চাইতে না যাও, কিছুই প্রত্যাশা না করো, কেবল থাকে তোমার অকপট আত্মদান, তার মধ্যে দেনাপাওনার প্রশ্নই নেই, আছে শুধু এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপূরণ, দিয়া অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছবার একটা অদম্য আকিঞ্চন : সেই হলো খুব খাঁটি জিনিস।

★

প্রশ্ন : কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছেন, এক অদ্বিতীয় অস্তিত্ব নিজে প্রকট হবার আনন্দকে লাভ করার জন্য বহুধা হয়েছেন, সে তাহলে কোন আনন্দের কথা ?

উত্তর : সে এই একই আনন্দ, যার কথা আমি বললাম। তা অস্তিত্বের আনন্দ।

এমন একটা সময় আসে যখন তুমি তৈরী হয়ে উঠেছ। তখন তুমি সর্বত্রই এই অস্তিত্বের আনন্দকে অনুভব করতে থাকো, প্রত্যেকটি জিনিসে, প্রত্যেক ক্রিয়াতে, প্রত্যেক স্পন্দনে—কেবল জীবের মধ্যে নয়, কেবল চেতন সম্ভার মধ্যে নয়, কেবল গাছপালার মধ্যে নয়, কিন্তু তোমার চতুর্দিকে ছড়ানো সব-কিছুই মধ্যে, যাতে হাত ঠেকছে তারই মধ্যে পাচ্ছে। সেই আনন্দ, যেমন ভাবেই থাকো তাতেই আনন্দ, তুমি যে আছো সেটাই মহা আনন্দ। সব জিনিসের মধ্যেই রয়েছে স্পন্দন, সে হলো অস্তিত্বের স্পন্দন। তাই আনন্দ। যে

জিনিসকে তুমি স্পর্শ করছ তার মধ্যেই তার অস্তিত্বের স্পন্দনের সেই আনন্দকে তুমি অনুভব করছ। কিন্তু এই জিনিসকে জানবার জন্য সেই পুষ্টি ও গাধনার ভিতর দিয়ে তোমার যাওয়া চাই, যার কথা আগেই বলেছি। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কাননা, বাসনা, আশঙ্কি, পঙ্ক-অপঙ্কনের পুষ্টি তোমার রয়েছে, যাকে বলে স্বপ্ন তা যতক্ষণ তোমার গ্রাহ্যের বিষয় হয়ে রয়েছে, প্রাণের স্বপ্ন বা দেহের স্বপ্ন যতক্ষণ তোমার কাম্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিব্য আনন্দকে তুমি জানতে পারবে না, কিছুতেই না।

অথচ সে আনন্দ সর্বত্র সব-কিছুরই মধ্যে রয়েছে, সূক্ষ্মভাবে। একটা সময় আসবে যখন তোমার কাছে তার অনুভব অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠবে। সকল-কিছুর ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে দেখবে সকলের ভিতর থেকেই তাদের আনন্দগান শোনা যাচ্ছে।

এখানে অবশ্য আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে মানুষদের মধ্যে এই আনন্দকে দেখতে পাওয়া কিছু কঠিন, কারণ মানুষদের মনের ও প্রাণের ছাপগুলো সেই অনুভবের সামনে এসে পড়ে তাকে নষ্ট করে দেয়। মানুষের ভিতরকার অহংভাবের যে রুদ্ধতা, তা ওর সব কিছুর মধ্যেই নিশে থাকে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে সে ভাব অনেকখানি অকৃত্রিম; গাছপালা ও ফুলের বেনাতে, আর সমগ্র উদ্ভিদ্রাজ্যের মধ্যেই দেখতে পাবে ঐ জিনিসের অপূর্ণ নিকাশ। সে রাজ্যের সকলেই অন্যায়সে জানাচ্ছে তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি।

তা যখন নিজেই দেখতে পাবে, তখন জানবে যে সত্যিকার দিব্য আনন্দের স্পর্শটুকু তুমি পেয়ে গেলে। সে দেখা কোনো-কিছুর উপরেই নির্ভর করেনা, বাহ্য কোনো ঘটনার উপরেও নয় কিংবা কোনো কনবেশি অনুকূল অবস্থার উপরেও নয় : সে হলো সকল-কিছুর ভিতর দিয়ে বিগ্ন অস্তিত্বের যে মূল কারণ তারই আনন্দের সঙ্গে তোমার মিলনানন্দ। সেই আনন্দই এসে তোমার দেহের সমস্ত কোষগুলিকে পর্গত আপ্নত করে দেবে। সে জিনিস কোনো কিছু ভেবেচিন্তে আসে না,—আর তাকে তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝতেও যাও না কিংবা বিশ্লেষণ করে দেখতেও যাও না, আপনা হতেই সে অবস্থাটি তোমার এসে যায়। আর তখন দেহ ও তোমার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নবীন হয়ে ওঠে, কোনো দিকে ফিরে চাইবার দরকার হয়না, আত্মনিরীক্ষণ বা আত্মবিশ্লেষণ বা সেদিক দিয়ে কিছু বিচার করে দেখবার মনোভাব তোমার থাকে না। তখন তোমার মধ্যে চলেছে প্রাণস্পন্দনের এক সঙ্গীতধারা, তুমি আনন্দে নিমগ্ন, কিন্তু তথাপি অতি প্রশান্ত, তার মধ্যে উদ্বেজনা নেই, আবেগের উন্মাদনা নেই। সে অতি সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু তবু অতি স্তরীয় আর তখন এই কথা মনে হতে থাকে যে সমগ্র বিশ্বেই আশ্চর্য রকমে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন কি মানুষের সাধারণ চেতনার কাছে বা কুৎসিত ও অপ্রীতিকর তাকেও দেখায় অপূর্ণ।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে এমন আনন্দের অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, কারণ বাহ্য

মনের ও প্রাণের গড়া জিনিষগুলি এসে তাকে নষ্ট ক'রে ফেলে। তখন আবার সেই পূর্বেকার স্বাভাবিক অনুভবের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হয়, সকল জিনিসের বিষয়েই যা অজ্ঞান, যা অন্ধ। কিন্তু তন্মিমা, যেমন বাইরের কোলাহল ও ভিতরের উত্তেজনা থেমে যায়, তেমনি আবার সকল কিছুই বদলে যায়। তখন সব দিকেই দেখতে পাও এক আশ্চর্য সঙ্গতি : সবই আনন্দময়, এবং তা সত্য আনন্দ, দিব্য আনন্দ।

*

*

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Thoughts and Glimpses (চিন্তা-কণা দৃষ্টি-নিমেষ) বইখানিতে লিখেছেন—“ভগবান এই ছগৎকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছেন, স্বামী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচণ্ড দাপটে আর নিত্য সংস্বের কোলাহলে একে মুখন ক'রে রেখেছেন। তুমি কি এর ভিতর থেকে ফাঁকি দিয়ে ভগবানের শাস্তিকে চুরি ক'রে দখল করতে চাও, তার যা ন্যায্য মূল্য তিনি ধার্য ক'রে রেখেছেন তা নোটট না দিয়ে ?

যে সাফল্যকে সম্পূর্ণ মনে হচ্ছে তাকে কখনো বিশ্বাস কোরো না, কিন্তু সাফল্য মেনার পরেও যদি দেখ যে অনেক কিছু করতে এখনও বাকি রইল, তাহ'লে বরং ওতেই খুশি হয়ে আরো এগিয়ে চলো ; কারণ প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হতে আরো স্বদীর্ঘ প্রয়াসের দরকার।

কোনো এক ধাঁচিতে পৌঁছে তাকেই শেষ গন্তব্য বলে মনে করা, কিংবা পথের কোনো আশ্রয়স্থানে পৌঁছে সেখানেই নিশ্চিত হয়ে অথবা বহু বিলম্ব করতে থাকা,—তোমাকে নিষেধ ও অসাড় ক'রে রাখবার পক্ষে এমন ভাল কাজ আর দ্বিতীয় নেই।”

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এই কথাগুলি লিখেছেন—প্রকৃতির মধ্যে যত অসাড়, অনড়, অলস, অল্পে তুচ্ছ, নিশ্চেষ্টতামূলক জিনিষ রয়েছে, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সাবধান ক'রে দেবার জন্য। জীবনে প্রায়ই এমন অনেককে দেখা যায় যারা এমন নিশ্চেষ্টে, পাছে কষ্ট ক'রে লড়াইয়ে নেমে যেতে হয় সেই ভয়ে তারা শাস্তিবাদী, তারা বিশ্বাস নেবার মতো কিছু মেহনত করবার আগেই বিশ্বাস হোঁজে, তারা অল্প একটু এগোতে পারলেই তাতে খুশি হয়ে রইল, সেইটুকু পেনেই ভেবে নেয় যে অসাধারণ রকম সিদ্ধি মিলে গেছে, তাই সেই পর্যন্ততেই থেমে গিয়ে তারা বিশ্বাস ভোগ করতে থাকে। সাধারণ জীবনে প্রায় তাই হতেই দেখা যায়। স্বাধাবতী গুরুর মানুষদের পক্ষে মূলতঃ তাই হলো আদর্শ, ওতেই মানবসমাজকে এমন তুলিয়ে রেখেছে। সে আদর্শ হলো “তোমার যৌবন যতদিন আছে ততদিন খুব কাজ ক'রে যাও, যতটা পারো অর্থ ও যশ সঞ্চয় ক'রে ফেলো, যত বেশী পারো টাকা জমাও, মোটা পুঁজি গড়ে তোল, খুব উঁচু পদে উঠে যাও, তার পর যেমন চম্পিত পার হলো এমন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ো, বসে বসে যত কাল পারো তন্মুখা ভোগ করো, তার পরেই পেনসন ; অনেক

খাটা হয়েছে, ওর পনের কাজ হলো কেবল ভবিষ্যে বসে বিশ্রাম উপভোগ করা।” কিন্তু চলতে চলতে অননি খেনে যাওয়া, পথের মাঝেই বসে পড়া, কিছুটা মাত্র এগিয়ে আর না এগোনো, জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে পড়া, অকালে কবরে গুয়ে পড়া, এতে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য গিন্ধ হয় না, জীবন সফল হয় না।

জীবনের মাঝেই যে বসে পড়লে, আর তুনি নড়লে না।

কিন্তু যে মুহূর্তেই তুনি এগিয়ে চলা থামিয়ে দিলে, সেই মুহূর্তেই পিছিয়ে পড়লে। যে মুহূর্তেই গন্তর্ঘ্য হয়ে আত্মহাকে থামিয়ে দিলে, সেই মুহূর্ত থেকেই তোনার মৃত্যু শুরু হয়ে গেল। জীবন নানেই গতি, জীবন নানেই প্রয়াস; কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে চলা, পাশাড় পর্বত ডিঙিয়ে ভবিষ্য অতিব্যক্তি ও সিদ্ধির দিকে ক্রমোত্তরণ। এর মাঝে বিশ্রাম নিতে চাওয়ার মতো বিপজ্জনক আর কিছুই নেই। কাজের মধ্যে, প্রয়াসের মধ্যে, চলতে চলতেই তোমাকে বিশ্রাম খুঁজে নিতে হবে, সেই হলো সঠিক বিশ্রাম,—আর সে বিশ্রাম নিলবে যখন তুনি ভগবৎ কৃপার উপর পুরো আস্থা আনতে পারবে, যখন কাননা বাসনা হুচে যাবে, যখন আপন অসংসারকে তুনি ভয় করতে পারবে।

চেতনাকে প্রসারিত ক’রে দিয়ে তাকে বিশ্রাম ক’রে তোলা, সেই হলো আসল বিশ্রাম। বিশ্রামের মতো বিরামটি হয়ে যাও, তখন দেখবে সবটাই তোনার বিশ্রাম। এই বিশ্রাম কর্তার মধ্যে, এর নিত্য সংসর্গের মধ্যে, প্রয়াসের মধ্যে থেকেই পাবে তুনি শান্তির বিশ্রাম রহস্যের সন্ধান।*

* অন্তর্যামক—গন্তর্ঘ্য ভট্টাচার্য

বাসবদত্তা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীঅন্নবিন্দু

(সারাংশ)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য অবন্তী। সেখানকার রাজা চণ্ড মহাসেন। প্রবল প্রতাপ-
বিত্ত এই রাজা। অথচ তাঁর মতো ভারতবর্ষের আর এক রাজা তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের
প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে—

Vuthsa Udayan drives my fortune back.
Our strengths retire from one luxurious boy,
Defeated

বনজেন প্রবীণ পরাক্রান্ত নৃপতি। প্রতিবেশী রাজ্য কোশাঘরী রাজা উদয়ন সুদর্শন তরুণ
যুবক। তিনি শোভনে সংগীত, বিশেষ কমনীয় সৌন্দর্য তাঁর কবিরাজকে নিয়ে উদ্ভাও হয়ে
যায়। রাজনীতির খনতা কূটনিত্য তাঁকে পীড়িত করে, সে-ভার ন্যস্ত তাঁর বিচক্ষণ বয়োবৃদ্ধ
মন্ত্রী যোগকরায়ণ-এর উপর। কিন্তু উদয়ন ভীরা নন। রণক্ষেত্রের ক্ষাত্রবীর হুঁ তাঁর কাছে
সৌন্দর্যেরই মতো স্পৃহনীয়—

War is beautiful
And the bright ranks of armoured men and steel
That singing kisses steel and the white flocking
Of arrows that are homing birds of war.

এই উদয়ন নানেননি অবন্তীরাজের বশ্যতা। সমুদ্রযুদ্ধে বারংবার পরাজিত হয়েছেন মহা-
সেন। তাই তিনি চক্রান্ত করলেন। অবন্তীর যুবরাজ গোপালক পিতার কাছে নির্বাসন
দণ্ড চেয়ে নিয়ে গেলেন কপট আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে উদয়নের রাজদরবারে। মন্ত্রী সন্দেহ
প্রকাশ করলেন। উদয়ন সে-কথা অগ্রাহ্য করে নিজের একান্ত গান্ধিধো আশ্রয় দিলেন
গোপালককে। উদয়নের মনে অন্য কথা। তিনি যে বিপদ বরণ করলেন তা অবশ্য
তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই সুযোগে হয়ত বহুশত বাসবদত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে

পারে—সেই তিলোত্তমা গোপালকের ভগ্নী, শত্রুরাজের কন্যা। গোপালক ক্রমে অস্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন উদয়নের। তারপর এক রজনীতে নৃগয়া এবং ভ্রমণের ছলনায় উদয়নকে নিয়ে এলেন গোপালকের পার্বত্য অরণ্যে। সেখানে থেকে বলে এবং কৌশলে অবতীর রাজ-পুরীতে এসে পৌঁছালেন গোপালক কৌশাধীর রাজ্যে। ১৮ চক্রান্ত করেছিলেন মহা-সেঙ। কৌশাধীরাজ হবেন তাঁর অনুগত বাধ্য, থাকবেন রাজকুমারী বাসবদত্তার অকলা-শ্রিত হয়ে নিরুপদ্রব অবতীর রাজপ্রাসাদে—বহুজন-ঈপ্সিত স্বন্দরীশ্রেষ্ঠের মনোরঞ্জন করে। কৌশাধী অবতীর অস্তর্ভুক্ত হয়ে তার সমৃদ্ধি সাধন করবে।

বৎস উদয়ন বাসবদত্তার অনুগত হতে রাজ্যী হয়েছেন। কিন্তু কৌশাধী তিনি উপহার দিতে পারেন না বিদেশী রাজাকে, রাজ্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। বলছেন তিনি মহা-গেঙর উদ্দেশ্যে—

Thou art in error.
Thou hast not great Cowsâmby's monarch here,
But Vuthsa only, Sathaneka's son

What thou canst do with Vuthsa, do, O king.
In nothing will I pledge Cowsâmby's majesty.

প্রত্যাখ্যাত রাজা তাঁকে বন্দী করলেন অস্ত্রপুরে।

অস্ত্রপুরে তাঁর সাক্ষাৎ হল বাসবদত্তার সঙ্গে। রাজকুমারীর জন্য ভূতা এনেছেন মহাসেঙ। এই রাজা উদয়ন? তাঁর ইচ্ছার পুতুল?

He's my own, my own,
My slave, my toy to play with as I choose...

তারপর কখন অস্ত্রাতে এই স্বন্দরকান্তি বীরাত্মগণ্য ক্রীড়নকেই তিনি ভালোবেসে ফেললেন

But Udayan, thou must vow,
And the word bind thee, that none else shall be
Cowsâmby's Queen...

রাজকুমারীর অহঙ্কার খখন চূর্ণ হল প্রেমের কাছে তখন তিনি ধরা পড়েছেন স্নেহময়ী রাজমাতা

অদারিকার কাছে। অদারিকা দিলেন সাহায্য, সদুপদেশ। তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন সতীক উদয়নকে স্বদেশে ফিরে যেতে। দ্বিতীয় রাজকুমার হলেন প্রধান সহায়—তিনি নিদ্রোহ করলেন পিতার বিরুদ্ধে

Thus are vassals made ?

Thus empires built ? This is a shameful thing.

বিকর্নের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাসবদত্তার দাসী ও সখীস্বয়—অদা ও মণ্ডুলিকা। উদয়ন স্বয়ং প্রস্তুত নিজের বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করবার জন্যে। তাঁর উদ্দেশ্য সফল। এখন দেশে তাঁকে ফিরে যেতে হবে—সকল প্রতিবন্ধক ভয় করে।

বাসবদত্তাকে নিয়ে সেদিন উৎসব। উৎসব প্রাসাদে নয়—দূরে উদ্যানে। যথাসময়ে স্বম্ভার অপ্রতিদত্ত শ্রোতে দূরের অন্তরে তলিয়ে গেল প্রহরীরা অধিকাংশ। বিকর্নের সহায়তায় স্বকৌশলে প্রাচীর-বেষ্টনীর বাহিরে এলেন উদয়ন ও বাসবদত্তা। সেখানে রথ ছিল প্রস্তুত—বিকর্নেরই রথ। সে-রথের সারথির আসন অনঙ্কুত করে বসেছেন মণ্ডুলিকা—যুদ্ধে অপূরিতা সৌরাষ্ট্রকন্যা রাজদুহিতা বাসবদত্তার বন্দিনী সহচরী। রাজপ্রাসাদে যখন সংবাদ পৌঁছান তখন মহাসেঙে জলে উঠলেন ক্রোধে—সৈন্য সানন্তদের আদেশ দিলেন পলাতকদের আক্রমণ করতে। রানী অদারিকা যুক্তি দিলেন উদয়নের সমর্থনে—

**Cowsâmby's king has kept the Aryan law,
Nor is thy daughter shamed at all in this,
But taken with noblest honour.**

বললেন আরো গভীরতর অবদানের কথা,

**Hast thou forgotten thy daughter's heart ? Her good,
Her happiness are nothing to thee ?**

মহাসেঙে বুঝলেন রানীর যুক্তির সারবত্তা। তিনি নুতন প্রস্তাব তুললেন। তাঁর সৈন্য-সানন্তরা পৌঁছানর আগে যদি উদয়ন সীমান্ত অতিক্রম করেন তবে আর তিনি আক্রমণ করবেন না। তিনি সম্মতি দেবেন বাসবদত্তার কৌশারীবাসে। অধিকন্তু বাসবদত্তার যাবতীয় ব্যবহার্য বস্তু তিনি পাঠিয়ে দেবেন উদয়নের রাজপুত্রীতে।

চম্ভানোক্তিত বজনীতে পলাতকৰা এসে নামলেন অবন্তীৰ বনা সীমান্তে। সেনাপতি
 রেভা পশ্চাচ্ছাবন কৰে এসে পৌঁচালেন। তাঁৰ সৈন্যবল চতুৰ্দ্দিকে। বথ খেকে নেমে
 অশ্বানোহণে চুটিলেন মন্তুলিকা পাৰ্ণভা গোপন পথে সীমান্তের অপর পারে যোগন্ধরায়ণকে
 সংবাদ দিতে। যোগন্ধরায়ণের আদেশে পতিগেনা কুমণ্ডং সহর গিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত
 হলেন। অবন্তীৰ সেনাপতি চান রাজকমারীর মুক্তি—অনাথা, যুদ্ধ। ইতিমধ্যে গোপানক
 এসে পড়েন। বাসবদত্তাকে তিনি ফিৰে চান না—তবে একাটি সৰ্ত্তে,

Only one claim Avunthy keeps;
 My sister shall sit throned thy only Queen,—
 Which, pardon me, my eyes must witness done
 With honour to our name.

বৎস উদয়ন দুই রাজ্যের মধ্যে এই শান্তির প্রস্তাব মানিলে গ্রহণ করলেন। বিকৰ্ণ থাকলেন
 কোশাধীৰাজের পাথে—নব নব দেশ দেখা এবং মহত্তর অভিযানে অংশ গ্রহণের আশায়—

I have done my will, I have observed the right.

...

And I shall see new countries...

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে কালিদাসের বিচার

ঐক্যবিলম্ব

যে কালিদাস আমাদের ভারতীয় সভ্যতার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রতীক ও প্রতিভা, যার বহু দিক বহু বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়, সেই কালিদাসকে ব্যাস বাল্মীকির চেয়েও সম্ভবত কম জ্ঞানি। মনে হয় তিনি মালবদেশীয়—তবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তাঁর জন্ম মনে হয় রাজধানী উজ্জয়িনীতে নয়, সম্ভবত মেঘদূতে বর্ণিত কোনো গওগ্রামে। পরে তিনি রাজধানীতে এসে বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করেন। বিক্রমাদিত্য ঋগ্-ভ্রমের পূর্ণতত্ত্বের মাঝামাঝি মালবদের বিক্রম সংসার প্রবর্তন করেন। বাহ্য প্রমাণ কিছু নাই, তবে কাব্যের উপাদান থেকে তাঁর চরিত্র, তাঁর গুণাগুণ ও মনোভাবের একটা ধারণা করা সম্ভব। অনেক ব্রহ্মশ্রিত সরস গল্প শোনা যায় তাঁর সম্বন্ধে—সেগুলি প্রায়ই উদ্ভট এবং তাদের নিঃসংশয়ে বর্জন করা চলে। কাব্য-প্রাপ্তদের বাহিরে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস আমাদের কাছে তিনটি উজ্জ্বলতম নাম—ঊধু নামই, তার বেশি কিছু নয়।

এ অবশ্য এক মহা সৌভাগ্যের কথা। যদিও আমাদের মধ্যে প্রাকৃত মানুষটি এই শূন্যতা সম্পর্কে বিদ্রোহ জানায়—কে কালিদাস, কবি-প্রকৃতির অতিরিক্ত তাঁর মানুষ-প্রকৃতিটি কি, যে রাজার অনুগৃহীত ছিলেন কবি সে-রাজাই বা কেমন, তাঁর বন্ধু কারা, কারা তাঁর বিরোধী—তাদের সঙ্গে কেমন তাঁর সম্পর্ক, কল্পনায় যেমন বাস্তবিকও তেমনি তিনি সুরা ও নারীর প্রতি আসক্ত কি-না, কোন্ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁর রচনা, কারা তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে—প্রাকৃত মানুষ এই সব জ্ঞানতে চায়। আবার সৌভাগ্যের বিষয় ঠিক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধেই আমাদের অভ্রতা সম্পূর্ণ। অবশ্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি বেশ চিন্তাকর্ষক, তার নানা সুবিধাও আছে—যাদের মুক্যদৃষ্টি এবং সাহিত্যিক বিচারবোধ নেই বিশেষ করে তাদের পক্ষে কবির রচনায় কয়েকটি দিক বুঝবার জন্য। মানব-মনের রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে এর অবদান কম নয়, কিন্তু কাব্যরসাস্বাদনবৃত্তিকে এ উদ্ধৃক বা সন্মুক্ত করে না; এতে কবি-মানুষটিকে বুঝবার সহায় হয়, তাঁর কাব্যের যেটুকু বাহ্য মানষী ব্যক্তির আশ্রিত সেটুকু বুঝবার সহায় হয়, তবে পূর্ণ কাব্যের নিহুঁত রূপ ও মূল্যটি নির্ণয়ের পক্ষে তা অন্তরায়ই। ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমর্থকরা গাড়ীর পিছনে ষোড়া জুতে দিয়েছেন, তারপর দুই যষ্টীখণ্ডের

মধ্যে নিজেৱা স্থান নিয়ে গাড়ী ও ষোড়া টানবার নিরর্থক বীরস্বাভক পণ্ডিত করছেন। যে মনোযোগ কাব্যের উপর পড়া উচিত, তাঁর ত্য দাবি করছেন কবির উপর। প্রথমে সাহিত্যিকের সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ করব, আমার নিজের কাছে তার কি মূল্য তা বিচার করব, কাব্যের শাশ্বত প্রকৃতি ও ধর্মের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা পরীক্ষা করব, তারপর দেখতে পারি—না, সে-সেখা অনিবার্য—কানন, জ্ঞানত চেষ্টা না করলে ও অজ্ঞাতসারে তা মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে—তাঁর নিজেরই প্রদত্ত উপাদান দিয়ে তাঁর কি কবি-ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। এই রকমেরই গ্রহণ ও আকর্ষণ করার উপযুক্ত কবি-ব্যক্তিত্বরূপটি ধরা দেবে, আমাদের কাছে মূল্যবান বস্তুখানি তাঁর ঠিক ততখানি অংশ। শেক্সপীয়রের যে-ব্যক্তিরূপ নথিপত্রে লেখা এবং সমসাময়িকদের কাছ থেকে পাই তা ইতিহাসের উপাদান, তাঁর কাব্য উপভোগ করার পক্ষে তার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের বুদ্ধি এবং প্রকৃতি বুঝবার পক্ষে তা আমার কাছে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু 'সানটেক' কিংবা 'সনেট'-সমূহ পাঠের সময়ে তা আমার কাছে আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। অধিকন্তু প্রায়শ তা পাঠক এবং কাব্য কবির যথার্থ আনন্দপ্রকাশের মধ্যে অন্তরায় হয়ে ওঠে—কানন, মূলকর্ম কল্যাণ গভীরে নিয়ে যায়, কল্যাণ মানুষের শারীর ও মায়বিক সত্তা ছাড়িয়ে যায় আর বাণী নিয়ে যায় মনের অন্তরনহলে, যুক্তিবুদ্ধির মণিকোঠায়, তার যে সত্যকার অংশ নির্বাচন ও গ্রহণ করে চলে সেখানে। আমার মধ্যে বাচন পণ্ডিত-মুনা ব্যক্তি যে সেই এ কথা জানা অপরিহার্য মনে করে যে সনেটগুলি উইলিয়াম হার্বার্ট, হেনরি রিওথেন্সলী কিংবা উইলিয়ামের নিজের কাছেই লেখা যার প্রেমে দারুণ আবিষ্ট কে সে ক্কা নারী—মেরী ফিটন, আর কেউ অথবা একেবারেই কল্পনার মানসী তাঁর ভাষা কোনো ধনী পরিপোষকের গুণগানে উচ্ছাসোক্তি কিংবা সত্যকার আবেগপূর্ণ বাণী-নিষ্কাশ। কিন্তু আমার মধ্যে সত্যকার কাব্যপিপাসু এ-সবের তোয়াক্কা করে না। একথা ঐতিহাসিক সত্য হতেও পারে যে এসব কবিতা লিখতে বসে শেক্সপীয়র সে-যুগের কৃত্রিম এবং স্বাভাবিকতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেই চেয়েছিলেন। তা যদি সত্যই হয় তবে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের পূর্ব উচ্ছসিত হওয়া চলে না। তবে আসলে এ তো তাঁর বিরাট অন্তরায় শারীর ও মায়বিক খোলসটি মাত্র—ভারতীয় ভঙ্গিতে বলতে গেলে, তাঁর অনুময় ও প্রাণনয় সত্তা। কিন্তু তাঁর মন এবং অন্তরায়—যা আসল শেক্সপীয়রের পরিচয়—রচনার সময়ে প্রকাশমান প্রতিটি ভাব প্রতিটি আবেগম্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করেছে, নিখুঁত-ভাবে আনন্দদান করেছে আনন্দের প্রতিটি রসবিন্দু, দীর্ঘ্য ও হতাশার মৃত্যুশীতল স্পর্শ, উদার মহৎ নানা ভাব, নারকীয় বীভৎস আশ্রয়, আর যেহেতু এসব তিনি অনুভব করেছিলেন তাই এমনভাবে তাদের প্রকাশ করতে পারলেন যে বিধুমানব তা থেকে 'আনন্দে করিবে পান সুখ নিরবধি'। আবেগ রয়েছে মানুষটির অন্তরায়—একটা সক্রিয় শক্তি-হিসাবে হোক

কিছা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে হোক, তাতে কিছু এসে যায় না—যার সেই জন্যই তা হয়ে উঠেছে তার কবিসত্তার অচ্ছেদ্য অংশ। সেক্ষেত্রে এই তথাকথিত ঐতিহাসিক তথ্যকে যদি এই কবিপুরুষ এবং আমাদের মানসগানে এসে দাঁড়াতে দেই তাহলে যে-সব ভাব নিয়ে সনেটগুলি পড়া উচিত, যেমন, প্রশংসা, আনন্দ, মহানুভূতি, প্রাণাবেগের মধ্যে দিয়ে আত্মোপলব্ধির চেষ্টায় ব্যাপ্ত আত্মার প্রতি আবির্ভাব যে-সব বিপর্যস্ত করে দেয় একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণা, অস্তত সেই লোকটির প্রতি এক অনুকম্পা এই জন্য যে এমন অন্তরাঙ্গার মানিক হয়ে তার শক্তিকে সে নেহাৎই নিজের দৈহিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। সভ্যতার শেক্সপীয়রকে উপলব্ধি এবং তাঁর কাব্যরসসম্ভোগ এই বকনে নিরর্থক ও নির্দুর্ভাবের ব্যাহত করা হবে। ‘মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক’ নভাদের এই হল মূলগত ক্রটি। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে মানুষ ভাঃ জনসন, সেজন্য বসওয়েল লিপিত তাঁর দৈনন্দিন কথা-বার্তা আমাদের কাছে তাঁর সত্যতা-রচনার চেয়ে বহুগুণে মূল্যবান; মানুষ বায়রণ তাঁর কাব্যে এবং চিঠিপত্রে উভয়ত্র আত্মপ্রকাশ করেছেন, স্বতরাং দুটিই পড়তে হবে। একান্ত স্নায়বিক উত্তেজনার যা, যা প্রকৃতির নিম্নতম পর্যায়ে, তা-ই শুধু স্থূলকর্মের মধ্যে ধরা পড়ে। মহা-কবিদের পক্ষে তাঁর অনায়াস ও নিখুঁত শিল্পপ্রকাশ হল অন্তরাঙ্গার অনুপ্রেরণায়—সেই শিল্পের মধ্যেই তাঁদের পরিচয়, সম্পূর্ণ পরিচয়, স্থূলকর্মের মধ্যে দিয়ে কোনোরকমে বিকৃত ও অসম্পূর্ণভাবে তাঁর সামান্য আংশিক পরিচয় নয়। এই পার্থক্যের দরুণ মহাকাব্যের মহাচরিত্রেরা নাটকের প্রধান চরিত্রের তুলনায় আমাদের কাছে এতই একান্ত দূরের অপরিচয়ের ভিনিস। কালিদাস যেমন মহাকাব্যের কবি তেমনি আবার নাট্যকার। তবু তাঁর শিব এবং পার্বতী অনবদ্য, চিত্রাপিতবৎ; আর দুমন্ত, শকুন্তলা, শার্ঙ্গব, প্রিয়ম্বদা, অনুগূয়া, পুরুষবা, উর্বশী, চিত্রলেখা, ধারিণী, ইরাবতী, অগ্নিমিত্র জীবন্ত মানুষ, আমাদের এত পরিচিত, বন্ধুজন। এই পার্থক্যের মূলে আত্ম-প্রকাশের পক্ষে ভাষণের গুরুত্ব এবং সেই তুলনায় ক্রিয়ার ন্যূনতা—ক্রিয়া বা কর্ম থাকবে শুধু ভাষণের সমর্থক ও পরিপোষক হিসাবে। যে দুটি মহাকাব্য নাটকীয় স্বষ্টির মতো রচনার মধ্যে আমাদের প্রতিচ্ছায়া একে ধরে তা রানায়ণ ও মহাভারত; এ দুটির শিল্পরূপ আধুনিক উপন্যাসের পদ্ধতি অনুযায়ী, যুরোপে মহাকাব্য বলতে যেমন বোঝায় সে-রকম নয়। এই দুই মহাকাব্যে নাটকীয় এবং মহাকাব্যিক পদ্ধতি মিশে মিলে গিয়েছে, এমন ছুঁটিনাটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা প্রবেশ লাভ করেছে যা উত্তেজিতস্বভাব এবং অচিরক্লান্ত যুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ্য। এইভাবে সমালোচনায় পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর গুরুত্ব ও অতিরঞ্জিত করে তোলা। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে তার মূল্য আছে; কিন্তু ইতিহাস তো সমালোচনা নয়, সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কারো থাকতে পারে বিপুল ও বিস্ময়কর জ্ঞান, তা সবেও সে হয়ত সমালোচক

হিসাবে অক্লিষ্টকর। আধুনিক কালের বিপদ এই—এখন দেখা দিয়েছে ভুরি ভুরি সাহিত্যের ইতিহাসবিদ, শিরোপরি তাদের গর্ভের বোঝা—বোঝা ঘটনার, তত্ত্বের, নত-বাদের, স্বেচ্ছাপ্রীতির; এখানে নেই বললেই চলে তেমন সত্যাকার আলোকদীপ্ত সমালোচক। যে-সব কবি সমসাময়িক কালের অনেক বা অধিকাংশ দিক তুলে ধরেন একথা অস্বত তাঁদের ক্ষেত্রে সত্য, যারা তা করেন না তাদের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক-এর (milieu) মূল্য সামান্যই। শেক্সপীয়র, হোমর বা কালিদাসের কাব্য উপভোগে যেটুকু পারিপার্শ্বিকের মূল্য আছে তা তাঁদের কাব্য থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাঁদের সময়কার ঐতিহাসিক জ্ঞান যথার্থই অনাবশ্যক ঘটনা-তথ্যে মন ভারাক্রান্ত করে তুলবে—বিচার-বুদ্ধিকে যে-সব আনুকূল্য না দিয়ে অনর্থক বিভ্রান্ত ও বিপর্গস্ত করবে। (যদি বলছি না যে এ-সব জিনিসের একটুও মূল্য নেই, বলছি যে এদের মূল্য বাহিরের ভাষা (scaffolding) হিসাবে—অট্টালিকা হিসাবে নয়)। কাব্যের চেয়ে কবিকে আশ্রয় করে, কবিকে প্রধান ও একান্ত করে ধরে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রবৃত্তি হল কবিরূপী 'মানুষ'টি থেকে তাঁর কাব্যের মূল্য ও নির্গমিতার্থ বের করা। এ পথ সাংঘাতিক। কারণ সমস্ত উৎসাহ উদ্যম এখানে পড়ে গিয়ে ঘোণের উপর, অসল স্থান পায় প্রয়োজনের বাহিরে বাহ্যিক হিসাবে। অবশ্য বলা হয় যে সৃষ্টিত মনে মানুষটি ও তার পারিপার্শ্বিকের সহস্র জ্ঞান তার কাব্যের সূক্ষ্মালোচনায় সাহায্য করবে। কিন্তু এ-ধরণের জ্ঞানের প্রকৃতিই হল আমাদের বিচারকে সাহায্য না করে বিকৃত করা—কারণ, কবিতাটি স্বভাবতই আমাদের মনের পটে যে ছবি ফেলত তাতে বাধা দিয়ে এ আমাদের মন্থণা দেয় আমাদের অজিত জ্ঞান ও মতবাদের সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যের ছবিটি দেখতে। আমাদের মতবাদ আবার নানা তথ্য-সম্পৃক্ত জ্ঞান থেকে নিষ্কাশিত, অল্পবিস্তর ভ্রান্ত্যক এবং কণ্ঠস্থায়ী। এখানে আমরা চলেছি কাব্য থেকে পারিপার্শ্বিকের আলোচনার পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক থেকে কাব্যে। আর প্রথমোক্ত পন্থাই যথার্থ। পারিপার্শ্বিকের সমস্তটাই তো মানুষটিকে প্রভাবিত করে না, আবার সকল অংশও তো সমানভাবে প্রভাবিত করে না। পারিপার্শ্বিকী কতখানি তাকে প্রভাবিত করে, কি পরিমাণে পড়ে তার প্রভাবের বিভিন্ন ধারা, তা শুধু কাব্য থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমরা জানি তরুণ এবং অনভিজ্ঞ শেক্সপীয়রের উপর মার্লো, কীড এবং অন্যান্য লেখকদের কি প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলা যেতে পারে যে প্রথম শ্রেণীর সব কবি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু কবি নিজেদের প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টার সময়ে তাঁদের চেয়ে নীচের এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অপদার্থ প্রচলিত সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবে এক অদ্ভুত রসায়নবিদ্যার গুপ্তরহস্যের বলে তাঁরা খানকি দামী ধাতুতে পরিণত করতে পারতেন, সোনাই করে তুলতেন। একচক্ষু, ক্ষুদ্র প্রতিভার অধিকারী

কবিই শুধু নিরঙ্কুশ বৌলিক হতে পারেন। সাহিত্যে ইতিহাস হিসাবে, মনস্তত্ত্ব হিসাবে, বুদ্ধির প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে এ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে তাতে আমাদের লাভ কি? আমরা উপভোগ্য বস্তুটি এবং আমাদের মধ্যে অনর্থক এনে ফেলেছি নাকি? ও কীভাবে প্রেতমুর্তি, আমাদের অন্তরাত্ম্য পড়ছিল যে-ছবি তাকে আঁকি ও অস্পষ্ট করে তুলেছি। এখন যদি ঠিক পথে চলেতে চাই তবে প্রথমে এই প্রেতমুর্তিদের দূর করতে হবে, শেক্সপীয়রের একেবারে সম্মুখে দাঁড়াতে হবে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি আবার নিয়ে চলে বিভ্রান্তির মধ্যে। এর নাম আশ্রয় করে দেখা দেয় অজ্ঞাতকুলশীল ইন্প্রেশনিজম্, কখনো কখনো সাহিত্যিক অসামান্যতা, বড় হোর একটা নিষ্ঠুর উদারতা। কেউ এলিজাবেথী যুগ অনুধাবন করে তার ইতিহাস বিকল্প মহিমার উপর মনোবশে বসে, তার চক্ৰ ও দারুণ অসামান্য উপর মহানুভূতির ফলে, তার অপরাধ খাদ্যযুক্ত দামী পাখর, মণিযুক্ত এবং নকল রত্নহীরার বারোয়ারী নিশ্চয়ের উপর অনুরাগের দরুণ। এলিজাবেথী যুগের এসবই আমাদের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে সমালোচকের উদ্দেশ্য প্রথমেই অসাধু। কারণ তিনি বলছেন তাঁর প্রশংসা পঠন ও অনুধাবনের উপর ভিত্তি করে, অথচ কার্যত তাঁর পঠন ও অনুধাবনের উৎপত্তি, আশ্রয় ও লক্ষ্য এই প্রশংসাই। কেউ আবার পাঠ ও অনুধাবন করেন কর্তব্য হিসাবে, তিনি প্রশংসা করেন তাঁর জ্ঞানমণ্ডকে গৌরবান্বিত করতে। কারণ তিনি সব পড়েছেন, সব বুঝেছেন, আর সেই জন্যই সবার উপর তাঁর দরদ দেখাতে হবে—নতুবা তিনি যে সব বোঝেন তার প্রমাণ কোথায়? কারো চরিত্র এবং কর্মের মূল্য বুঝতে হলে তার উপর খানিকটা মহানুভূতি ও অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। অনুরাগহীনতা অর্ধেক দৃষ্টি, উদাসীনতা অন্ধ। এরই পরিণামে এত ভ্রান্তিকর সমালোচনা যা সাধারণের বুদ্ধিকে পথঘাট করেছে, সমালোচনার মানদণ্ডে এনেছে এত বিশৃঙ্খলা, যাটয়েছে সাহিত্য-মুদ্রার মূল্যহীনতা—অবশ্য সরল ইন্প্রেশনিজম্দের ক্ষেত্রে এর থেকে আমরা নিরাপদ। সত্য কথা বলতে গেলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি কার্যকরী তাদেরই পক্ষে যারা নিকটতর দরের শিল্পী—বাণীশিল্পের পরমতম ঐশ্বর্য নেই বলে তাদের শিল্পের চেয়ে তারাই বেশি চিত্তাকর্ষক। এখানেও সাহিত্যে অসংখ্য তুচ্ছ নাম অধোক্তিক এবং প্রায়শ অর্থহীন অতিস্তুতি পেয়েছে, তারা অনেকে ‘আবিষ্কার’—অর্থাৎ হাল আমলের সমালোচনার অভিশপ্ত ফল।

বস্তুত ঐতিহাসিক পদ্ধতি হল বিজ্ঞানের দ্বিধাত্ম্য খুর—স্বকৌশলে সে কাব্যের সুরমা উদ্যানে এসে ঢুকতে চায়। একথা অবশ্য আমি বিজ্ঞানের অপমান হিসাবে বলছি না। শয়তানও ভদ্রলোক—শেক্সপীয়র নিজেরই তাকে সম্মান দেখিয়েছেন। বোধ হয় তারও বেশি তাঁর মর্যাদা—অতি প্রয়োজনীয়, এমন কি, অপরিহার্য ব্যক্তি তিনি। তেমনি বিজ্ঞানও

বুদ্ধির নীনাঙ্গনে কেবল একাটিনাত্র সঙ্গ্রামী শাখা নয়,—যখন সে পরিহার করেছে জীবন্ত প্রাণী কেটে কেটে দেবতার স্তম্ভ প্রবৃদ্ধি,—সে আবার একটি আবশ্যক ও অপরিহার্য শাখা। তবে শয়তানের যেমন স্বর্গে স্থান নেই, তেমনি কাব্যের নন্দনবনে বিজ্ঞানেরও কোনো প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের কাজ তথা সংগ্রহ করে তার থেকে একটা সাধারণ সূত্র বের করা। ক্ষুদ্রতম জিনিস যেমন মহত্তম জিনিসও তেমনি তার কাছে সমান মূল্যবান, যেমন ফুল তেমনি আগাছা, দুর্গন্ধযুক্ত ভূমিনিবন্ধ মৎকুণ যেমন তেমনি দেবদূতের চেয়ে সামান্য নিকৃষ্ট মানুষজীবী। সমালোচনায় এই পদ্ধতির প্রবর্তন করে আমরা ঘটনাবাহিনীর দ্বারা নিজেদের ভারাক্রান্ত করছি, সাহিত্যের ক্ষেত্র দারুণ জনাকীর্ণ করেছে সেই ঐতিহাসিকের কাছে অল্পবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ না-ভাল-না-মন্দ শিল্পীদের দিয়ে—এঁরা যেমন নীরস তেমনি নিস্ত্রাণ, এঁরাই একদিন দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের মনে করতেন 'সাহিত্যিক প্রতিভা' বলে। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস যেমন ব্যক্তিগত প্রতিভাকে তলিয়ে দিয়েছিল ধারাপ্রবাহের মধ্যে, তেমনি এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির চেষ্টা ব্যক্তিগত কাব্যকে কোনো একটা প্রবণতা বা ভঙ্গি-প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে। ফল হল আধুনিক কবিরা নিজের দৃষ্টির সামনে আদর্শ হিসাবে সে-সব চিরন্তন ভাব ও চিন্তা যা মানুষকে উত্তেজিত করে না রেখে প্রকাশ করতে চায় নানান প্রবণতা, সমস্যা, বাস্তবতা, রোমাঞ্চকরতা, রহস্যময়তা, আর সেই সঙ্গে যত স্থানকালাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী বিকৃত অহুস্হতা যার সঙ্গে কাব্যের কোনো সংঘর্ষ নেই। এ হল অধোগামী রোগ-গ্রস্ত যুগের লক্ষণ—নিজের অপাচ্য বিদ্যার ভার সে বয়ে চলেছে শুকপাণ্ডিত্য এবং আলেকজান্দ্রিয়ানীর মধ্যে, স্ট্রির সরস উৎসধারাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেরই বক্ষ্যাব 'ও মৃত্যুকে ডেকে আনছে। যে যুগে রোডস এবং সিমোনিডেসের (Rhodes and Simonides) ক্যালিমেকাস এবং আপোলোনিয়াস (Calimachus and Apollonius) হলেন হোমর আর যে যুগে টেনিসন হলেন শেক্সপীয়র এবং রাডিয়ার্ড কিপলিং নিলটন—সেখানে উভয়ের মধ্যে একটা দুর্লক্ষণযুক্ত মিল রয়েছে।*

* Kalidasa (Second Series) থেকে অনুবৃত্ত।

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

১

যোগ ও জীবন

যোগ আর জীবন আলাদা নয়, বা যোগের সাধনা জীবনে একটা খাপছাড়া ব্যাপার নয়। উনার উপস্যার মতই বিশ্বপ্রকৃতিতে চলছে একটা অখণ্ড মহাযোগের সাধনা। প্রকৃতি শিবাভিসারিণী। একটা পরম সত্য তার সত্তার গভীরে বীজের মত নিহিত রয়েছে, তার সার্বিক রূপায়ণ ঘটানোই তার দায়। আমাদের জীবনের মর্মেও এমনিতর একটি বীজ-ভাবের প্রেরণা আছে, আমরা ভাবে ও কর্মে তাকেই রূপ দিয়ে চলেছি। কিন্তু চলেছি অর্ধ-অচেতন হয়ে, মগ্ন হয়ে। জীবনের গভীর লক্ষ্য সম্পর্কে যদি সচেতন হই, চিত্তের বিকশিত শক্তিগুলিকে যদি তার অনুকূলে সংহত এবং একাত্ম করি, তাহলেই আমাদের জীবনের সাধনা প্রাকৃতভূমি হতে উদ্ভাবিত হয় যোগভূমিতে।

মুখ্যত যোগজীবন অস্ত্রজীবন, কিন্তু তাবলে বহির্জীবনের প্রতিষেধ নয়। বস্তুত অস্ত্রের-বাইরে কোনও একান্ত বিরোধ নাই। প্রাণের ধর্মই হল অস্ত্রের গভীর সত্যকে বাইরে রূপ দেওয়া। প্রাকৃতভূমিতে জীবনের যে-রূপ বাইরে ফুটেছে, তা-ই তার সবখানি নয়। নয় বলেই গাছপানার মত পশুপাখির মত মানুষের জীবন অভিব্যক্তির একটা নিটোল পূর্ণতায় পৌঁছয় না। ঋগ্বেদের ঋষির ভাষায়, 'সে মানুষ হতে মানুষে আরোহণ করে চলে, আর দেখতে পায় তার কত করবার আছে।' এই করাটা কেবল বাইরের করা নয়, আসলে তা ভিতরের করা। অস্ত্রের তাগিদেই আমরা বাইরে এত উপকরণ স্তুপাকার করে তুলি। যদি ভিতরে না ভুবেতে পারি, উপকরণ জড়াল হয়ে ওঠে। আবার মতই গভীরে যাই, ততই দেখি বাইরটা গুছিয়ে আসছে। এই ভিতরে যাওয়াটাই হল যোগ; আর ভিতরের শক্তিতে বাইরের প্রশাসন, তার মধ্যে ঋতচক্রের আবির্ভাব ঘটানো হল যোগের বিভূতি বা ঐশ্বর্য। অস্ত্রের চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা আর বাইরে বিভূতির উল্লাস, দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। এই সত্যই চেতনার মৌলসত্য, শিব-শক্তির সামরস্যের সত্য।

জীবন বিচিত্র, তাই যোগের সাধনাও বিচিত্র। অথচ এই বৈচিত্র্যের গভীরে একটি এককের সূত্র আছে। জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ এক অখণ্ড মহাপ্রাণের বিভূতি। তেমনি বিভিন্ন যোগসাধনা এক অখণ্ড মহাযোগেরই বিস্তার মাত্র। অস্ত্র:প্রকৃতির ষোল্ল যেমন বিশেষের পুষ্টির দিকে, তেমনি আবার সমস্ত বিশেষকে একটি অখণ্ড সমগ্রতার মাঝে গুটিয়ে আনার দিকেও। এমনি করে প্রকাশ পায় একের ঐশ্বর্য। বনস্পতির প্রাণ শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে—এটা তার বাইরের দিক, বিভূতির দিক। কিন্তু তার সম্ভার গভীরে চলছে এক অখণ্ড রসেরই লীলা। যোগের বৈচিত্র্যও তেমনি এক মহাযোগেশ্বর পুরুষোত্তমেরই ঐশ্বর্য-যোগের উন্মেষ। ভারতবর্ষ গীতায় একবার তার পরিচয় পেয়েছে।

বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যকে সমন্বয়ের মাঝে স্ফুটন আর পরিপূর্ণ করে তোলা যেমন প্রকৃতির একটা রীতি, তেমনি তার আরেকটা রীতি হচ্ছে মূর্খ অতীতের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার দ্বারা তার রূপান্তর ঘটানো। এই নতুন গভীরতম শক্তি আসে উর্ধ্বতর চেতনা থেকে, যা প্রকৃতির মাঝেই এতদিন প্রকাশের প্রতীক্ষায় উন্মূখ হয়ে ছিল। ভাগবত-যোগ তার বৈবস্ম্যত দীপ্তি হারিয়ে ন্যূন হয়ে পড়েছিল। গীতায় তার মাঝে নতুন তেজ সঞ্চার করা হল। সে শুধু অতীতের সমাহার এবং সমন্বয়ই নয়, একটা নতুনতর পৌরুষেয় শক্তিপাতও। তারপর বহুযুগ পার হয়ে গেছে, মানুষের চেতনায় আবার এসেছে একটা মনুষ্যের লগ্ন। আবার এক পৌরুষেয় শক্তিপাতের দ্বারা যোগসমন্বয় ঘটানো তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—ভারতবর্ষের যোগসাধনার মোটের উপর এই পাঁচটি শাখা। পাঁচটি শাখা, কিন্তু তাবলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। আসলে তাদের মাঝে জীবনের শক্তিবৈচিত্র্যের একেকটি দিক অনুশীলনের ফলে চরমে উঠেছে। এই প্রাকৃত জীবনীশক্তিই যোগশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে উপায়-কৌশলের ফলে। আনন্দের সৈন্দন্দিন ব্যাবহারিক জীবনেও কিছু-না-কিছু যোগশক্তির প্রয়োগ আমরা করেই থাকি—অজ্ঞাতসারে। সেই শক্তিগুলোকে চিনে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহায়ে তাদের অনুশীলিত ও সংস্কৃত করেই এদেশে যোগশাস্ত্রের পত্তন হয়েছে। বস্তুত যোগের সাধনা একটা বৈজ্ঞানিক সাধনা, আকাশে তার ফুল ফুটলেও মূল রয়েছে মাটিতেই। যোগের একটা মুখ্য সাধনা হল কালসংকেপ। প্রকৃতির পরিণাম চলে নহর গতিতে, একটা শক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে সে অসম্ভব সময় নেয়। যোগী কৌশলে সেই শক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় করে তোলেন। আবার কৌশলটা তিনি আবিষ্কার করেন প্রকৃতির মাঝেই। অপরা-প্রকৃতিতে যা অশ্ফুট, পরা-প্রকৃতির উপাস্তে হয়তো তার একটু স্ফুটনের আভাস পাওয়া

গেল। যোগী সেইটুকু ধরেই পরা-প্রকৃতিকে সোহন করে শক্তিকে জীবনে নানিয়ে আনলেন। স্তূতরাং যোগ একটা অপ্রাকৃত বা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যোগবিদ্যার ইতিহাস আনোচনা করলে তার দুটি ক্রটি দেখতে পাই—যার জন্য আমাদের নতুন করে যোগসমন্বয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য ক্রটিগুলি দেখা দিয়েছে জাতীয়-চেতনার অবক্ষয়ের ফলে। প্রথম ক্রটি হল, অনুশীলনের আত্যন্তিকতার (exclusiveness) ফলে অথও যোগসাধনার মাঝে বিরোধ ও ঝগড়ার আবির্ভাব। এই বিরোধ কৃত্রিম, জীবনে তার কোনও গায় নাই। জ্ঞান আর ভক্তিতে বিরোধের কথা আমরা সবাই জানি। অথচ তত্ত্ব প্রাকৃত-জীবনের কারবার চলে শুধু মস্তিষ্ক বা শুধু হৃদয় নিয়ে নয়—দুয়ের সৌম্যন্য এবং সমাহারে। চেতনার দুটি মৌলবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমরা দুয়ের মাঝে যদি একটা বিরোধের সৃষ্টি করে বসি, তাহলে বুঝতে হবে সাধনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আরেকটা ক্রটি হল, জীবনের সঙ্গেই যোগের একটা বিরোধ আছে—আমাদের মাঝে এমনিতর বন্ধনুল একটা সংস্কার। যোগে চেতনার উত্তরণ ঘটে—এটা তার মৌল ধর্ম। কিন্তু সে যদি মহাশূন্যে হারিয়ে যায়, আর পৃথিবীতে না নেমে আসতে চায়, তাহলে তার সাধনা একাদমী হল। স্তূত প্রাকৃত-জীবনেও এর কোনও গায় নাই। অন্তরে-বাইরে, ভাবে-কর্মে সেখানে কোনও আত্যন্তিক বিরোধ নাই। যোগজীবনেই-বা সমাধিতে বাঁধানে বিরোধ থাকবে কেন? যোগস্থ হয়ে কর্ম করাই-বা অসম্ভব হবে কেন?

এই দুটি ক্রটির সংশোধন হল যোগসমন্বয়ের একটা সাধারণ অভ্যুপগম। গোড়াতেই জানতে হবে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যোগের সহায়ে জীবনের সমগ্র অনুশীলন এবং শিবাভিসারিণী মহাপ্রকৃতির অকুণ্ড হৃদোনুর্ভবন।

২

প্রকৃতি-পরিণামের তিনটি পর্ব

অতীতে যোগের সাধনা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। জীবনের একেকটি বৃত্তিকে ধরে যোগীরা অনুশীলন দ্বারা তার চরম উৎকর্ষ ঘটাতে চেয়েছেন। তাইতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, সাধন-জীবনে দেখা দিয়েছে নানা মত ও পথের বিরোধ। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি একটি অথও সত্যেরই বিভূতি। সে-সত্য আদিতে অব্যক্ত, অস্তেও অব্যক্ত—এই দৃষ্টিতে তা অষ্টৈত। একটি জড়ের অষ্টৈত, আরেকটি চেতনার। কিন্তু দুটি অষ্টৈতের মাঝে

বৈতের বিচিত্র লীলা, তারই নাম জীবন। জড়ের অধৈত হতে চেতনার অধৈতের পানেই যায়, অথবা চেতনার অধৈত হতে জড়ের অধৈতের পানেই নেমে আসি, মাঝখানকার এই বৈতলীলাকে অস্বীকার করবার উপায়ও নাই, প্রয়োজনও নাই। বরং অধৈতের আলোতে বৈতের লীলাবৈচিত্র্যের আশ্বাদনেই অনুভবের পূর্ণতা—কেননা সবকে নিয়ে, সবাইকে জড়িয়ে অধৈতের যে-সৌন্দর্য্য, তা-ই সত্তার সত্য। জীবনে সেই সত্যেরই অভিব্যক্তি।

অভিব্যক্তি ঘটে কালে। তার মধ্যে পর্বের ভেদ আছে। একটা পর্ব অক্ষুট, তার পরের পর্বটা ক্ষুণ্ণিতর—এরই নাম অভিব্যক্তি। আসলে ওটা প্রাণের ধর্ম, জড় তার বনিয়াদ। জড় ঐ আদিম অব্যক্ত, যার কথা আগে বললাম। জড় জড় থাকে না চিরকাল, সে-খাকার কোনও অর্থ নাই। জড়কে ভিঙি করে কোটে প্রাণ। প্রাণ শক্তিরই একটা বিভঙ্গ। জড়ের আপাতলক্ষ্যহীন অন্ধশক্তিতে একটা লক্ষ্যের আভাস দেখা দিল, এখানে শক্তির সংজ্ঞা দিতে পারি 'প্রাণ'। লক্ষ্যের আভাস যখন আরও স্পষ্ট হল, তখন দেখা দিল 'মন'। মন বোঝে, প্রাণ অতীত বোঝে না,—এই হল দুয়ের মৌলিক তফাত। কিন্তু মন অশক্ত, বুঝেও সে অনেক-কিছু করতে পারে না। তার নাথ্যে স্বরাট শক্তির আবির্ভাব যখন হয়, তখন দেখা দেয় 'চিৎ' (Spirit)। এইখানে শক্তির পূর্ণতা। এই পূর্ণ শক্তিকে পাবার সাধনাই হল যোগ। অভিব্যক্তির মূলে এই যোগের প্রেরণা। প্রকৃতি স্বরূপত যোগিনী। সে মূনময়ী, হতে চাইছে চিন্ময়ী। এইটাই যোগ, এইটাই জীবন।

চিৎশক্তির দুটা দিক আছে—একটা বিবিধ স্বরূপস্থিতির (self-poise) দিক, আরেকটা শক্তির দিক। বিবিধ না হয়ে, নিজেকে শক্তিপরিমণ্ডলের বাইরে না নিয়ে শক্তির সার্থক প্রয়োগ করা যায় না। এই বিবিধভাবেটা নির্বর্ণ, অথচ তা বর্ণবৈচিত্র্যের উৎস। যখন সে নির্বর্ণ, তখন তাকে বলতে পারি অব্যক্ত। এটাই হল অস্তিম অব্যক্ত। যখন আদিম অব্যক্ত থেকে অস্তিম অব্যক্তের দিকে যায়, তখন তাকে মনে হয় প্রলয় বা শূন্যতা। কিন্তু সেই শূন্যতা হতেই আবার শক্তি উঠলে পড়ে। একটা উত্থানের দিক, আরেকটা ভাটার দিক। দুটাই যোগশক্তি। একটার লক্ষ্য মোক্ষ—প্রাচীন যোগ মুখ্যত একেই পরমার্থ বলে ধরেছে। আরেকটার লক্ষ্য হল সৃষ্টি—শূন্যকে দোহন করে শক্তির উৎসারণ। এটাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। মোক্ষ সেখানে পরম পুরুষার্থ নয়, প্রথম পুরুষার্থ। জীবকে হতে হবে শব নয়, শিব।

উত্থান-ভাটা দুটি ধারার কথা বলেছি। আসলে দুটি বিপরীত ধারা নয় কিন্তু। কেবলই উত্থান বা কেবলই ভাটা, এটা প্রকৃতির দম্ভের নয়। তার শক্তির ক্রিয়া হয় দম্বকে-দম্বকে। তাই জীবনে উত্থান-ভাটার একটা ছন্দ চলতে থাকে। উজ্জিয়ে যাওয়াটা হল প্রাণের আদিম প্রেরণা, জড়ের বিরুদ্ধে তার সবল প্রতিবাদ। কিন্তু ভাটার চানে আবার

তাকে নেনে আসতেই হয়। এই নেনে আসাটা শক্তির অবসাদ হবে না বিসৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করে উজ্জিয়ে গিয়ে চেতনা স্বচ্ছ হয়েছে কিনা তার 'পরে'। চেতনার চাইতে জড়ের আকর্ষণ যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ অবসাদটাই নেনে হয় স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু তারও মধ্যে চিং-শক্তির সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলতে থাকে। একটু সে জোর ধরলে পরেই দেখা দেয় বিসৃষ্টি। তার মধ্যে নিবৃত্তির একটা নিন থাকে, যা হয় বিসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। যোগশক্তি একেকটা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিসৃষ্টির উল্লাসে উপচে পড়ছে। উপচে পড়ছে কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না, উজানমুখী একটা নিন তিতরে থাকছেই। আবার সে আরেক ভূমিতে উঠেছে, তারপর স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্ঘে উপচে পড়ছে। উজান-ভাণির মধ্যে এমন চলছে একটা চন্দের দোলা।

স্বপ্রতিষ্ঠার ভূমি থেকে আবার সহজের আনন্দে নেনে আসা অবরভূমির রূপান্তরের জন্য। রূপান্তর হল নিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি। জড়ের মধ্যে প্রথম বন্ধন প্রাণের উদ্ভব হল, তখন সে কত অসহায়, কত দুর্বল। অবসাদ আর মৃত্যুকেই তখন নেনে হয় তার চরম নিয়তি। অশচি ভড়শক্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার মাঝেও সে যে কি করে টিকে থাকে, সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। নেনে হয়, তার মধ্যে এমন-একটা কিছু আছে, যা জড়ের চাইতেও বড়, যা অজর এবং অবসাদ। একটু স্বপ্রতিষ্ঠা হয়েই জড়কে সে আয়সাং করতে শুরু করল, জড়ের মধ্যে সংক্রান্তি করল প্রাণের ধর্ম, তাকে করল তার আত্মপ্রকাশের বাহন। তখন, যেখানে বৈধম্য ছিল, সেখানে দেখা দিল সৌধম্য, ভড়শক্তির আর প্রাণশক্তির বিরোধী রইল না। নেনে হল, জড়ের গভীরেও ঐ প্রাণধর্মই লুকিয়ে ছিল, প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে সে-ই আত্ম ভেগে উঠেছে। এমনি করে প্রাণের মাঝে জাগে মন, স্বপ্রতিষ্ঠা হয়ে সে আবার প্রাণ আর জড়ের রূপান্তর ঘটায়। অভিব্যক্তির এই ধারা একটা নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় ধানিকটা উজ্জিয়ে গিয়ে স্থিতিলাভ করা, তারপরে আবার ভাটিয়ে এসে অবরভূমির রূপান্তর ঘটানো। আবার উজ্জিয়ে যাওয়া, আবার ভাটিয়ে আসা—এমনিকরে বার বার, যেপর্যন্ত না অন্তিম অব্যক্তের সঙ্গে আদিত অব্যক্তের যৌগিক সম্মিশ্রণে (fusion) ব্যক্তের অন্তরিক অকুণ্ঠ ঐশ্বর্যে ঝলমলিয়ে উঠে। এই ঝলমল জীবনই দিব্য-জীবন। আর পূর্ণযোগ তার সাধন।

মহাপ্রকৃতি চলেছে দিব্য-জীবনের অভিব্যক্তির পানে। তার তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে ঘটল দেহের অভিব্যক্তি। দেহ জড়পিণ্ড, কিন্তু প্রাণবন্ত। প্রাণশক্তি একটা নতুন আবির্ভাব। ভড়শক্তিই তার বনিয়াদ, তবুও জড়ের ধর্ম আর প্রাণের ধর্ম এক নয়। এই এক-না-হওয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি স্বোত্তরণ (self-exceeding) দিয়ে। জড় জড়ই থাকল না, তার নিরুদ্ধ শক্তির একটা উন্মেষ ঘটল, সে রূপান্তরিত হল প্রাণময় দেহে।

কতকগুলি দৈহিকক্রিয়া প্রকৃতিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল বলা যেতে পারে। ইতর প্রাণীর মাঝে দেখা যায়, নির্দিষ্ট পণ্ডীর মাৎ অধিকাংশ প্রজাতিই (species) একটা পনিপূর্ণ স্ত্রীল ডাঁড়ন গাপন করছে। ন বিশেষ করেই দেহাশ্রয়ী, প্রাণপ্রাচুর্যে শক্তিমান—কিন্তু মননশক্তি তার মধ্যে অস্পষ্ট।

প্রকৃতি-পরিণামের এই পর্বের উপর দাঁড়িয়েই দেখা দিল মানুষ। তার প্রাণবস্ত দেহে আরেকটা শক্তির উন্মেষ হল—মননশক্তি। এ-শক্তি ইতরপ্রাণীতেও ছিল, কিন্তু ছিল অস্পষ্ট। মানুষেরই মাঝে তার প্রকাশ হল স্পষ্ট। মননশক্তির এই আশ্রয়প্রকাশের প্রভাব দেহের উপরেও পড়ল, দেহ আরও সূক্ষ্মসংবেদনশীল (sensitive) হয়ে উঠল। দেহের মাঝে আছে নাড়ীতন্ত্র (nervous system), যা মুখ্যত মননশক্তির বাহন। এই নাড়ীতন্ত্র ইতরপ্রাণীর চাইতে মানুষের মাঝে বেশী পরিণত। কিন্তু সর্বজনীন ভাবে পরিণতির শেষ ধাপে এখন পর্যন্ত সে পৌঁছয়নি। এদেশের যোগপন্থা—বিশেষ করে হঠযোগ—নাড়ীতন্ত্রের উৎকর্ষ ঘটানোর উপর বেশী জোর দিয়েছে।

মননশক্তির অভিব্যক্তি হল প্রকৃতি-পরিণামের দ্বিতীয় পর্ব। এর কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে। মননশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বুদ্ধির উন্মেষে। বুদ্ধির দুটি বৌল লক্ষণ—সামান্যভাবনা (conceptual thought) আর আত্মগচেতনতা (self-consciousness)। বুদ্ধি সব মানুষেরই আছে, সব মানুষই ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে ভাবতে পারে, নিজের মননের সাক্ষীও হতে পারে। কিন্তু সবাই তা ঠিক সমানভাবে পারে না। কতকগুলি সাধারণ মনোবেগ (passion) সব মানুষেরই মধ্যে সমান, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ সবার মধ্যে সমান নয়। একটা সর্বজনীন উৎকর্ষ ঘটানোর চেষ্টা চলছে সমস্ত জগৎ ছুড়ে, তার নাম হল শিক্ষা। উদ্ভিদের শিক্ষার দরকার হয় না, পশুর শিক্ষা অল্পেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের শিক্ষার আর যেন শেষ নাই। ছোট্ট শিশুর মত তার মন চঞ্চল, এখনও সে বাড়তির পথে বলেই। সময়-সময় তার মাঝে অসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখা দেয়, আমরা তাকে বলি প্রতিভা। প্রতিভা মনপ্রকৃতির স্বোত্তরপের চিহ্ন। সাধারণের ওপারেও একটা-কিছু আছে, যা আধারে প্রকাশের পথ খুঁজছে। মাঝে-মাঝে প্রতিভার বিদ্যুৎঝলকে তা-ই দেখা দেয়। প্রমাণ হয়, মানুষের মন পরিণামের শেষ ধাপে পৌঁছয়নি এখনও, তার ভবিষ্যতের দিগন্তে একটা মহতী সম্ভাবনা উদ্ভাস হয়ে রয়েছে।

এই সম্ভাবনাকে নিয়েই দেখা দেয় প্রকৃতি-পরিণামের তৃতীয় পর্ব। তার বৌল লক্ষণ হল চিৎশক্তির প্রকাশ। যেমন দেহ-প্রাণকে ভিত্তি করে মননশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি দেহ-প্রাণ-মনকে ভিত্তি করেই চিৎশক্তির প্রকাশ ঘটবে—তাদের বাদ দিয়ে নয়। এই কথাটি মনে রাখতে হবে, কেননা এই হল প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক রীতি। মন:-

শক্তির যখন প্রকাশ হল, তখন সে দেখে আন প্রাণকে তার অনুকূল রূপান্তরিত করে নিল। তেননি চিৎশক্তির প্রকাশও দেখে-প্রাণ-মনকে তার অনুকূল করে নেবে, এইটাই প্রত্যাশিত। অনুকূল করে নেবে বটে, কিন্তু তাদের মাঝে পানিকটা বর্জন-মানর্জ ও দরকার হবে, তাদের ঠিক আগের খাতে বইতে দিলেও চলাবে না। মনও তা-ই করছে। প্রাণের দুর্বীর প্রকাশ ঘটে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে। ইন্দ্রিয়কে সংযত না করলে মনঃশক্তির স্ফূরণ হয় না, এটা মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতার সত্য। এদেশের যৌগিক শিক্ষানীতির ভিত্তি তাই ছিল ইন্দ্রিয়সংযম বা ব্রহ্মচর্য। তেননি চিৎশক্তিকেও আধারে স্ফুরিত করতে হলে দেখে প্রাণ মনের শক্তির সংযম এবং পরিশীলন দরকার। সংযম (control) মানে নিগ্রহ (repression) নয়। নিগ্রহ হচ্ছে মূর্খের অস্বাভাবিক ভবনদৃষ্টি আর আন সংযম হচ্ছে বিজ্ঞানীর স্বাভাবিক স্বেচ্ছাচরণের প্রচেষ্টা। আধুনিক সভ্যতা নিগ্রহ আর সংযমের পার্থক্য ঘুলিয়ে ফেলে সংযমের বিরুদ্ধেও জিগির তুলেছে, এটা আশঙ্ক্যের কথা। চিৎপ্রকাশ ঘটে যোগ-শক্তিতে। সংযম তার বনিয়াদ। সংযমের ফলে দেখে প্রাণ ও মনের মাঝে চিৎশক্তি প্রকাশ স্বচ্ছন্দ হবে, এইটাই যোগজীবনের লক্ষ্য।

প্রশ্ন হবে চিৎশক্তির স্বরূপ কি? উপনিষৎ থেকে তার ছবাব পেতে পারি। উপনিষৎ বলছেন, আত্মাকে ঘিরে পাঁচটি কোশ রয়েছে। সবার বাইরে অনুময় কোশ, যা অনু বা জড়শক্তি দিয়ে গড়া। এটি হল আমাদের দেহ। তার ভিতরে আছে প্রাণশক্তি দিয়ে গড়া প্রাণময় কোশ। মোটামুটিভাবে নাড়ীতন্ত্রকে প্রাণশক্তির বাহন বলা যেতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, জড়ের সঙ্গে প্রাণের তফাত যতখানি, প্রাণের সঙ্গে মনের ততখানি তফাত নাই। শক্তিক্রমের যত উপরের দিকে যাব, ততই পরস্পরের তফাতটা কমে আসবে, এই হল নিয়ম। প্রাণময় কোশেরও গভীরে আছে মনোময় কোশ। প্রাকৃত মানুষের চেতনা এই পর্যন্তই যেতে পারে। সে মনের মধ্যে ঢুকতে পারে, কিন্তু তার গভীরে আর পথ পায় না। মনের মধ্যে ঢুকেও তার চেতনার মুখ কিন্তু ফেরানো থাকে বাইরের দিকে। প্রাণ-চেতনার বুড়ুক্ষা আর জড়-চেতনার বস্তুনির্ভরতা তাকে কেবলই বাইরের দিকে টানে। মানুষের মন তাইতে চকল।

মনোময় কোশেরও গভীরে আর দুটি কোশ আছে—বিজ্ঞানময় আর আনন্দময়। এই দুটি কোশই হল চিৎশক্তির আধার। আত্মা চিৎস্বরূপ, আর তাঁর শক্তি সক্রিয় হচ্ছে এই বিজ্ঞান ও আনন্দের ভিতর দিয়ে। যোগের লক্ষ্য হচ্ছে, মনেরও গভীরে এই বিজ্ঞান ও আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করে মন-প্রাণ-দেহের ভিতর দিয়ে তাকে উৎসারিত করা।

বিজ্ঞান আর আনন্দ সবার আড়ালে রয়েছে বটে। কিন্তু সেখান থেকেই তাদের শক্তি মন-প্রাণ-দেহকে সজীবিত করছে। সর্বত্রই সূক্ষ্মশক্তি স্থূলশক্তির নিয়ামক। সূত্রাং

বুজলে পালে মনের নাথ্যেও আমরা বিজ্ঞানের ঋনিকতা আভাস পাই। বিজ্ঞানকে ধরতে পারলে আনন্দকে ধরা কঠিন হয় না।

বলেছি, মনঃশক্তি উৎকর্ষ ঘটে বৃদ্ধিতে। তার দুটি লক্ষণ—সামান্যভাবনা আর আশ্চর্যচেতনতা। এই দুটি বৃদ্ধির উৎকর্ষ ঘটতে পারলেই চেতনা বিজ্ঞানভূমিতে উদীয়মান হয়। সামান্যভাবনার দুটি স্তর আছে—একটি ইন্দ্রিয়নির্ভর, আরেকটি ভাবনির্ভর। ইন্দ্রিয়নির্ভর সামান্যভাবনা দিয়ে প্রাকৃত-মন তার খাব্যহারিক কাজ চালিয়ে যায়। সব সময় এর জন্য খুব আশ্চর্যচেতন হওয়া দরকার পড়ে না। বস্তুর স্মৃতি আর কল্পনা নিয়ে মন জ্ঞান বুনছে, ভেসে চলেছে—এ তো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটু অন্তর্ভূত এবং আশ্চর্যচেতন হলেই বস্তুর নিরপেক্ষ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাবকে তখন অনুভব হয় বস্তুর অতিরিক্ত বলে। এখন দেখছি, বস্তু থেকে ভাব জাগছে তখন দেখব ভাবেরই প্রতিবিম্ব পড়ছে বস্তুতে। এখন যেমন একটা স্বপ্নের ফুল দেখলে সৌন্দর্যের চেতনা জাগে, তখন নিরপেক্ষ সৌন্দর্যচেতনারই প্রতিবিম্ব পড়তে দেখব ফুলের উপর, পাতার উপর—এমন কি কুংসিতেরও উপর। কবির মাঝে এই ভাবদৃষ্টি খোলে, তা আমরা জানি।

এই ভাব স্বপ্রতিষ্ঠ হয় পরিপূর্ণ আশ্চর্যচেতন হতে পারলে। আশ্চর্যচেতনতার লক্ষণ হল বিষয়ের সঙ্গে একেবারে ভড়িয়ে না যাওয়া, ঋনিকতা তাকে ছাপিয়ে থাকা। তার জন্য দুটি ভিনিস দরকার—অন্তর্ভূততা আর শূন্যতা। চলছি, বলছি—কিন্তু বেহেঁশ হচ্ছি না কোনকালেই, নিজের উপর দৃষ্টিটি বেশ সজাগ আছে। আর ভিতরটা সবসময় থাকছে ফাঁকা—অনুরাগ-বিরাগের স্বপ্ন সেখানে চেউ তুলছে না। যেমন ভাবের বেলায়, তেননি চেতনার এই তটস্থতার বেলাতেও দেখি, ক্রমে দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটিছে। আমি আর বস্তুর নির্ভর নই, সমস্ত বস্তুই আশ্চর্যনির্ভর। এ আশ্চর্য অহং নিশ্চয় নয়। অহং আশ্চর্য প্রতিভূ—যেমন আমার অহং, তেননি সবার অহং। আশ্চর্য শক্তি ভাব, ভাবের প্রতিবিম্ব বস্তু। এই ধর্মনই বিজ্ঞানীর ধর্মন।

বিজ্ঞান স্বপ্রতিষ্ঠ হলে আপনা হতেই তার গভীরে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্কটা এইভাবে বোঝানো যেতে পারে। একটা চিল সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে। কিন্তু সূর্যেরও তো মাধ্যাকর্ষণ আছে। পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে একটা বিন্দু আছে, যেখানে পৃথিবীর চাইতে সূর্যের আকর্ষণ প্রবল। চিল যদি সেই বিন্দুটা পার হয়ে যায়, তাহলে সে আর পৃথিবীতে পড়বে না, সূর্যেই পড়বে। বিজ্ঞানের গভীরে তেননি স্বরূপানন্দের একটা আকর্ষণ আছে। তবে কিনা এ আকর্ষণ প্রলয়ের নয়, সৃষ্টির। অন্তর্ভূত চানটা যেমন তখন অকুরন্ত, তেননি সৃষ্টির উল্লাসও অকুরন্ত। এই হল সাবিত্রীশক্তির দম্বর—সংহরণ আর

বিচ্যুতরূপে চলছে একসঙ্গে মন পর্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, তারপর বিজ্ঞানের চিদ্-
বিন্দু, তারপর সৌর আনন্দের আকর্ষণ। বিজ্ঞান আর আনন্দ ওতপ্রোত। চিন্তনরী মহা-
শক্তির এই স্বরূপ। তাঁর মাঝে পৌঁছনই যোগের লক্ষ্য। বুদ্ধের তিনি কারণ-শরীর।
সেহ প্রাণ মন বুদ্ধি সব-কিছুরই তিনি উৎস। যাও তাঁর অবিদ্যাচ্ছন্ন, কিন্তু বিদ্যার অতী-
প্সাও তাদের মাঝে আছে। সে-অতীপ্সা বস্তুত তাঁরই আকর্ষণ। এইখানে তাঁর সঙ্গে
আমাদের নাড়ীর যোগ। এই যোগচেতনাতেই তাঁর বিজ্ঞান ও আনন্দ আমাদের মন-প্রাণ-
সেহকে অভিষিক্ত ও রূপান্তরিত করবে।

পাণ্ডির জীবন দিব্য হবে। এই হল প্রকৃতি-পরিণামের সম্ভাবিত তৃতীয় পর্ব।

[ক্রমশ]

আত্মার অসীমতা

শ্রীঅরবিন্দ

কালের সূচনারও ওপারে যা ছিলাম তা-ই হয়ে উঠেছি আমি ।
অলক্ষ্য এক স্পর্শ আমার চিন্তা ও আমার অমুভবকে করেছে শাস্ত :
প্রতিভূ মনের তৈরী সবকিছু মিলিয়ে যায়
এক শূন্য নীরব মহিমার মধ্যে ।

আমার জীবন এক নীরবতা—তাকে করতলগত করেছে কালাতীত এক :
এক শাস্ত্রত নৃষ্টির মধ্যে ডুবে গিয়েছে বিশ্বজগৎ ।
সকল বসন-ভূষণ থেকে মুক্ত আমার অন্তরাত্মা দাঁড়িয়েছে নগ্ন হয়ে;
আমার অন্তরাত্মার অনন্ত বিস্তারে
একক রয়েছে আমি ।

আমার হৃদয় অসীমের এক কেন্দ্র,
আত্মার বিপুল প্রসারের মাঝে আমার দেহ একটি বিন্দু ।
বিশ্বের বিরাট দেহ জেগে উঠেছে আমারই ছায়াতলে—
এক সর্বগ্রাসী অজ্ঞান যাকে একদিন ঢেকে ফেলেছিল ।

আমি শুদ্ধ অনাবৃত এক কণিকা-নির্মুক্ত অসীমতা,
শাস্ত্রতের সীমা অবধি সর্বত্র আমাকে প্রসারিত করে রেখেছি আমি ।*

* The Self's Infinity. অনুবাদক—সদীরকান্ত ভট্ট

প্রণাম

(উৎসব-সঙ্গীত)

নিশিকান্ত

সর্বনাশের সংগ্রামগত, অচেত, অন্ধ-শব্দরীর
সর্ষাস্তক চেতনসূর্য, বিশ্বতিমির-বিজয়ী বীর !
তোমার জন্ম-উৎসবময় অরণোজ্জ্বল এই প্রভাত
কানের করাল-কালোরে করিল আলোক-প্রবাহে আ
তোমার তপঃসিক্তির পথে মহাশক্তির অবতরণ
দিল পৃথ্বীর জাতকবন্দে চিরমুক্তির উদ্ভাসন ।

সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ, নব অবতার ধরিত্রীর ।
প্রণমি অখিল-অবচেতনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর ।

হে নব সারথি, তব স্পর্শে দুর্দম-বেগে করে গমন
বশুন্ধরার বিবর্তনের রথ-চক্রের চক্রমণ ।
নব মন্ত্রের উদগাতা তুমি, তোমার অমোঘ-মন্ত্রবল
রূপান্তরের অমৃত জালিল মথিয়া মর্ত-মর্মতল ।
নব-পন্থার পান্থ, তোমার গতি-বাঞ্ছিত মানবতায়
উপলব্ধির সুখা-সঞ্চিত নব-অমরার দীকাশ ভায় ।

সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ, নব অবতার ধরিত্রীর !
প্রণমি অখিল-অবচেতনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর ।

তুমি ভারতের সফল-সাধন, নিখিল-ভুবন-বন্দিত ;
তব অনন্ত-চুস্থনে তব জন্মনিমেষ নন্দিত ।
মহালক্ষ্মীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিত, মহেশ্বরীর মহেশ্বর,
মহাভারতীর বীণা স্বকৃত তোমারে সাধিয়া নিরন্তর ।
মহাকাল, তব চিরসঙ্গিনী প্রলয়ঙ্করী মহাকালী
নর্তনে তার তোমা'র প্রভার বজ্র-প্রপাত দিল ঢালি' ।

সমবেত কণ্ঠে : প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ, নব-অবতার ধরিত্রীর ।
প্রণমি অখিল-অবচেতনের তিমির-দানব-বিজয়ী বীর ।

অন্তরালে

ত্রিবিম্ব

আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্থরে,
রেখে না আবারি' আধার-কুহেলি অমলিন-অস্থরে।
তোমারি পরশ মোর সবিতার
অবিকল্পিত অংশা অনিবার,
জ্বলয় তোমার জাগে হিয়া মোর, মোর-দীপন ধরে,
আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্থরে।

বহিয়া তোমায় জীবন-ছন্দ দেব ভাষা অভিনব,
ভুলিয়া আপন কেন এ-য'পন। মিছে নিশি-নিশ্চিন্ত !
মোর চন্দের আলো-উজ্জ্বল
বুকে তব গানে কার অভিলাষ,
হে ভলমি, কোন নিরন্ত-ধুর প্রাণে তব সঞ্চারে,
আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্থরে।

তব লাগি মোর আনি যে নাগায়ে উর্ধ্ব স্বপনখানি,
করি বিমুক্ত তপন-উৎস আধার-গহন ছানি'।
শোনে! বাজে তব নীরব নৃপূর
লভি বাঞ্ছিত অমরার সুর,
নিভৃত কানন চির-বসন্ত-গুঞ্জে মঞ্জরে,
আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্থরে।

বিকাশে তোমার ধরণীর ধূলি পাবক-ছন্দে জাগে,
অমরা-আকাশ-আলোর অতল অমলতা আসি' লাগে।
মেল তুমি আশি, উঠি জেগে তাই,—
তব জাগরণী-মন্ত্র বিলাই,
জাগরণে তব আমারি নয়ন জাগর-স্বপ্ন ধরে,
আমি যে তোমার পরশমাণিক, রহি তব অস্থরে।

২৪ নবেম্বর, ১৯৫৭

অতিমানুষ কে? এই জড়মুখী খণ্ডিত মানুষী-বাণ্টিকে ছাড়িয়ে
উপরে উঠেছে যে, ভাগবত শক্তিতে, ভাগবত প্রেম ও আনন্দে
আর ভাগবত জ্ঞানে যে বিশ্বের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে নিজেকে
একীভূত করে দিয়েছে।

তুমি যদি তোমার এই মানুষী অহংকে ধরে থাক, মনে
কর এই তুমি হলে অতিমানুষ, তবে তুমি হলে তোমার
আত্মগরিমার মূর্থ দাস, তোমার নিজের শক্তির হাতে খেলার
পুতুল, তোমার নিজের আস্তির যন্ত্র।

শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের প্রার্থনা

টোকিও—জুন ৭, ১৯১৬

দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেল, তখন কিছু বলা সম্ভব হল না। কারণ, সে গেল একটা অবস্থান্তরের সময়, এক স্থিতি হতে আর এক বৃহত্তর পূর্ণতার স্থিতিতে উত্তরণ। বাহিরের অবস্থাও হয়েছিল জটিল, অভিনব—আধারের প্রয়োজন বেশ ছিল অনেক অনুভূতি, অনেক পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা যাতে তার অভিজ্ঞতা পায় একটা প্রশস্ত ও বহনশীল প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল বলে, কিছু দূরে সরে দাঁড়িয়ে, সমগ্র সমীচীন একযোগে দেখবার, তা কি এবং কোন দিকে নিয়ে চলেছে এ কথা জানবার সম্ভব তার পক্ষে হল না।

হঠাৎ, ৫ই জুন তারিখে, পরদা ছিঁড়ে গেল, চেতনার মধ্যে আলো ফুটে উঠল।

শাশ্বত ভগবান! তোমার ব্যক্তিগত রূপের উপর যখন ধ্যান দিলাম, তোনাকে মিনতি করলাম, রক্তমাংসের এই রাজ্যটি এসে অধিকার কর তুমি, তখন তুমি কর্ত্ত্বের মধ্যে সচল করে ধরলে এই প্রাণময় আয়তনটি—সে বহবৎসর ধরে তার আত্মবিকাশ ও একক-সাধনের প্রয়োজনবশতঃ, একটা স্তম্ভসমূহ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিজেদের ধরে রেখেছিল, শুধু গ্রহণ করে চলবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তোমার ইচ্ছাশক্তির কোন সক্রিয় প্রকাশের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল না।

এই যে পুনরায় কর্ত্ত্বপ্রবর্তনা, এর অর্থ প্রাণময় যন্ত্রটির একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা। কারণ, তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল সর্বদা তার পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন ধারা অনুসারে কর্ত্ত্ব করে চলা। এই নবাবাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী, কষ্টকর, সময়ে সময়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, যদিও তার পিছনে তোমার সান্নিধ্যের অনুভূতি, তোমার বিধানের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল অটল আর এতখানি সবল ও সচেতন যে কোন বিক্ষোভেই এসে সমীচীন বিচলিত করতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে প্রাণ-পুরুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠল, ফিরে পেল তীব্রতর কর্ত্ত্বের মধ্যে তার স্বস্বভাব, যেমন একদিন সে-স্বস্বভাবকে পেয়েছিল নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের মধ্যে। তার এই স্বস্বভাব একবার যখন স্থাপিত হল, তখন আলো আবার ফিরে দেখা দিল আধারের প্রতি অঙ্গে, আর যা-কিছু এ যাবৎ ঘটেছিল তার পূর্ণ চেতনা এসে আবার ধরা দিল।

এখন পূর্ণ কর্ত্ত্বেরই মধ্যে প্রাণপুরুষ ফিরে আবার পেয়েছে আন্তর ও শাশ্বতের অনুভূতি। তোমার পরম সোন্দর্যই সে দেখতে পায়, তাকেই রূপ দেয় জীবনে, যাবতীয় ইঞ্জিয়ানুভব, যাবতীয় রূপাবলীর ভিতর দিয়ে। তার ইঞ্জিয়ানুভব এত বিশাল এত সক্রিয় এত পূর্ণাঙ্গ-

বিকশিত যে সেই ক্ষেত্রে একই মুহূর্তে বিরোধী অনুভব সবও আবার অনুভূত হয়—কিন্তু তারও মধ্যে সে দেখে তোমাকেই।

তবুও সে ভোলে না যে এ হল একটা অবস্থা মাত্র, তোমার সম্মুখে গভীর ভক্তিতরে আনত হয়ে তোমাকে সে বলে “ভগবান, তুমি তোমার যন্ত্রকে হাতে তুলে নিয়েছ, কন্দের মধ্যে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছ। যন্ত্র জানে তার নিজের জুটি, আবিলতা যত, তাই তোমার করুণা সে ভিষা করে, যাতে সে নির্দোষ বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যাতে ক্রমে তার সকল লিপ্সা সকল সীমা দূর হয়ে যেতে থাকে, পরিশেষে তোমাকে প্রকাশ করতে পারে আরো অখণ্ডভাবে।

নবেম্বর ২৮, ১৯১৬

শিঙুর মুখের এই সব কাকলি তুমি আমাকে ফিরে আবার পাঠ করতে দিয়েছ। এ সব ত হল ত একটা অপরিণত মনের আত্মপ্রকাশ করবার কষ্টপ্রয়াসমাত্র—আমার কাছে তা মনে হল যেন একটা দূরের, বহু দূরের জিনিষ, তাতে মাথা রয়েছে সরল উৎসাহী শৈশবের অনুভূতির মাধুর্য আর নির্মলতা। তবুও তোমার দৃষ্টিতে, হে ভগবান, হে চিরন্তন অধীশ্বর, আমার বয়স ত একটুও বাড়ে নি, আমি ত বৃদ্ধতর হয়ে উঠি নি। আশ্রয় যে কথা বলছি আমি তা পূর্বে বলেছি যে কথা তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হবে না। মন ত রয়ে গেছে তেমনি রিক্ত, তেমনি অপরিপক্ব। বিশেষ কিছু বলবার মত তার আছেই বা কি? কোন চমকদার অভিজ্ঞতা তার ত নাই—সব অভিজ্ঞতাই মনে এখন হয় অতি সহজ সাধারণ, নূতন চিন্তাও এমন কিছু নাই যা শক্তিমান বা অসাধারণ, সেই রকমের চিন্তা যা এনে দেয় নব-আবিষ্কার-জনিত উল্লাস। সব চিন্তা, যে-রকম রূপ ধরেই তা আত্মক না, মনে হয় যেন পুরাতন বহু সব, অভিবাদন জানিয়ে বিদায় করি যেতে যেতে, তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু আশা করি না। অন্তরে অপরিচিত গুপ্ত গুহা কোন আবিষ্কার করে ফেরবার মত একান্ত সমস্ত পুণ্যানুপুণ্য আত্মবিশ্লেষণবৃত্তি নাই, অন্তরের নিরুত্তর জটিলতাই নাই কিছু—তা হল পারিপার্শ্বিকের যে সব মানসিক বৃত্তিরাশি তাদের নিরুৎসাহ নিরপেক্ষ প্রতিচ্ছায়া। আধারের মধ্যে যা ঘটে চলেছে তার বিবরণ দিলে, তা হবে খেমন জটিল তেমনি এক্ষেপে, অগতের বিবরণও যখন দিতে যাই, তার প্রায় একান্ত অবচেতন যত অনিশ্চিত প্রয়াস আর স্নাত্তিসকলের হিসাব করে, ঠিক তারই মত।

কি দৈন্য! কি দৈন্য! তুমি আমাকে স্থাপন করেছ একটা উষ্ম রিক্ত বহুভুতির মধ্যে; তবু সে নরু আমার কাছে স্তম্ভুর, তোমার কাছে থেকে যা-কিছু আসে তারই মত, হে ভগবান। এই যে মলিন বিবর্ণ ধূসরতা, এই যে ঔজ্জ্বল্যাহারা আলো, তারই মধ্যে আমি নাভ করি যেন অন্তহীন প্রসারের আশ্রয়। বৃহত্তর নির্মল নিঃশ্বাস, মুক্ত শিখরের সবল হাওয়া আমার

হৃদয় পরিপূর্ণ করেছে, জীবন পরিপ্লুত করেছে। অন্তরের ও বাহিরের আমার সকল বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার মনে হয় পাখীর মত আমি যেন পাখা মেলে দিয়েছি অবাধে উড়ে উড়ে চনবার জন্যে। কিন্তু দেখছি পাহাড়ের চূড়ায় সে বসে আছে স্থির, পাখা তার প্রসারিত ধূসর ধূসল আকাশের দিকে, উড়বার জন্যে বসে আছে কি একটা যেন ঘটবে তার অপেক্ষায়, কিন্তু কি তা জানে না—কোন বন্ধনই তার নেই উড়বার বাধা রূপে, তাই উড়বার চিন্তা তার আসে না। সে যে মুক্ত এই চেতনা তার হয়েছে, তাই মুক্তি ভোগ আর সে করে না, সে রয়েছে অন্য সকলের মত, অন্য সকলের সঙ্গে, মাটির উপর আসন করে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গাঢ় কুয়াসার মধ্যে।

ডিসেম্বর ৪, ১৯১৬

তুমি যখন অনুমতি দিয়েছ, ভগবান, তখন ফিরে আবার আমি প্রতিদিন তোমার কাছে আসব, অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য, আমার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে—যদিও জানি সে-কাজ করে যাই বটে কিন্তু তার মূল্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। কর্ত্তের মধ্যে, সাধারণ চেতনার মধ্যে তুমি আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলে, এখন ফিরে আবার স্বযোগ দিনে নিয়মিত তোমার দিকে উঠে চলেতে। অচল শাস্তির শাস্ত্র চৈতন্যের মধ্যে পুনরায় বিচরণ করতে।

ভগবান, তুমি চেয়েছ আধার বৃহত্তর হোক পরিপূর্ণ হোক—তা সে করতে পারে না, যদি অন্ততঃ আংশিকভাবে সাময়িকভাবে ফিরে অজ্ঞানের মধ্যে, অপ্রকাশের মধ্যে সে প্রবেশ না করে।

এই যে অজ্ঞান এই যে অপ্রকাশ তাই নিয়ে সে এসেছে এখন তোমার পায়ে সমর্পণ করতে—এ ত তার পক্ষে অতি সামান্য পরীক্ষা। আমি তোমার কাছে চাই যে সদাসর্বদার জন্যে আমাকে তুমি দাও সেই চেতনা, এখনকার মত নির্মল শান্তিময় মিননের সব মুহূর্তে পাই যা। তোমার কাছে চাইব এই সব মুহূর্তকেই আরো শান্তিময় আরো নির্মল করে ধর, চেতনাকে সামর্থ্যে আলোয় আরো ভরে দাও যাতে সে চেতনা নূতন শক্তি নূতন জ্ঞান নিয়ে তার দৈনন্দিন কর্ত্তের মধ্যে ফিরে আসতে পারে।

এই সব ক্ষণিক মুহূর্ত, পরম আনন্দের একান্ততার নিমেষ সব তুমি আমায় দিয়ে, একথা আমায় স্মরণ করিয়ে দাও যে তোমার সঙ্গে সচেতনভাবে একীভূত হয়ে যাবার সামর্থ্য তুমি আমাকে দিয়েছ। তাই ত এক দিব্য ছন্দধূর সৃষ্ণতি আমার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে।

কিন্তু শব্দ সব মিলিত হয় মস্তিষ্কের মধ্যে একটা যেন পর্দার পিছনে, তাই কোন কথা আজ আর আমার লেখনার অগ্রে এসে দেখা দেয় না।

ডিসেম্বর ৫, ১৯১৬

তোমার করুণা আমার দিয়েছে শান্তি, তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সকল গীমা নুছে গেল, সেখানে সমস্তের অন্তরে রয়েছে আমি এবং আরো স্পষ্টভাবে সকলে রয়েছে আমার অন্তরে—মন কিন্তু ডুবে গিয়েছে এই দিব্য মহানন্দে, বাক্য প্রকাশ করে ধরবার শক্তি তার আর নাই।

(অভিজ্ঞতাটির হুল অনুনিপি)

“কিরে যাও পৃথিবীর দিকে”। অটল একান্ততার নীরবতায় পরিচিত অদেশটি শুনতে পেলান। তারপর চেতনা হয়ে উঠল সকলের মধ্যে একের চেতনা। “সবর্ধত্র, যাদেরই মধ্যে তুমি দেখতে পাও সেই এককে—তার। ভগবানের সঙ্গে এই একত্বের চেতনা নিয়ে ছেগে উঠবে। দেখ চেয়ে”.....। দেখলান, জাপানের একটি রাস্তা, উজ্জ্বল বর্ণের সূক্ষ্ণভিত্তি সূশোভিত জাপানী উৎসবের নঠনে রাস্তাটি আলোকিত। তার মধ্যে এই সচেতন গভ্রা এগিয়ে চলতে চলতে দেখলে পুত্ৰোক্তের অন্তরে সমস্তের অন্তরে ভগবান দৃষ্টগোচর হয়ে উঠেছে। একখানা ছোট্টো হাল্কা ঘর দেখা গেল, স্বচ্ছ তা, একটি নেয়ে তার ভিতরে “টাটানী” (গদি)-র উপরে বসে, পরিধানে উজ্জ্বল সোনার রঙে কাড় করা একখানা বেঙনী কিমোনো। নেয়েটি সুন্দরী, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ আর চমিশের মাঝামাঝি। সোনার রঙের “সামিসেও”-যন্ত্র বাজাচ্ছিল সে। পায়ের কাছে বসেছিল একটি ছোট ছেলে—নেয়েটির মধ্যেও দেখলান ভগবান।

ডিসেম্বর ৭, ১৯১৬

ভগবান, সত্যসত্যই আমি বলতে পারি আমার নাই কোন সাধনা, নাই কোন গুণ। যারা তোমার সেবা করতে চায় তাদের সকলের রয়েছে যে মহিমা সে সব থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বাহ্যতঃ আমার জীবন একান্ত সাধারণ, একান্ত সামান্য ; আর অন্তরে, কি তা ? শুধু এক প্রশান্ত হিরতা, তাতে নাই কোন পরিবর্তন, নাই কিছু অপ্রত্যাশিত—যে-বস্তু গিল্ল হয়েছে তার যে হিরতা, যা আর খোঁজ করে না, জীবনের কাছে থেকে জিনিষের কাছে থেকে আর কিছু প্রত্যাশা করে না, যা কাজ করে যায় লাভের কোন দাবি না রেখে ; আর একথা হির-নিশ্চিত কোন কাজই তার নিজস্ব বলে কিছু নাই, প্রেরণা হিসাবে হোক আর তার ফল হিসাবে হোক সে চায় গজ্ঞানে যে তার মধ্যে থাকে যেন কেবল পরন ইচ্ছাশক্তির চাওয়া। এই হিরতা অর্থ নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা, বিষয়-শূন্য জ্ঞান, কারণ-হীন আনন্দ, আশ্রয় চেতনা এক, কালের অন্তর্ভুক্ত যা নয় ; এমন অচঞ্চলতা যে বাহ্যজীবনের ক্ষেত্রে সে চলে ফেরে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্র তার নিজের নয় আবার তা থেকে সরে যেতেও সে চায় না।

আমি কিছু আশা করি না, প্রত্যাশা করি না, কামনা করি না, আকাঙ্ক্ষা করি না—কিন্তু আসল কথা, আমি কিছুই নই। তবুও একটা স্নেহ, প্রশান্ত অবিশ্রুত স্নেহ—নিজেকে যে নিজে জানে না, নিজের দিকে তাকাবার প্রয়োজনই নেই থাকবার উদ্দেশ্যে—এই শরীরে এসে বাস নিয়েছে। এ স্নেহ হলে তুমি, ভগবান, এ স্থিরতাও তুমি—এরা সব মানুষী বৃত্তি নয়, মানুষী ইন্দ্রিয় তাদের নুহতেও পারে না, আশ্বাসও করতে পারে না। ভগবান, তুমিই এই ভাবে রয়েছে এই দেহের মধ্যে আর তাইত এই দেহগৃহ এত দীন এত নলিন মনে হয় এমন একজন অপকৃপ গৃহস্থানীর পক্ষে।

জীবন-নাট্য

শ্রীনলিনীকান্ত শুক্ল

শেক্সপীয়র মানুষের জীবনধারার যে গাত্ৰ অনহা বা দুৰবস্থার কথা বলে গিয়েছেন
তা আমাদের পরিচিত—

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms...

Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness, and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything—

(As You Like It II. 7.)

তার যুগের তার দেশের জীবনধারা এঁকেছেন শ্রোষে, ব্যঙ্গ, বোষে, ক্ষোভে, হাসো কৌতুকে,
সমুচ্ছল ভাষায়, কিন্তু মূল বক্তব্য সার্বভৌম গত্য বলেই প্রতিপন্ন করিয়েছেন। করুণ
চিত্র, নিরাশার চিত্র, ব্যর্থতার নিরর্থতার মহাশূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস রয়েছে শেষে, “ক্ষুধিত
পাখাখের” পাখলের মত বলছে সকলে যেন “সব খুটা হায়া, খুটা হায়া”। শেক্সপীয়র
নিজেও অন্যত্র অন্যভাবে দিয়েছেন ট্রাজিকের কঠোর নির্ধন স্বল্পবাক্য ভঙ্গিতে ই একই
গিফাস্ত—

It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

(Macbeth, V.5.)

হয়তো তিনি নূতন কিছু বলেন নি, বাইবেলের প্রাচীন নবী যে দৃষ্টি দিয়ে বলে গিয়েছেন
vanitas vanitatum—(Vanity of vanities, all is vanity)—
 তারই ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।

আমাদের দেশেও এ দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রতুল নয়। মায়াবাদী বা বৌদ্ধপন্থীরা সেই একই
 সুরে কণ্ঠ নিলিয়ে ধরেন—শংকরাচার্য্য (বা তদনুরাগী কেউ) যখন বলেছেন :

বানস্তাবং ক্রীড়াসক্তঃ

ভরুণ স্তাবং ভরুণীরক্তঃ

বুদ্ধ স্তাবং চিত্তানগ্রঃ

পরে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ—

তখন সাত অবস্থা বা বয়ঃক্রমের পরিবর্তে চারটির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু জীবনের
 ধারা তাতে একই রয়ে গিয়েছে। সেই একই নৈরাশ্যের ব্যর্থতার ক্রম। তবে এখানে
 নূতন তথ্য একটা সংযোগ করা হয়েছে, উদ্ধারের নিস্তারের একটা ইঙ্গিত ; সার্থকতার
 একটা উপায় “ব্রহ্মণি” উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সেটিও নিষ্ফল।

মানুষের দৃষ্টি, ভাব-ভঙ্গি চিরকালই যে এরকম ছিল তা বলা মানুষকে অত্যধিক ঘৃণা
 করা—শেক্সপীয়রের টাইমনের (Timon of Athens) চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখা।
 কিন্তু অন্যরকমের যুগ ছিল, অন্যধরণের মানুষেরও স্থান ছিল পাণ্ডিত্য সনাত্তে—একটা
 বীরভাবের যুগ, বীরভাবের মানুষ, তারা জগৎকে দ্বির-দৃষ্টিতে দেখতো, বিচলিত হতো না,
 তা থেকে তার পূর্ণ সার্থকতাও সংগ্রহ করতে পারত। মহাকবি কালিদাস লোকোত্তর
 সত্তাদের জীবন-ধারা বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে একটা ক্রমবিভাগ দেখিয়ে তিনিও
 বলেছেন অবস্থা-চতুষ্টয়ের কথা। রঘুবংশীয়দের ধর্ম্মকর্ম্ম, জীবন-ধারা এই রকমের—

শৈশবেহাভ্যাস্তবিদ্যায়াং যৌবনে বিষয়েষিণাং

বার্হক্যো ব্রুনিবৃত্তিনাং যোগেনাস্তে তনুত্যাভ্যাং—

শৈশবে তাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন—যৌবনে বৈষয়িক অর্থাৎ সাংসারিক সামাজিক করণীয়
 নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। বার্হক্যো বিষয়-বিরত হয়ে একটা আন্তর-সাধনার জীবন বাপন
 করতেন। এবং পরিশেষে সনয় হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন যোগস্ব হয়ে।

জীবনের ট্রাজেডীকে এভাবে বরণীয় এবং রনণীয় করে তোলবার কৌশল কি সুলভ
 দেখান হয়েছে। শেক্সপীয়র হতে বহুদূরে চলে এসেছি আমরা। ইউরোপেও প্রাচীন
 গ্রীসে সফোক্লিস তাঁর জীবনে এই সাধনার পরিচয় কিছু দিয়েছিলেন।

কালিদাস অবশ্য ভারতীয় জীবন-দর্শনই অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় সামাজিক বাবস্থায়
 যে আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত আছে কালিদাস সেই একই ত্রিনিস দিয়েছেন—(১) ব্রহ্মচর্য্য
 (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ (৪) সন্ন্যাস। এ জীবন-দর্শন জীবনকে মায়াবাহ নিখ্যা
 নিরর্থক বলে নাই—জীবনকে ব্যবহার করেছে, অনুগত করেছে একটা জীবনাতীত সত্যের

কাছে; নশ্বর অর্ধ বিভীষিকা নবীচিকা নয়। তা হলো ইতিমধ্যে সত্য এবং তার সার্থকতা শাশ্বতের সহায় ও উপায় হয়ে।

প্রাচীনতর এক যুগে এই বৃহত্তর দৃষ্টি ছিল বলেই জীবন তখনও শেক্সপায়ারীয় করুণ গ্রহণ হইতে গঠিত। জীবনের নশ্বরতা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বস্তু, কিন্তু তাতে শোকাচ্ছন্ন বিগ্না না হয়ে, শান্ত প্রশান্ত চিত্তে তাকে বরণ করা যেতে পারে। উপনিষদের ঋষি যখন বলছেন শস্যনিব পচাতে লোকঃ শস্যনিব জায়তে পুনঃ—শস্যের নতই জীব পেকে ঋয়ে যায়, আবার শস্যের নতই পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে—জীবনের জন্মের অনন্ত আবর্তন দেখছেন ঋষি এখানে—এক প্রশান্ত দৃষ্টি, উদাসীন ও উদ্ধাসীন চেতনার পরিচয় পাই; তার স্পর্শে এই নশ্বর পরিবর্তনশীলতার অন্তরে যে একটা কারুণ্য আছে—তাজিলের বিখ্যাত কথা

SUNT LACRYMAE RERUM MENTEM MORTALIA TANGUNT

মরতর মধ্যে লুকিয়ে যত অশ্রু,—আনাদের প্রাণকে তা স্পর্শ করে, তার গুরুভার যেন লাঘব হয়ে আসে,—নির্জন, প্রায় সহস্য দৃষ্টিতেই তাকে দেখতে শিখি।

ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তই পুনরুজ্জীৱিত করেছেন আবার শ্রীকৃষ্ণ, তবে তাঁর পার্শ্বজনা বাজিয়ে :
অব্যক্তাধীনী তুতানি ব্যক্তনধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

হে ভরত-বংশধর! জীব আদিতে থাকে অপ্রকাশ, মাঝখানে হয় তার প্রকাশ, অন্তে আবার অপ্রকাশ হয়ে যায়—এর জন্যে আবার শোক কি? শ্রীকৃষ্ণ আনাদের শোক দুঃখ করবার কোন অবসরই দেন নাই, বলা বাহুল্য। তবুও অন্তর্ধ্যানী ভগবান যিনি—মানুষের দুর্বলতা তিনি জানেন ও বোধ করেন, নতুবা অর্জুনের কথা হবেন কি রকমে—সব আশা ভরসা উৎসাহ দিয়ে এবং জ্ঞানের কথা সব বলে শেষে উদ্ভব রহস্য দিয়েছেন এইভাবে—আমি জানি জগৎটা অনিত্য এবং সুখহীন (ব্রহ্ম-সাধনা ও গহজ নয়), স্মৃতির তুমি আনাকে ভালবাস, আমার আশ্রয় গ্রহণ করো—আমি তোমারই নতো মানুষ, মানুষ-ভগবান, পরম প্রেমাস্পদ।

যা হোক, জীবনের কর্তৃচক্রে অভিভূত পিষ্ট না হয়ে, এইভাবে তাকে অতিক্রম করবার অর্থাৎ এড়িয়ে যাবার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তবুও ধর্মচক্রটি নিজে স্বরূপতঃ যা আছে তাই থাকে চিরকাল। জীবন হলো নৃত্য-অভিনয়, এর ব্যতিক্রম নাই। বৈজ্ঞানিকের এই যে second law of Thermodynamics—শক্তির অনিবার্য ক্রমক্ষয়, অকাটা নিয়ম তা, সনাতন বিধিলিপি। কিন্তু নিয়তির লৌহবিধিকে ভাঙবার, ভেঙ্গে নতুন করে গড়বার স্বপ্নও ত মানুষ দেখেছে? এটি হয়ত বিশেষভাবে আধুনিক প্রাণের কথা। জীবনের মধ্য দিয়ে চলেছে একটা আশা ও ভরসার অভিব্যক্তি এবং পরিণামে রয়েছে একটা পূর্ণসার্থক পরিণতি। ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স্‌ এই রকম একটা লক্ষ্যের কথা

বলেছেন—তিনি বলেছেন মানব জীবন আরম্ভ একটা বিজয় দিয়ে, তারপর বিভিন্ন বিপর্যাসের ভিতর দিয়ে শেষও করেছে একটা বিজয় দিয়ে। ইহিক জীবন একটা সঙ্কুল যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়।

প্রথম বয়সে, জাতি হিগাবে, হোক আর ব্যক্তি হিগাবে হোক, মানুষের লড়াই তার দেহের সঙ্গে—শিশুর চেষ্টা পায়ে ভর করে দাঁড়ান, খাড়া হয়ে ওঠা ; আদিম মানুষেরও সেই প্রয়াস, বানরের ন্যায় দেহ সে ঝুঁকু করে তুলতে চেয়েছে—ওধু তাই নয়, তার বিরোধী কঠোর পারিপাশ্বিকের মধ্যে নিজের জন্য স্থান ও স্থিতি করে নিয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে স্থূল প্রতিষ্ঠা লাভ এই প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয় লড়াই যৌবনে—তার প্রাণের বাসনার আবেগের সঙ্গে, যখন তাকে পেয়ে বসেছে আকাঙ্ক্ষা, ক্রমতালোভ, প্রেম-লিপ্সা, বিজ্ঞিগীষা (Love & War)। হৃদয়ের রাজ্য তার সমুদ্র হল, কিন্তু হারান সে তার শৈশবের নির্মল সারন্য,—অজ্ঞানতা যদিও তা।

এই জ্ঞানের জন্য লড়াই তার পরিণত বয়সে—প্রাণের স্বরের উপরে উঠে সে চেয়েছে মনবুদ্ধির রাজ্য। মানুষ হয়ে উঠল জিজ্ঞাসু, তাকিক—কিন্তু সন্দেহ-সনাকুল। কোথায় রইল তার যৌবনের দৃশু বিশ্বাস, আশ্বগৌরব?

কিন্তু ভয় নাই। রাজ্যের অন্ধকার যখন একেবারে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক তখনই তার শেষ বিজয়—আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার।

● প্রথমে দেহ, তারপর প্রাণ, তার পর মন, তারপর আত্মা, মানবচেতনার ক্রমোত্তরণে এই পাদচতুষ্টয়।

He with the body waged a fight,
But body won; it walks upright.

Then he struggled with the heart;
Innocence and peace depart.

Then he struggled with the mind;
His proud heart he left behind.

Now his wars on God begin;
At stroke of mid night God shall win.

The Four Ages of Man (W.B. Yeats)

কিন্তু এই যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার যার অর্ধই শাস্তির স্বস্তির মুক্তির অনুভবের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কার—তার জন্যে ওপরে চলে যাওয়ার দরকারও নাই—এখানেই ও-সব হতে পারে পূর্ণ-মাত্রায়, এই দেহ-প্রাণ-মনই হয়ে উঠতে পারে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব। আধুনিক ঐচ্ছিক বনছে তাই

Annulling the decree of death and pain
Erasing the formulas of the Ignorance...
Nature shall draw back from mortality
And Spirit's fires shall guide the earth's blind force
Savitri (Sri Aurobindo)

মৃত্যুর আর বেদনার নিয়তি ঋণ করবে,
অজ্ঞানের ময় সব মুছে দিয়ে
প্রকৃতি মরতা থেকে সরে দাঁড়াবে,
পৃথিবীর অন্ধ সব শক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে চিন্ময়ের বজ্রফুলিঙ্গ।

মায়ের সঙ্গে কথা।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “চিত্তাকর্ষণ দৃষ্টি-নিবেশ” বইখানিতে একটি কথা লিখেছেন—
“কেনই বা ভগবান তাঁর নিজের তৈরি জগৎটাকে এমন দারুণ হাতুড়িপেটা করেন, কেনই বা তাকে ময়দার তালের মতো অনবরত পিষতে থাকেন, বারে বারে তাকে রক্তবনায় ডুবিয়ে দেন, নরকের অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে পর্যন্ত নিক্ষেপ করেন ? এর কারণ এখনিকার মানুষরা এখনও রয়ে গেছে অন্ধকার খনিগর্ভের যত অপরিণত অমার্জিত শক্ত শক্ত ধাতুপিণ্ডের সমান, তাকে শোধন ক’রে নরন ক’রে গলিয়ে একটা ভদ্রগোছের রূপ দিতে হলে ঐ ছাড়া অন্য উপায় নেই...”

উত্তর : হাঁ, সেই কথাটাই তো আমরা বিশেষ ক’রে জানতে চাই, মানুষ কি এখনও তেমন খাঁটি সোনার অবস্থায় এসে পৌঁছতে পেরেছে, যখন তাকে ঐরকম ভাবে শোধন ক’রে আনতে পীড়ন করবার উপায়গুলির আর বোটে দরকারই হবে না ?

দেখতেই তো পাচ্ছে, তেমন অবস্থা এখনও আসেনি। মানুষ এখনও নানা বিষয়ের তীব্র আসক্তি নিয়ে এমনই আচরণ করছে যে তাদের সংযত করবার জন্যে ঐরূপ ধরনের কঠোর উপায়গুলি অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জগতের প্রত্যেক দেশই আজ যে এক সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করছে, সারা পৃথিবীর মাথার উপরে সর্বত্রই ঝুলছে নারায়ক রকম যুদ্ধের কালো মেঘগুলো, তার আসল কারণই হলো তাই।

কিন্তু যদিও মানুষ এখনও খাঁটি ধাতু হয়নি বটে, তবু তার শোধনকল্পে জগতের ইতিহাসে আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন অনেক ব্যাপারই ঘটে গেছে, যাতে এখন আমরা অনেকটা ভালোর দিকে আশা করতে পারি। অন্ততপক্ষে এই আশা করতে পারি যে, মানবজাতির কোনো এক নির্বাচিত অংশ অর্থাৎ কতকগুলি মানুষকে নিয়ে নাতিবৃহৎ একটি দল অমনি খাঁটি সোনাতে পরিণত হবার মতো প্রস্তুত হয়ে উঠেছে ; আর তারাই প্রথমে দেখিয়ে দেবে যে কেমন ক’রে যুদ্ধবিগ্রহ না ক’রেও শক্তি প্রকাশ করা যায়, অপরকে না মেরেও বীরত্ব দেখানো যায়, হলস্থূল কাণ্ড না ঘটিয়েও সমুচিত বীর্যের বিকাশ সম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দের বইখানিতে ঐ কথাগুলির কয়েক পংক্তি পরে আবার তিনি এ সমস্যার মীমাংসার সম্বন্ধেও লিখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—“মানুষ যদি একবার শুধু আধ্যাত্মিক

হতে রাজি হয় তাহ'নেই সমস্ত কিছু পাল্টে যায়।” সেই হলো সব চেয়ে বড়ো কথা, যদি সে ওতে রাজি হয়! এদের মধ্যে কতক অংশ তা চায় বটে, এর জন্যে তারা বাস্তবিক আশ্পূহাও করে, কিন্তু বাকি অংশটা কিছুতেই এতে রাজি নয়, তারা যেমন আছে তেমন ভাবেই থেকে যেতে চায়। সেই কারণেই বলা হচ্ছে অঙ্ক ও ভেজান-বেশানো ধাতুপিও, তাকে গনিমে শোধন ক'রে ফেলার জন্যেই বারে বারে তাকে স্নানস্ত্র অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হচ্ছে।

আধুনিক কালে আমরা জগতের ইতিহাসের আবার এক নোড়ের মাধ্যম এসে উপস্থিত হয়েছি। সকল দিক থেকেই অনেকে আবার কাছে প্রশ্ন করছে: “এর পর কি হবে?” সর্বত্রই দেখা দিয়েছে একটা অনিশ্চয়তা, ভয়, উৎকণ্ঠা। “এবার কি হয়, কি হয়!”—এমনি একটা ভাব।

ও প্রশ্নের কেবল ঐ একই উত্তর, যা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: “মানুষ যদি একবার শুধু আধ্যাত্মিক হতে রাজি হয়!” যদি অল্প কয়েকজন মাত্র ও ঝাট্টা সোনা হতে পারে, তবে তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে, তাদের দৃষ্টান্ত থেকে ক্রমশ আগাগোড়া সকল ঘটনারই নোড় ফিরে যাবে। কিন্তু এটুকু হওয়া নিতান্তই দরকার।

তার পর আমাদের ভরফের কথা। এই যে এত সাহস, এত বীর্য ভগবান আমাদের দিয়ে রেখেছেন, এগুলিকে আমাদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রামে, অর্থাৎ নিজেদেরই যত কিছু হুম্ব ও অপূর্ণতা ও তামসিক ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করি না কেন? নিজেদেরই ওদ্ধি আনবার অগ্নিকুণ্ডের অভিনুখে এই অসমসাহসিক ভেজটুকু নিয়ে অগ্রসর হই না কেন—যাতে মানব-মভ্যতার ধ্বংসকারী এই সকল দানবীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও ধ্বংসলীলার ভিতর দিয়ে চলতে আর আমাদের বাধ্য হতে না হয়।

এখন তাই আমাদের বর্তমান সমস্যা। প্রত্যেককেই তার আপন আপন উপায়ে এ সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে হবে।

আজ সন্ধ্যায় তোমাদের যা প্রশ্ন ছিল তার ঐ একটাই উত্তর, যে কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: “মানুষ যদি একবার শুধু আধ্যাত্মিক পথ ধরতে রাজি হয়।”

ওর সঙ্গে আরো একটি কথা আমি যোগ ক'রে দিচ্ছি: আমাদের নিজেদের দিক থেকে দেখলে সে বিষয়ে স্থির করবার সময় অতি সংক্ষেপ, আর দেরি করা একটুও চলবে না।

★

★

★

প্রশ্ন: এমন কোনো প্রশ্ন কি করা উচিত যা মনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে জাগেনি, যা চেষ্টা ক'রে খুঁজেপেতে বের ক'রে আনতে হচ্ছে?

উত্তর: প্রশ্নটা কি দাঁড়ায় তারই উপর সব কিছু নির্ভর করছে। চেষ্টা ক'রে খুঁজে বের করতে হলো বলেই যে তা নিরর্থক প্রশ্ন এমন কোনো কথা নেই।

বসন্ত শ্রীঅরবিন্দ যা-কিছু লিখে গেছেন তারই মধ্যে সকল রকম প্রশ্নের জবাব রয়েছে। মন দিয়ে পড়ে দেখলে তার মধ্যেই ভ্রোহাদের সবরকম প্রশ্নের জবাব পাবে। তথাপি একথা ঠিকই যে, কোনো সময়ে যদি কোনো একটি ভাবরূপকে নতুন করে চেতনার সামনে এনে উপস্থিত করা যায়, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সেটি আবার নতুন রকম জ্ঞানের সঙ্গে কাজ করে, আর তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে নতুন কিছু সাহায্য মিলে যায়। একই ভাবরূপকে তেমন বেশী রকম কার্যকরী করতে হলে তার সত্য অনুভূত ভাবের আকারে নতুন ও ভাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে আসা দরকার। আগেকার বলা কোনো অনুভূতির জিনিসকে যদি তার তখনকার পুরোনো ভাষাতেই বার বার গুনতে থাকো, তাহ'লে তা যেন এক্ষেত্রে উপদেশবাণীর মতো শোনাবে। তাতে মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে কিছু একটু চাকলা হয়তো জাগবে, কিন্তু তা খুব বেশী কাজের হবে না।

এ বিষয়ে আমার নিজের যা মত তা এই যে, ভাষায় বলা বাণীর চেয়ে নির্দাক বাণী আরো অনেক বেশী দাবী, আর আমি প্রায় সেইরকম চেষ্টাই করে থাকি। তাতে যে শক্তি কাজ করে তাকে কথায় অর্থসীমার মধ্যে ছোট হয়ে থাকতে হয় না, সেইজন্য তার ক্রিয়া বহু গুণে বেড়ে যেতে পারে; প্রত্যেকের চেতনার মধ্যে ঢুকে সে শক্তি আধারটির সামর্থ্য অনুসারে যথোচিত রূপ গ্রহণ করে নিতে পারে, এতে সাক্ষ্যের পরিধি অনেকটা প্রসারিত হয়ে যায়।

মনে করো কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দাক প্রেরণার ভিতর দিয়ে বিশেষ একটা ভাবস্পন্দন পাঠানো গেল প্রত্যেকের মনের বিভিন্ন গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী সেই স্পন্দন তাদের চেতনার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো; তারপর যার মনটি যে ভাবে তাতে সব চেয়ে সহজে সব চেয়ে ভালোরকম সাড়া দিতে পারবে, স্পন্দনটি তার বেলাতে ঠিক তদনুযায়ী আকার নিয়ে নেবে। অপরপক্ষে সেই জিনিসটাই যদি বাক্যের ভিতর দিয়ে বাহ্যে করে বলা হয়, তাহ'লে তা সকলের বেলাতেই একটা নির্দিষ্ট আকারে মনের মধ্যে পৌঁছবে; তাতে ওর ক্রিয়াশক্তি অনেকটা স্বর্ষ হয়ে যাবে; কারণ প্রথমত উচ্চারিত বাক্যের পুরো অর্থটি সব সময় সমস্তটা বোধগম্য হয় না, আর দ্বিতীয়ত সকলের বোধশক্তি তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ ও ধারণ করতে সক্ষম না হতেও পারে।

তাই আমি মনে করি যে, কোনো প্রশ্ন করা হলে যদি তখনই তার নতুন ভাবে জবাব দেবার মতো অনুভূতি আপনা থেকেই না আসে, তাহ'লে সেখানে কোনো জবাব দেবার চেয়ে চপ করে থাকাই ভালো। প্রশ্নটি যদি তেমন জীবন্ত হয় তাহ'লে তদনুরূপ জীবন্ত রকমের শিক্ষা দেবার মতো কিছু জবাব আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে—অর্থাৎ সে প্রশ্নটি যদি ভিতরের কোনো সত্যিকার প্রয়োজন জ্ঞাপন করে, আর তা যদি কারো নীচের অবস্থা থেকে এক ধাপ উঁচুতে ওঠার আগ্রহ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে। প্রশ্ন যদি আসে কোনো আভ্যন্তরীণ অনুভূতির দিক থেকে, এমন কোনো সমস্যা যা কারো নিজের মনে জেগেছে

আর নিজেই আগ্রহ জন্মাচ্ছে তার সমাধান খুঁজে পেতে, তাহ'লে সেই প্রশ্নই হবে তীব্র ও দরকারী। তার সমুচিত সমাধান পেলে হয়তো একটা নতুন দৃষ্টি খুলে যেতে পারে, উপরকার গুরুর একটা আভাষ মিলে যেতে পারে, চেতনার মধ্যে এমন অনুভূতি আসে যার থেকে নতুন কিছু গড়ে উঠতে পারে, উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল নতুন কোনো শক্তি পর্যন্ত জন্মে যেতে পারে।

এমন অবস্থা যদি আসে তাহ'লে সে কথা আলাদা। তা নহ'লে আমার মনে হয় যে কথা কিছুই না বলা, আর নীরব থেকে কয়েক নিমিট ধ্যানে রত হওয়া অনেক বেশী কাজের।

ধ্যানের আগে আমি তোমাদের কিছু পড়ে শোনাই, তা কেবল চিন্তাকে কেন্দ্রস্থ করবার জন্য, একটা বিশেষ কিছু লক্ষ্য বা ভাবের মধ্যে চিন্তাকে সংহত করে দেবার জন্য, অথবা নতুন কোনো বোধ আসবার সুযোগ দেবার জন্য। বস্তুত কোনো কিছু পড়ে শোনার পরে যে নীরবতা আসে, তার মধ্যে ওর কথাগুলোই ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

*

*

*

প্রশ্ন : সেই নীরবতার মধ্যে যাতে সমুচিত গ্রহণযোগ্যতা আসে, তার জন্য আমাদের সত্যার কোন্ অংশটিতে সব চেয়ে কেন্দ্রীভূত নিবিষ্টতা আনতে হবে ?

উত্তর : এখানে “ধ্যান করা” শব্দটিকে যদিও প্রয়োগ করছি, কিন্তু তার মানে মাথার মধ্যে কোনো বিষয়ের চিন্তাকে সঞ্চরণ করতে দেওয়া নয়, বরং তার উল্টো। যখন ধ্যান করবে তখন একটামাত্র লক্ষ্যকেন্দ্রেই তোমার সম্পূর্ণ একাগ্রতাকে তন্ময় রাখা ভালো। যদি তা আশ্পৃহর কেন্দ্র হয়, তাহ'লে তা আনো ভালো, কারণ সেখানেই তোমার ভিতরকার মূল শিখাটি জ্বলছে; সেটি হলো নাভিকেন্দ্র। তোমার সমস্ত শক্তিকে ঐখানে কেন্দ্রীভূত ক'রে আনো। আর যদি সম্ভব হয় তাহ'লে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে উপরের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকো, যেন অতীত সূক্ষ্ম কোনো কিছু শোনবার জন্য তুমি কান পেতে প্রস্তুত হয়ে আছো, সে এমন কিছু যার জন্য সমস্ত একাগ্রতা ও তন্ময়তা নিয়ে তোমার একেবারে স্তব্ধ ও স্থবির হয়ে থাকা দরকার। এমনি ভাবটি এনে ফেলে তার পরে আর কিছুই না ক'রে নিষ্কল হয়ে যাও। তার পরে আর কোনো ভাবনা নয়, একটুও নড়াচড়া নয়, কেবল যা আসবে তাকে গ্রহণ করবার জন্য নিম্নেই উন্নীত রাখবে, আর সে সময়ে ভিতরে কি ঘটছে তাকে বুঝতে যাবার কোনো চেষ্টা করবে না; কারণ বুঝতে চাইলে কিংবা সক্রিয়ভাবে সেদিকে লক্ষ্য করতে গেলেই অননি তাতে কিছু বস্তুর কাল্পনিক স্তর হয়ে যাবে, তাতে তোমার জিনিস-টাকে গ্রহণ করার পক্ষে বাধাই জন্মাবে। তাই বলছি ও সময়ে একেবারে নিস্তব্ধ থাকা চাই, যতটা তোমার পক্ষে সম্ভব; অটন, অনড় ও অচঞ্চল হয়ে পুরোপুরি একটি একাগ্রতায় স্থিরতার মধ্যে তখন তুমি অবস্থান করবে।

ঠিক এইভাবে ধ্যান করতে যদি তুমি সক্ষম হও, তাহ'লে তার ফল তখনই কিছু না

পেনেও, কিছুকাল পরে দেখতে পাবে যে ধ্যানের অবস্থা কাটবার পরে তুমি বেশ বোধ করছ তোমার সত্তার মধ্যে কিছু যেন অংকুরিত হয়ে উঠছে, চেতনার মধ্যে একটা নতুন কিছু জিনিসের আনদানি হচ্ছে ; নতুন রকমের একটা জ্ঞান, সব কিছুর সম্বন্ধে একটা নতুন ধরণের অর্থ বোধ করা, জীবন সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, সত্তার মধ্যে এক নতুন রকমের ধারা । এ-ভাবটি যদিও স্বপ্নস্বায়ী নাত্রই হয়, তবুও তাতেই জানবে যে জ্ঞানপ্রাপ্তি ও রূপান্তরের দিকে তোমার এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হলো । 'ওর থেকে কিছু জ্ঞানদীপ্তিও মিলতে পারে, সত্যের আরো একটু কাছাকাছি তুমি গিয়ে পড়তে পারো, কিংবা রূপান্তর আনার মতো এমন কোনো শক্তি পেয়ে যেতে পারো যাতে তোমার কিছু মনস্তাত্ত্বিক উন্মত্তি এসে যায় কিংবা চেতনার ক্ষুরণ হয়, নিজেস্বরূপ সত্তার বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির উপরে তোমার কিছু বেশীরকম কর্তৃত্ব জন্মায় ।

এই সাফল্যগুলি যে তখনই মিলে যাবে তা নয় । আগেই একবার বলেছি যে হাতে হাতে ফল পাবার চেষ্টা করলে ভিতরে এমন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে যাতে তোমার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়ে উন্মত্তো ফল হয়ে দাঁড়াবে ।

তোমাকে থাকতে হবে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্পন্ন হয়ে, কেবল অন্তরালে থাকবে নীরব আত্মহা । তার কোনো ভাষা নেই, ভাব নেই, সাড়াও নেই,—শুধু একটা উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে অথচ সহিষ্ণু হয়ে সে প্রত্যাশা ক'রে আছে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করছে না, আর নিশ্চয়ই সে কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা করছে না ।

এমন স্থিরতার অবস্থায় অবশ্য গোড়াতেই পৌঁছতে পারা যায় না । মনকে ক্রমশ ধাপে ধাপে শান্ত ক'রে আনা দরকার হবে, চেতনার সমস্ত মূত্রগুলিকে এক জায়গাতে গুটিয়ে নিষে তাকে একাগ্র ও একমুখী করতে হবে ; হয়তো এমনি ক'রে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতেই তোমার সময়টুকুর তিন ভাগ ফুরিয়ে যাবে । কিন্তু ধ্যানিক অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আবার ইচ্ছামত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঐ ধরণের নিবিষ্ট ভাবটি এনে ফেলতে পারবে ।

ওর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, সে অবস্থা আসবে আরো পরে, যখন সিক্তির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে । কিন্তু পূর্বোক্ত রকমের একাগ্র ও নীরব নিমগ্ন অবস্থা যদি এনে ফেলতে পারো, তবে তাতেই তুমি ধ্যানের সম্পূর্ণ সুফল পেতে শুরু করবে ।

*

*

*

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “অভিমানস অভিব্যক্তি” প্রসঙ্গে বলেছেন “ উপর দিক থেকে পরমোৎকর্ষ ও নীচের দিক থেকে চরমোৎকর্ষ ” লাভের কথা, এই দুটি জিনিসের অর্থ কি হবে ?

উত্তর : উপরের দিক থেকে পরমোৎকর্ষ হলো আধ্যাত্মিক জিনিস, যার মানে ভগবানের সঙ্গে মিলে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, নীচের জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি । যোগের ব্যাপারে তাই হলো পরমোৎকর্ষ, দেহের ও জড়জগতের দাসত্ব করা

থেকে পূর্ণ নিকৃতি। প্রাচীন কালে এরই কারণে পাখিব জীবনকে সাধকেরা প্রত্যাখ্যান করতেন, কেবল উচ্চ মার্গ ও শেষ পর্যন্ত ভগবান ছাড়া কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না।

আর নীচের দিক থেকে চরনোৎকর্ষ নানে মানবসত্তা তার বর্তমান দেহের সম্পর্কে ও বর্তমান অবস্থার আওতার মধ্যে থেকেই এবং পাখিব সম্পর্কগুলিকে যথাবিধি বজায় রেখেই যতদূর সম্ভব চরনোৎকর্ষে গিয়ে ওঠা। বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলা তাই হয়; বড়ো শিল্পী, বড়ো সাহিত্যিক, বড়ো বড়ো নেতা ও রাজ্যচালক, তারা তাদের আপন আপন ক্ষেত্রে সাধারণ ও সম্ভাব্য মানবগণীনাগকে ছাড়িয়ে অসাধারণ উৎকর্ষের দ্বারা অনেক উচুতে উঠে যায়।

পাখিব শক্তি ও পাখিব গুণ বিকাশের দিক থেকে, বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে, তেজস্বিতা ও সংসাহসের দিক থেকে, নিঃস্বার্থতা, দয়াধর্ম ও লোকহিতৈষণার দিক থেকে—এই সকল বিষয়ে মানুষের পক্ষে যতদূর সাধা তাকে চরমে নিয়ে যাওয়া, তাই হলো নীচের দিকের চরনোৎকর্ষ।

আর উপরের দিকের যে পরনোৎকর্ষ বা সংস্কৃতি, সে হলো আধ্যাত্মিক ও মানবোত্তর জিনিস। নীচের দিকের চরনোৎকর্ষকে বলা যাবে মানুষেরই ত্রৈহিক ক্ষমতার যা চূড়ান্ত, কিন্তু অপরপক্ষে তা আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক আত্মার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারে, সে দিকটাকে একেবারে বাদ দিয়েও অমন উৎকর্ষ নিলতে পারে। তোমার জীবনে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র না থাকলেও তুমি তেমন কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষে গিয়ে পৌঁছতে পারো; আধ্যাত্মিক আত্মার দিকে কিছুমাত্র না ঘেঁষেও তুমি প্রতিভাশালী হতে পারো। আধ্যাত্মিকের সংগ্রহ না রেখেও তুমি নৈতিক গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারো। এমন কি যারা অমন উৎকৃষ্ট গুণে গুণী হয় তারা তাই নিয়েই সমুদ্রে থাকে, তার চেয়ে বেশী আর কিছু তারা চায় না। তাদের এমন ধারণা হয় যে তারা ঐ গুণগুলি নিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেদের কামের অপূর্ণ সাফল্য নিয়ে তার আনন্দেই তারা ভরপুর, তখন এ কথা তাদের বোঝান কঠিন যে তাদের দ্বারা যা কিছুই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তারাই কিন্তু তার প্রকৃত স্রষ্টা নয়। এমন কথা তাদের কাছে বলতে চেষ্টা ক'রে দেখ : “তোমার ও-কাজ আসলে তোমার নিজের করা নয়, উচ্চতর শক্তিতে ও-কাজ করেছে, তুমি তারই যন্ত্রস্বরূপ হয়েছিলে মাত্র”। কুচিৎ দুই একজন ছাড়া এতে তোমার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব বিগড়ে যাবে, এমন কষ্ট রসিকতা সহ্য করতে না পেরে তারা তোমাকে তখনই বিদায় ক'রে দেবে! কাজেই এখানে দুইরকম উৎকর্ষ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস হয়ে গেল, সাধারণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে চলে গেল।

আগেককার যোগে বলা হতো যে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার প্রথম নিয়মই হলো পাখিব জীবনের অবসান, তার সমস্ত সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হওয়া। কিন্তু যারা মানব কৃতিত্বের দিক দিয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে তারা আদৌ বীতস্পৃহ হতে পারে না, তবে যদি তাদের

নিজ্বাদের জীবনে কোনো ব্যক্তিগত বার্ষতা ঘটে থাকে, যদি কোনো কৃত্রিমতা সন্য করতে হয়ে থাকে, তাদের প্রতিভার উপযুক্ত নুলা না পেয়ে থাকে, তাহ'লে সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাড়িবাড়ন্তের যুগ চলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাই নিয়েই তারা নশওন থাকে। এমননি নিজেকে নিয়েই ভরপুর খুশি হয়ে থাকার দরুণ তারা অন্য কোনো দিকে মোটে দৃষ্টিপাত করবারই প্রয়োজন বোধ করে না।

সকলের বেলা এমন না হলেও সাধারণত তাই দেখা যায় ; এই সকল প্রতিভাশালী মানুষদের চিত্তে যদি স্পষ্ট এমন আনন্দজ্ঞান না থাকে যে এখানে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছে, তাহ'লে তারা ঐভাবে এসে ঐভাবেই চলে যায়, নিজ্বাদের পাখির জীবনের ইতিহাসটুকু ছাড়া আর কিছুই তারা জানতে পারে না। বিশেষ ক'রে তাদের মনে যখন এই জ্ঞান আসে যে কৃতিত্বের চরম সীমায় তারা উঠেছে, তখন তাতেই তারা পরিতুষ্ট থাকে, তার পরে আর কিছু জানা তাদের দরকার মনে হয় না। যদি চেতন আসে তাদের স্পষ্ট ইচ্ছিতে জানিয়ে দেয় যে এখানে তাদের আসার একটা বিশেষ কিছু হেতু আছে, তাহ'লে হয়তো তাদের অস্পষ্টভাবে মনে হয় যে তারা বাইরে যা কিছুই করছে তা ভুলো জিনিস, তাতে যতই সাফল্য মিলুক তাই শেষ কথা নয়, তা ছাড়া আরো কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে যা এখনও মেনেনি। কিন্তু এ ভাবটি আসে কেবল যারা বিশেষ আনন্দ তাদেরই মধ্যে, জগতে এমন লোক খুব কমই মেনে। এরাই কেবল দু দিকের উৎকর্ষের সমন্বয় ঘটতে পারে, আর এদের দ্বারাই পরিপূর্ণ ধরণের কিছু ক'রে যাওয়া সম্ভব হয়।

তেনন মানুষ খুবই বিরল। আধ্যাত্মিক জীবনের বেলা যারা পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, পাখির জীবনের বেলাতেও যে তারা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, এমনটি খুব কমই হয়। হয়েছে বটে এমন যোগাযোগ, তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম। ভগবানের চেতন অবতার হয়ে যারা এসেছেন তাঁরা হয়তো দুই দিকেরই চরম সন্তোষনা নিয়ে এসেছেন, তবে তাদের অসাধারণ মানুষই বলতে হবে। নতুবা যারা আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছে, তারা যদি কোনো বিশেষ সময়ে পাখির ব্যাপারেও অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তথাপি সেটুকু হয়েছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ; যারা কেবল পাখির সিদ্ধিলাভের দিকেই সমস্ত শক্তিকে একান্তভাবে প্রয়োগ করেছে তাদের নতো সেই সাফল্য পরিপূর্ণ ও নিরুত হয়নি। সেই কারণেই দেখা যায় যে যারা পুরোপুরি বাহ্য চেতনা নিয়েই আছে, যাদের কাছে নাত্র পাখির ব্যাপারই বাস্তব ও গ্রাহ্য, যা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ও ইঞ্জিয়গ্রাহ্য তাই যাদের কাছে সত্য,—তারা যদিও আধ্যাত্মিক জীবনের কথাটা একরকম ভাবে মেনে নেয় বটে, কিন্তু তা এই হিসাবে যে ও একটা দুর্বোধ্য রকমের মানুষী ব্যাপার।

কয়েক জনের কথা আমি জানি, তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করলে তার থেকে বাহ্য বিষয়ে উন্নতি দেখাবারও প্রভূত শক্তি মেনে ; কার্যত তাই দেখাবার জন্য তারা তাদের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থায় ছবি আঁকতে বা গান করতে

বা কবিতা লিখতে শুরু করলে। তার ফলে দেখা গেল যে তারা যা কিছুই রচনা করছে তা প্রথম শ্রেণীর না হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাখির প্রতিভার লোকেরা যেমন উৎকৃষ্ট জিনিস সৃষ্টি করে থাকে তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। যারা বাস্তববাদী তারা সগর্বে এই দ্বাদশের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন : “এই দেখ, তোমরা যাকে সব চেয়ে বড়ো দ্বৈব শক্তি বলছ, কালের দিক দিয়ে তার কোনো মূল্যই নেই।” কিন্তু তার প্রকৃত কারণ এই যে এমন প্রচেষ্টা যারা করেছিল তারা অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। জড়কে শাসন শোধন করে না তুলে শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে কেউ যদি স্থূল বিষয়ের রাজ্যে প্রবেশ করে তবে সেক্ষেত্রে তার রচনা আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকলে তার যে-রকম হত তার চেয়ে ভালো হবে, কিন্তু জড়ের স্থূল বিষয়ের উপর আবার পূর্ণ প্রভু যার সেই প্রতিভার সৃষ্টির কাছে হবে নিকৃষ্টতর। অর্থাৎ এখানে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি থাকাই যথেষ্ট নয়, যে যন্ত্রের দ্বারা সে কাজ করা হবে সেই যন্ত্রটিও তেমনি ভাবে তৈরী হওয়া চাই।

অপরপক্ষে নেন করো, যদি কোনো প্রতিভাবান শিল্পী বা গায়ক বা কবি নিজের গুণের দিক দিয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করে, আর সে যদি সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং অতীমানস শক্তিও পেয়ে যায়, তাহ'লে তখন তার দ্বারা যা কিছু গড়ে উঠবে তা হবে যথার্থই এক অতুলনীয় দিব্যবস্তু।

শ্রীঅরবিন্দের কথাটির এই হলো মূল অর্থ, আর এমনি প্রচেষ্টাই তিনি আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। কারণ যদি তুমি তোমার দেহযন্ত্রের দ্বারা সবরকম সম্ভাবনারই অনুশীলন করো, সকল রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাকে সুপটু ক'রে তোলা, যথাসম্ভব তাকে এক অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্রে এনে দাঁড় করাতে পারো, তাহ'লে সেই যন্ত্রের মধ্যে যখন অতীমানস সত্যের বিকাশ হবে, তখন আত্মার পূর্ণ প্রস্ফুটনের জন্য তা এক পরমার্শ্য আধার হয়ে দাঁড়াবে, তোমাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অল্পে অল্পে তৈরি হতে হবে না।

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ পুনঃপুনঃ বলেছেন “দুই দিক থেকেই কাজ ক'রে যাও, একটা দিক ধরেছ বলে অপরটাকে অবহেলা করো না।”

বস্তুত তুমি যদি দিব্যচেতনা লাভ করতে চাও, তাহ'লে আধ্যাত্মিক আশ্পৃহাটি একবারও ছাড়া চলবে না ; কিন্তু তুমি যদি পাখির জগতে থেকেই দিব্যজীবন পেতে চাও, তাহ'লে অপর দিকটাও ছাড়া চলবে না, বাহ্য দেহটিকেও সকল কাজের উৎকৃষ্ট যন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

হয় এটা করি না হয় ওটা করি, এমন বিচার আসে আমাদের সংকীর্ণ ভেদজ্ঞান থেকে, সাধারণ নমন্যাবুদ্ধিতে ও যেন একটা ব্যারামের নতো। একটা দিককে যদি মনে ধরলো, তো অন্যদিকের বেলা একেবারে মুখ ঘুরিয়ে নিলে ; ওটিকে যদি পছন্দ করলে তো এটিকে আর নোটে আমনই দিলে না।

এ হলো খুবই সংকীর্ণ মনোভাব। সকল জিনিসকেই গ্রহণ করবে, সব কিছুকে নিয়ে তার সমন্বয় করতে শিখবে। তবেই মিলবে পূর্ণ সিদ্ধি।

*

*

*

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “চিত্তা-কথা দৃষ্টি-নিবেশ” বইখানিতে বলেছেন—“সকল রকমের দিব্যদৃষ্টি যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন ক’রে একত্রে মিলে যেতে পারতো, একটি অপরটির মধ্যে অবাধে মিশে গিয়ে সবগুলির মধ্যে এক সম্মিলন ঘটতে পারতো, তাহ’লে সে এক মহৎ কাজ সাধিত হতো ; কিন্তু তর্কবুদ্ধি-যেরা মতবাদের সংকীর্ণতা আর সম্প্রদায়গত গোড়ানি তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।” কিন্তু বিভিন্ন রকমের মতবাদ কেনন ক’রে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক’রে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে পারে ?

উত্তর : সে সম্মিলন আর সে সমন্বয় সাধারণ-মনের চেতনাতে আসতে পারে না। তার জন্য আরো উপরে ওঠা চাই, চিন্তার পিছনে যে গহন ভাবটি থাকে তার সন্ধান পাওয়া চাই। মানুষদের মধ্যে যে বড়ো বড়ো ধর্মমতগুলি রয়েছে, তার বাহ্য পরিচয় ও গোড়ানি ও বুদ্ধিযুক্ত ব্যাখ্যার দিকে না চেয়ে কেউ যদি তার গোড়ার ভাবটিকে ধরতে পারে, কেউ যদি তার মূল সূত্রটি জেনে নেয়, তাহ’লে তার পক্ষে সমস্তগুলিকে এক জায়গায় মেলাতে কোনোই গুণগোল হয় না।

মানুষের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি ছাড়া ওগুলি অন্য কিছু নয়। অন্যায়সেই তা পরস্পর পরস্পরের পূরক হতে পারে, ও ছাড়া আরো অনেক নতুন নতুন মত এসে ওর সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। সমস্তকে মিলিয়ে নিয়ে এক সমগ্র ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছনো দরকার, যাতে জীবনকে আমরা আরো সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি, পূর্ণতরভাবে ভগবানের আরো কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে পারি। এমন কি এই সম্মিলনের ফলে সকল ধর্মের মূল সূত্রে গিয়ে পৌঁছনোই যথেষ্ট হবে না। ওর সঙ্গে থাকবে একটা স্বনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎদৃষ্টি, সকল মানুষ যে কোন শেষ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটাই হবে লক্ষ্য—জগতের যে অনাগত উত্তরণ, শেষের দিকের যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব অর্থাৎ অতীত-মানস বিপ্লব, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন নতুন যুগের আগমন, তারই দিকে থাকবে একমাত্র অভীক্ষা।

অতীতমানস চেতনার কাছে কোনো ধর্মই স্বতন্ত্র থাকে না, কোনোটি কোনোটির বিরোধী হয় না। সবগুলিই পরস্পরের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। যা কিছু ভেদাভেদ দেখা যায় তা আনন্দের মনের গড়া। কিন্তু একটি মনের গঠন থেকে যা বেরিয়েছে, অন্য মনের গঠনের সঙ্গে তার মিলমিশ হওয়া চাই, তবেই তা এক সর্বসঙ্গতিময় পুরোপুরি জিনিস হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মমতের সঙ্গে আর সত্যিকার আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে এখানেই হলো তফাৎ। ধর্ম তার নিজের তৈরি বাহ্য স্বরূপটা নিয়েই ব্যস্ত, তার বিশিষ্ট মতবাদ ও ভাবধারাগুলিকে নিয়েই

ব্যাপ্ত, তখনই ভিতর থেকে যে কয়েকজন অসাধারণ মানুষ নিজেদের আধ্যাত্মিকতার ে রে উপবেশন হলে উঠে যায়, ধর্মটি তাদের দ্বারাই বড়ো হয়ে ওঠে; অপরপক্ষে যেখানে ঐটি আধ্যাত্মিক জীবন প্রকাশ পাবে, আর বিশেষত যেখানে অতীতবিশ্বের বিকাশ হবে, সেখানে জীবনের এই সব গঠনগৎকারিতার ও বুদ্ধিবিচারী মতবাদের কোনোটাই এমন স্বাভাবিক চোরা। নিয়ে থাকবে না। সেখানে সকল রকম সম্ভাবনার ও সকল প্রকার অভিব্যক্তিরই সমান স্থান, কেবল যা সব চেয়ে চূড়ান্ত কথা ও সব চেয়ে সর্বজনীন সত্য সেটাই সেখানে ব্যক্ত হবে।

আবার যদি একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়, তা কেবল অনর্থকই হবে না, তা হবে অনর্থ-কারী। এখন নতুন জীবনের, নতুন চেতনার বিকাশ হওয়া দরকার, এমন কিছু যা শুধু বুদ্ধিগোমার ও মানসিক নির্ধারণের উপরে। যে সত্য সব চেয়ে জীবন্ত তারই বিকাশ হওয়া চাই।

আর সেই সত্যের উপলব্ধির মধ্যে সব দলেরই মূল বক্তব্য ও মূল সূত্রটি স্থান পাবে। যে ভগবান সব দিক থেকেই সমগ্র ও সম্পূর্ণ ও ব্যাপক তাঁরই কথা তখন সর্বত্র ব্যক্ত হবে। কেবল সেই উপায়েই পৃথিবী ও তার মানুষজাতি রক্ষা পেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সেই আধ্যাত্মিক মহাবিশ্বের কথা, তার বিষয়েই তিনি আনন্দের বোঝাতে চেয়েছেন।

*

*

*

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ নিবেছেন—“স্বাধীনতা হলো সত্যের সেই ধর্ম যা রয়েছে এক সীমাহীন একত্রে বিধৃত, যা সমগ্র পৃথিবীর গুহাহিত অধিপতি : দাসত্ব হলো সেই প্রেম-ধর্ম যা অন্যের মধ্যে নিজেরই আত্মার বহু বিন্যাস দেখে তার নীল। আত্মদানের জন্য স্বৈচ্ছায় নিজেকে দিয়ে দেয়।” দাসত্ব ও স্বাধীনতা একসঙ্গে কেমন ক’রে সম্ভব?

উত্তর : বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে স্বাধীনতা আর দাসত্ব উন্টো রকমের জিনিসই বটে, নিত্যসুই পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তবু এমন এক অবস্থা আছে যাতে এই দুই বিপরীতের মধ্যে মিল হয়ে যায়, আর সে অবস্থাটি হলো পাখির অস্তিত্বের এক গর্বোত্তম আনন্দের অবস্থা।

স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা একটি সহজাত প্রবৃত্তি, সত্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য এটি থাকা দরকার। স্বাধীনতায় বেলে উচ্চতম চেতনার চরমতর উপলব্ধি, একেবারে ভগবানের সঙ্গে এক হবার ভাবটি এতে গার্বক হয়; সব কিছুর মূল উৎপত্তি যেখানে ও তৎপরে তার অভিব্যক্তি যেনন, দুই দিকের সমস্ত কথাটাই রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু যেহেতু অধিতীয় একের অভিব্যক্তি হচ্ছে বহুতা বিকাশে, সেই হেতু মূল উৎপত্তি ও তার অভিব্যক্তির মাঝখানে দুইএর মধ্যে যোগ বজায় রাখতে একটা কিছু বন্ধনীয় দরকার ছিল। এখন সেই কাজের জন্য, প্রেম ছাড়া আর কোন উৎকৃষ্ট রকমের বন্ধনীয় কল্পনা করা যেতে পারে? আর, সেই প্রেমের প্রথম লক্ষণ কি হবে? তার প্রথম লক্ষণই হলো আত্মদান, স্বৈচ্ছার দাস্য। এ হলো তার

স্বতঃস্ফূর্ত এক অপরিহার্য ক্রিয়া, স্বেচ্ছায় মানসে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিনিয়োগ দিয়ে কেবল দাস হয়ে থাকা।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাঁটি সত্যের দিক থেকে এখানে স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং একটির থেকে অন্যটি আপনাই এসে পড়ে। পূর্ণ স্বাধীনতা সেইখানেই হতে পারে যেখানে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ ঐক্য ঘটেছে। যেখানে কিছুমাত্র নিশ্চেষ্টতা ও অজ্ঞান রয়েছে, সেখানেই একটা সীমার আড়ান রয়েছে, অগত্যা সেখানেই দাস ভাবটি বড়ো হয়ে উঠবে। কারণ প্রেমের অকপট আত্মদান ছাড়া আর কিসের দ্বারা আড়ান ভিঙিয়ে পূর্ণ বিনয়কে উপলব্ধি করা যেতে পারে? আর আমরা এইমাত্রই ভেবেছি যে প্রেমের প্রথম কাজই হলো মানসে দাসত্ব গ্রহণ করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মূল সত্যের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ও দাসত্ব দুটাই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু এই নিশ্চেষ্টতা ও অজ্ঞান ঘেরা পৃথিবীতে যে দাসত্ব প্রেমেরই নিদর্শন রূপে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বাধ্যতানুলক হীন দাস্যবৃত্তি, যার উদ্দেশ্য হলো কোনোগতিকে নিজেরই জীবন বাঁচানো। যার দ্বারা আনন্দপূর্ণ প্রায় উন্মোচন হবার কথা, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অসন্তোষজনক এক নোংরা বৃত্তি, হীনতাব্যঞ্জক বন্দিত্ব।

আর স্বাধীনতার প্রয়োজন সত্ত্বেও যে ধারণা, তাও হয়ে গেছে খুব নিকৃত। স্বাধীনতা মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছে সবরকম বন্ধন কাটিবার আগ্রহ, আর তার জন্য চাই সরাসরি বিদ্রোহ, যাতে আনি সকলের থেকে তফাৎ হয়ে কেবল নিজেকে নিয়েই থাকতে পারি—যা কিন্তু আসল স্বাধীনতার একেবারে উল্টো অর্থ।

স্বাধীনতার কথা বলতে মনে পড়ে যাচ্ছে এক জ্ঞানী বৃদ্ধের কথা, তাঁর মুখ থেকে এ প্রশ্নের একটি চমৎকার জবাব শুনেছিলাম। কোনো একজন তাঁকে কথায় কথায় বললে, “আনি স্বাধীন মানুষ স্বাধীন হয়েই থাকতে চাই, সেই হলো বাঁচার মতো বাঁচা”। তিনি অমনি একটু হেসে বললেন, “তার মানে কারো ভালোবাসা তুমি তাহ’লে চাওনা; কেউ যদি কখনো তোমাকে ভালোবেসে ফেলে তাহ’লেই যে তোমাকে তার প্রেমের দাস হতে হবে, এমন স্বাধীন থাকা আর চলবে না।”

এটি ভারী চমৎকার জবাব; প্রেম মানেই বিনয়, আর বিনয়ই শেষ পরিণামই হলো মুক্তি। যারা মুক্তির নামে তথাকথিত স্বাধীনতার দাবি করে, তারা আসলে মুক্তিকে প্রত্যাখ্যানই করে, কারণ তারা ওর প্রকৃত রাস্তা যে প্রেম তাকে চায় না।

তবে বাধ্যতা এসে ঢুকলেই সেখানে বিকার আসে; যেই বাধ্যতা এসে পড়লো অমনি সেখানে মিথ্যার আমদানি হলো। আত্মসত্ত্বরীণ সত্যের সকল ক্রিয়াই স্বতঃপ্রণোদিত হওয়া চাই; সেখানে ভিতরের মিল থাকবে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান থাকবে, গভীরতর সত্যের দিকে ফিরে যাওয়া থাকবে; সেই হলো সত্যের স্বাভাবিক গতি, যেদিকে নল সেই দিকেই তার যাবার ঝোঁক।

প্রশ্ন “চিত্রা-কণা দৃষ্টি-নিমেষ” বইখানিতে এক জায়গায় রয়েছে,—“এমন জয় যাতে সর্বদাই থাকে পরাজয়,” এ কথার মানে কি ?

উত্তর তার মানে এ জয়ের কোনো শেষ নেই, কখনই তা সম্পূর্ণ হয় না। যতবারই তুমি জানছো যে এবার জয় করলে, ততবারই দেখছো তা সাময়িক ও আংশিক, আরো কিছু থাকি রয়ে গেল। আগেও যেমন ছিল পরেও তেমন রয়ে গেল, সে কথা নয়; কিছুটা অবশ্য বদলেছে, কিন্তু সমস্তটা বদলায়নি, সম্পূর্ণরূপে বদলায়নি।

এ জিনিস বিশেষ ক’রে দেখা যায় স্থূল দেহগত জয়লাভের ব্যাপারে। অক্লান্ত চেষ্টায় হয়তো নিজের কোনো দুর্বলতাকে জয় করলে, একটা অকনতা বা একটা বদ্যভ্যাসকে কাটিয়ে উঠলে, মনে ভাবলে যে তোমার জয়টা বৃষ্টি এবার পুরোষাত্রাতেই হলো; কিন্তু কিছু-কাল বা একটু পরেই হয়তো দেখলে যে জয়টা তেমন পুরো হয়নি, তখনও কাজের শেষ হয়নি, যে চেষ্টার শেষ হয়ে গেছে ভেবেছিলে তা আবারও তোমাকে করতে হচ্ছে। তার কারণ আসল কথা এই যে সমুহ পরিবর্তনের দরকার, চেতনাটি সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়া দরকার, নতুন শক্তির আবির্ভাব দরকার, তবেই জয় পুরোপুরি হবে।

বাইবেলে উল্লিখিত ক্যান্ডিয়ার প্রাচীন কিংবদন্তীতে রয়েছে যে যারা নতুন দীক্ষার্থী তাদের গুচিতার প্রতীকস্বরূপ এক গুহ বেষণ পরিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হতো, “এর মধ্যে কোনো নয়না দাগ পড়লে কেবল তার একটির পর একটি জায়গা আলাদা ক’রে ধুলে চলবে না, গোটা জিনিসটাকেই ধুয়ে ফেলতে হবে।” তেমনি তোমাদেরও যত কিছু দোষত্রুটি ও দুর্বলতাকে একটির পর একটি শোধরাতে গেলে চলবে না; তাহ’লে বেশীদূর এগনো যাবে না। চেতনাকে সমগ্রভাবেই পাল্টাতে হবে, এখন যে অবস্থাতে রয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসতে হবে, আর এর চেয়ে আরো উচ্চতর অবস্থায় গিয়ে উঠতে হবে, তাহ’লে সেখান থেকে শাসনের দ্বারা সকল দুর্বলতাকেই তাড়াতে পারবে, আর তোমার কি কি কাজ করা চাই তার আগাগোড়াই সেখান থেকে দেখতে পাবে।

শ্রীঅরবিন্দ ওর একটু পরেই আবার বলেছেন: “এগুলি হলো এমনি জিনিস যে এর সম্পূর্ণতা না করা পর্যন্ত কিছুই করা হয় না।” এক ধাপ এগিয়ে গেলে তা প্রকৃত পক্ষে এগোনোই নয়, সকল ধাপগুলোই উঠে যাওয়া চাই।

এ পথে যারা চলছে তাদের অনেকেই আবার কাছে নালিশ করে: “চেটা তো যথেষ্টই করছি, কিন্তু ফল কৈ হচ্ছে? প্রত্যেক বারে যেই মনে হয় যে কিছুটা এবার জিতলাম, অমন দেখতে পাই যে গোড়া থেকে আবার তা শুরু করতে হলো।” এর মানে আর কিছুই নয়, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকেই উপরের জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চায়, চেতনাকে কিছু বদলাবার আগেই তারা উঁচুতে গিয়ে স্থান পেতে চায়। কিন্তু তা তো চলবে না, সবখানি দৃষ্টভঙ্গীই আগে বদলাতে হবে, সমগ্র চেতনাকে তার অঙ্ককার কোণগুলি

থেকে পর্যন্ত টেনে বের করতে হবে, যাতে তার ধারা সম্পূর্ণরূপে উঠতে উঠে তার পর সেখান থেকে সব কিছু নজরে পড়ে।

তাই করতে পারলে তবে জয়ের কাজ সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে।

★

★

প্রশ্ন : চেতনার কেনন ক'রে বদল হতে পারে ?

উত্তর : তার অনেক রকম উপায় আছে ; প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকৃতির দিক দিয়ে যার বেলা যে উপায়টি সব চেয়ে উপযোগী, তাকে সেটির সাহায্যই নিতে হবে। কার পক্ষে কোন রাস্তা ঠিক, সে সম্বন্ধ সাধারণত আপনা থেকেই জানা যায়, কোনো এক অপ্রত্যাশিত অনুভূতির ভিতর দিয়ে। যেনন মনে করো, এমনিতে তুমি সাধারণত চেতনাতে বিচরণ করছ, সে চেতনা তোমার উপরভাঙ্গা হয়ে রয়েছে, তুমিও রয়েছ তার সমতলে। সেই সমতল থেকেই তুমি সকল বস্তু ও সকল মানুষ ও সকল ঘটনাকে এ যাবৎ দেখে আসছ। কিন্তু হঠাৎ কোনো কারণে একদিন ওলটপালট হয়ে যাওয়াতে তুমি কিছু উপরে চলে গেলে, তখন সব জিনিসকেই তুমি আগেকার চেয়ে অনেকটা উঁচু জায়গা থেকে দেখতে শুরু করলে। তখন মাত্র খুব কাছের সংকীর্ণ গভীর জিনিসগুলিকে দেখার বদলে তুমি সব কিছুকে আরো ব্যাপকভাবে দেখতে শুরু করলে। যেন নীচের সমতল থেকে হঠাৎ এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছ ; তাই সেখান থেকে আর কোনো কিছুকে তুমি বিচ্ছিন্নভাবে দেখছ না, অত উঁচু থেকে সব জিনিসকেই তুমি একত্রে এক নজরে দেখতে পেয়ে যাচ্ছ।

অনেক উপায়েই এমনি ধরনের আকস্মিক অনুভূতি একদিন যেন দৈবক্রমে এসে যায়।

আবার এর চেয়ে উল্টো প্রকারের অনুভূতিও আসতে পারে, যদিচ শেষ পর্যন্ত তাও সেই একই ব্যাপার। হঠাৎ যেন তুমি খুব গভীরের মধ্যে ঢুকে চলে গেছ, আগে যে সব জিনিসকে খুব কাছের বলে জানতে সেগুলো অনেক তফাতে কোথায় ভাগতে থাকল। তুমি তার থেকে অনেক দূরে এক আভ্যন্তরীণ নীরবতা ও অচঞ্চলতার মধ্যে ডুব মারলে,— সেখানকার অনুভব খুবই গভীর, সেখানকার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা, সেখান থেকে সকল জিনিস ও সকল ঘটনার মূল্যই আলাদা। আগকার যার যেমন মূল্য ছিল তার সমস্তই পাল্টে গেল। তুমি তখন দেখতে পেলো যে বাহ্যদৃষ্টিতে সকল জিনিসের মধ্যে বিস্তর তফাৎ থাকলেও গভীরের দৃষ্টিতে সব একই রকমের, একই জায়গাতে গিয়ে নিলছে।

কিংবা হয়তো হঠাৎ দেখলে যে বেড়া দেওয়া সীনার মনোভাব তোমার ঘুচে গেছে, অনির্দেশ্য ও নিরবধি কালের মধ্যে তুমি রয়েছ, তার কোনো আদিও নেই অস্তও নেই, সবই চিরন্তন, চিরদিনই ছিল এবং চিরদিনই থাকবে।

এমনি একটা বিশেষ রকমের অনুভূতি হঠাৎ এসে পড়ে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো, যা নিতান্তই অল্পস্থায়ী, তোমার জীবনে মুহূর্তের জন্য একবার ঝলক দিয়ে গেল, নিজে তুমি

বুঝতেই পারেন না যে তা কেন এলো আর কেনন ক'রে এলো। এমনি অনুভূতি বহু বারও আসতে পারে, এবং তা ভিন্ন লোকের বেনাতে ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ মুহূর্তখানী বা এক মিনিটের ক্ষণিক জিনিসের ভিতর থেকেই তোমার ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথের মূল সূত্রটি তুমি ধরে নিতে পারো।

ওর পর থেকে অবশ্যই তুমি সে কথা নিত্য স্মরণ করতে থাকবে, তেমনি অনুভূতিকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে, বারে বারে গভীরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে পূর্ণ একাগ্রতা এনে তেমনি ভাবটি আবার একবার ফিরে পাবার জন্য উগ্রহীণ আশুহা করবে। এতেই তোমার রূপান্তরের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

যারা গভীরতর সত্যের সত্যকে জ্ঞানবার জন্য মনোনীত, তাদের জীবনে এমনি একটা মুহূর্ত আসবেই যখন তারা সত্য চেতনার সে অনুভূতি পেয়ে যাবে, যখন তারা আশঙ্কায় মানুষটি আর থাকবে না। সে অনুভূতি খুব ছেলেবেলাতেও আসতে পারে, ক্ষণিক ঝলকের মতো হয়েও আসতে পারে, কিন্তু তাতেই যথেষ্ট। ওর থেকেই নিশ্চিত জ্ঞানতে পারবে যে অতঃপর কোন দিকে তোমার চলার পথ, ওতেই সেই পথের দরজা তোমার কাছে খুলে যাবে।

তার পর থেকে সেই পথে তোমার অগ্রসর হতে শুরু করার কথা। কাজেই তখন থেকে তুমি অবিচল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই উচ্চতর অবস্থাকে ভালো ক'রে ফিরিয়ে আনার পুনঃপুনঃ প্রয়াস করবে, যাতে ওর থেকে তুমি আরো বেশী বাস্তব রকমের অনুভূতি নিয়ে আরো বেশী বিরাট চেতনার মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারো।

সত্য চেতনাকে লাভ করবার অনেক প্রণালীর কথাই জানা আছে, আর তার অনেকগুলি ধারার সম্বন্ধেই বলা যায়। কিন্তু শিক্ষা পেয়ে কিংবা বই পড়ে কিংবা গুরুর কাছে যা জানা যায় তা নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকারণে পাওয়া প্রত্যাক অনুভূতির সঙ্গে সমান ফলপ্রসূ হতে পারে না। কারণ সে জিনিসটি হলো নিজেরই আত্মার জাগরণের সহজ বিকাশ, নিজের চৈতন্যপুরুষের মধ্যে ঐ এক সেকেন্ডের অনুভূতির স্পর্শ থেকেই স্পষ্ট জানা হয়ে যায় যে তোমার পক্ষে শ্রেয় কোন রাস্তা, কোন দিক দিয়ে চলা তোমার পক্ষে সব চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হবে; তার পর আর কিছু নেই, নব্য পৌঁছবার সংকল্প নিয়ে অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই রাস্তা ধরেই চলতে থাক।

কেউ কেউ রাতে স্বপ্নের মধ্যে অনুভূতি পেয়ে যায়। কেউ বা পায় বিশেষ কোনো ঘটনাসূত্রে হয়তো এমন কিছু চোখে পড়ল যার থেকে এক নতুন চেতনা জেগে উঠল; কেউ বা হয়তো একটা কিছু কথা পড়লে কিংবা কানে শুনলে, কোনো বিশেষ বাক্য কিংবা কোনো গ্রন্থতিন্দুর সঙ্গীত, কিংবা এমনও হতে পারে যে প্রাণপণে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে হয়তো কিছু অনারূপ অনুভূতি মিলে গেল,—বোট কথা কিসের থেকে এলো তাই নিয়ে কিছু যায় আসে না, এমন হাজার রকমের উপায় আর হাজার রকমের ওজর রয়েছে। আসল কথা এই যে ওর জন্য সজাগ থাকা চাই, প্রতীক্ষায় থাকা চাই।

কখনো বা যেদিন তুমি কোনো বীরদের বা মহত্বের বা উদারতার দৃষ্টান্ত দেখলে, কিংবা এমন কোনো গুণী লোককে দেখলে যার কাছগুলি অতি আশ্চর্য, সেদিন হঠাৎ তাই দেখে তোমার সমস্ত মনোবিশেষ এক উদ্দীপনা বা শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতার সন্ধার হলো, আর তাতেই এক নতুন চেতনার দ্বার তোমার মধ্যে খুলে গেল, নতুন এমন এক আলো বা উদ্বাপণ এ আনন্দ তোমার মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যার সহজে আগে কিছুই তুমি জানতে না। এমন ভাবেও গূঢ় নিলে যেতে পারে।

কিন্তু সব চেয়ে আগে তোমার মনে হওয়া চাই যে চেতনাটি বদলে যাওয়া দরকার, এ কথা তোমার মনে লাগা চাই যে লোক্য গিয়ে পৌঁছবার জন্য পরিবর্তনের সাত্তাটাই ধরতে হবে। এই মূল গুণটি মনে নিলে তখন তুমি এই দিক দিয়েই উন্নত হয়ে থাকবে। আর তখন একটা কোনো উপায়ও তোমার নিলে যাবে, নিশ্চয়ই তা নিলে যাবে। আর সে উপায় এসে গেলে তখন বিনা বিধায় তাই ধরেই তোমার প্রকৃত পরিবর্তনের পালা শুরু হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু এমন অনেকে আছে যাদের বেলা সব কাজই জ্বলেন নতো সহজ হয়ে যায়, আবার এমনও অনেকে আছে যারা সাত্তা পেলেনও প্রতি পদেই বিপাকে পড়ে হাবুডুব খায়, এক পা এগোতে দুর্দশার সীমা থাকে না। এতটা তফাৎ হয় কেন ?

উত্তর : অপরের বেলা কি হচ্ছে আর না হচ্ছে তাই নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই, এ-কথা তোমাদের কতবার বলবো। কার কি হচ্ছে তা নিয়ে বিচার করবে না, সমালোচনা করবে না, তুলনাও করবে না। তোমার কাজই তা নয়। নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য আছে বলেই তুমি তোমার দেহধারণ ক'রে পৃথিবীতে এসেছ, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে যথাসাধ্যরূপে নিজের দেহকে তার যন্ত্ররূপ ক'রে তুলবে, যথাসাধ্য তাকে দিয়া চেতনায় গচেতন ক'রে তুলবে। 'এই তোমার কাজ। মন প্রাণ দেহ, সনস্ত দিক থেকেই তার উপযুক্ত মালমসলা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, ভগবান তোমার কাছ থেকে যা চান তারই উপযোগী জিনিসগুলিও তুমি পেয়েছ, আর জীবনেও তোমার তারই উপযুক্ত রকমের ঘটনা-সংস্থান ক'রে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন কথা কেউ বলতেই পারেনা “আমার জীবন সকলের চেয়ে ভয়াবহ। জগতে অন্যের তুলনায় আমারই জীবনটা সব চেয়ে মন্দ।” কারণ প্রত্যেকের বেলাতেই এই কথা যে সর্বাঙ্গীণ উন্মুক্তি আনবার পক্ষে যার যেমন রকম পাওয়া উচিত তেমনই জীবনই সে পেয়েছে, সেই অনুযায়ী। পাথির অভিজ্ঞতাগুলিও তাকে পেতে হচ্ছে, আর সনগ্রহভাবে যথাযথ উপলব্ধি আসার জন্য যার যেমন বাধাবিঘ্নের সমুদ্রীন হওয়া দরকার তাকে তাই হতে হচ্ছে।

ভালো ক'রে যদি নিজেকে একটু পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখ, তাহ'লে দেখতেই পাবে যে তোমার যেদিক দিয়ে উৎকর্ষ ঘটা প্রকার, ঠিক তার উল্টোে তিনিগলো তোমার মধ্যে রয়েছে, উৎকর্ষ নামে আমি বলছি বৃহত্তর ভাবে এবং উপর দিক দিয়ে। জগতে তোমার একটা বিশেষ কিছু করণীয় কাজ আছে, বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য সফল করবার, বিশেষ কিছু উপলব্ধি আনবার আছে, আর সেই কাজটি সমাধা করবার জন্যেই তার বিপরীত প্রকার বাধাবিপত্তিও এনে হাজির করা হয়েছে তোমার মধ্যে। সব সময়েই দেখতে পাবে যে আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে তোমার ভিতরে; এক দিকে যেমন দেখবে যে বেশ একটি গুণ তোমার আছে, অন্য দিকে তেমন দেখবে যে তার উল্টো রকমের শেখটিও তোমার বিলক্ষণ আছে। যদি কোথাও দেখ যে অনেকখানি অন্ধকার, তবে নিশ্চিত জানবে যে অনেকখানি আলোও পাশাপাশি অন্য কোথাও আছে। আর তোমার তাই কাজ হবে একটির সুযোগ নিয়ে অন্যটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এমন কথা কখনো বলবেনা “আমি এই রকমই, এর চেয়ে অন্য কোনোরকম হতে পারি না,” কারণ সে কথা কখনই সত্য নয়। তোমাকে এর থেকে উল্টো রকমের হতে হবে বনাই আপাতত তুমি এই রকম। যত কিছু বাধাবিপত্তির অন্তরায় তোমার মধ্যে রয়েছে তা এই কারণেই যে ওর আড়ালে কিছু সত্য লুকিয়ে আছে, তাকে প্রকাশ ক'রে আনবার জন্যেই তোমায় সে বাধাগুলিকে হটিয়ে দিতে শিখতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তেমনি আবার বড়ো ক'রে এ কথাও বলা যায় যে জগৎটা যদি এমন বিসদৃশ রকমের না হতো, তাহ'লে এর সম্বন্ধে কোনো আর আশাই ছিল না। এর খানখলগলো অতি গভীর, তার মধ্যে রয়েছে যে নিশ্চেতনতা তা অতি অন্ধকার ও দুর্ভেদ্য, এ সবই যদি একদিন পূর্ণ দীপ্তিতে চেতনা বিকাশের পূর্বলক্ষণ না হতো, তাহ'লে সকল আশাই আমাদের ত্যাগ করতে হতো।

শংকর বলেছেন—এবং আরো অনেক বলেছেন—যে এই জগৎটা অতি বদ জায়গা, থাকবার উপযুক্ত নয়, একে নিখ্যা নামা বলে জেনে যত শীঘ্র পারা যায় বর্জন করাই উচিত, কারণ এর মধ্যে থেকে কোনো কিছুই করা যায় না। কিন্তু তার বদলে আমি তোমাদের বলছি,—এই জগৎটা এতটা নল, এমন অন্ধকার ও অচেতন ও অসুন্দর বলেই, আর এমন দুঃখকষ্টনয় রয়েছে বলেই এর সম্বন্ধে অনেক আশা করবার আছে, এর একদিন চরম সৌন্দর্যে, অত্যাশ্চর্য জ্যোতিতে, পরিপূর্ণ চেতনায় ও অপরিণীত আনন্দে বিকশিত হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

★

★

★

প্রশ্ন : মেহের নির্দিষ্ট বৃত্তিগুলি তার রেন উৎকর্ষে উঠবে কেনন ক'রে ?

উত্তর : রূপান্তর, পূর্ণ রূপান্তরের দ্বারা।

বাস্তবপক্ষে আমাদের দেহ পশুদের চেয়ে এখনও প্রকৃত উন্নত হতে পেরেছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে, কারণ এ কথা ঠিকই যে যদিও আমরা তাদের চেয়ে কয়েক বিষয়ে উত্তম, কিন্তু অন্য কয়েক বিষয়ে আমরা তাদের চেয়ে অধম। দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহেই বলতে হবে যে অনেক পশুর ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশী। যদি কোনো বিশেষ শিক্ষা নিয়ে আর ব্যায়ানাদি ক'রে আমাদের ক্ষমতাকে খুব বেশী বাড়িয়ে না হুলি, তাহ'লে বাঘ সিংহের গায়ের জোরের ধারেকাছেও আমরা ঘেঁষতে পারবো না ; বাদরগুলো সাধারণত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষিপ্রগতি ; পাখিরা অনায়াসে আকাশে উড়ে বেড়ায়, কোনো গঙ্গের সাহায্য না নিয়েই, যা এখনও পর্যন্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ অন্য দিক দিয়ে দেখা যায় যে আমরাও ওদের মতোই দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখবার জন্য তার সমস্ত দাবিগুলিকে মেনে চলেতে বাধ্য, তথাৎ কিছুই নেই, আমরাও আমাদের দেহের প্রয়োজনগুলির দাস হয়ে বেঁচে আছি। বাঁচবার জন্যে আমাদের স্থূল ধরনের খাদ্যগুলিকে গ্রহণ করতে হয় আর তাকে যথারীতি হজম করতে হয় ; যতদিন পর্যন্ত এমনি জড়বস্তুর উপর একান্ত নির্ভর ক'রে আমাদের বাঁচতে হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা পশুদের সান্নিধ্য হয়েই থাকবো, আমাদের জীবন পুরোপুরি দিবা হয়ে উঠবে না।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের পশু পুরোপুরি বোচাতে হলে তার মধ্যে এর চেয়ে আরো অন্য রকমের প্রাণশক্তি এনে ফেনতে হবে। এ কেবল কল্পনা মাত্রই নয়, ইতি-মধ্যেই তা কতক আংশিকভাবে বাস্তবে সম্ভব হতে পেরেছে ; আর যদি প্রকৃতই আমরা জড়কে রূপান্তরিত ক'রে তাতে দিব্যশক্তির বিকাশ আনতে চাই, তাহ'লে ঐদিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে এবং ক্যালডিয়ান যুগেও একবার এই ধরনের কথা বলা হয়েছিল ; তখন এমন আশ্চর্য মহিমাযুক্ত দেহের কথা বলা হয়েছিল যা তার গভীরতর চেতনার সাহায্যে ইচ্ছা করলেই রূপ বদলাতে পারবে, যখনকার যখন চেতনা দেহের ভিতর দিয়েও সেই ভাব প্রকাশ পাবে। জ্যোতির্বিদ্য দেহের কথাও তখন বলা হয়েছিল : ইচ্ছানাত্র এই জড় দেহ তীব্র জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবে। দেহকে এমন হাল্কা করা যাবে যে শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহা-য্যেই তা আকাশে বিচরণ করবে, ভিতরের তেজকে ইচ্ছানত বাইরে প্রয়োগ করবে, ইত্যাদি।

এমন ধরনের কথা আমরা শুনতে পাই অনেক। কিন্তু পৃথিবীতে তেমন কাউকে দেখা গেছে কি, যে বাস্তবিক ঐরূপ অসাধারণ শক্তিতে পৌঁছেছে ? বলতে পারি না, কিন্তু তবু সামান্যভাবে বা আংশিকভাবে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে যাতে প্রমাণ হয় যে এমন হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। তার থেকে আমরা এমনও ধারণা করতে পারি যে, আমাদের দেহের জড়যন্ত্রগুলি এমন এক শক্তিকে সত্যি রূপান্তরিত হতে পারে যাতে সেগুলি উপরকার শক্তিকেও ধারণ করতে সক্ষম হবে, আর কোনো বিশেষ ব্রহ্মায়নী ওপে জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলিও তারই দ্বারা অনায়াসে মিটে যাবে।

দেহের ভিতর কতকগুলি কেন্দ্র আছে এই কথা আমরা বলে থাকি যারা কয়েক রকম যোগ অভ্যাস করে তারা সেই সব কেন্দ্রের কথা উদ্ভবরূপেই জানে। সেই কেন্দ্রগুলি এমনভাবে তৈরি হয়ে উঠতে পারে যাতে তারই মাধ্যমে উপরকার শক্তি ও তার স্পন্দনপ্রবাহ এসে জড়বস্তুগুলির উপর সরাসরি নানা বাস্তব ধরনের ক্রিয়া প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

অলৌকিক শক্তির সাহায্যে গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করতে যারা অভ্যস্ত তারা বিলক্ষণ জানে যে কেমন ক'রে সূক্ষ্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্থূলের রাজ্যে বাস্তব ফল দেখাতে পারা যায়। এ কেবল সম্ভবই নয়, এমন কাজ বাস্তবিক করাও হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে একটা গুপ্তবিজ্ঞানই রয়েছে, তাকে ভালো ভাবে উদ্ধার ক'রে রীতিমত আয়তনের মধ্যে আনা দরকার, তখন তাকে এমনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে যাতে ওর সাহায্যে নতুন রকম দেহের সৃষ্টি হয়, আর তা নতুন রকমে ক্রিয়াশীল হয়ে জড়ের জগতে অতিমানস জীবনকে অভিব্যক্ত হতে সাহায্য করে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, অতীত করবার আগে নিজের যেটুকু স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে তার হারাই দেহের স্থূল ক্রিয়াগুলির উপর অধিকার এনে তাকে যথাসাধ্য সংযত ও স্থানীয়কৃত ক'রে তোলা। যারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়মিত দেহচর্চা ক'রে থাকে, তারা নিজেদের দেহকে এমনই বশে আনতে পারে যা রীতিমত শিক্ষা ভিন্ন অপর কারো হারা সম্ভব নয়। রাশিয়ার কসরতীদের দল যখন এখানে এসেছিল, আমরা সবাই তাদের বেলা দেখেছি, তারা অবলীলাক্রমে এমন সব কাজ দেখানো যা সাধারণ সামর্থ্যের পক্ষে ধারণার অতীত; অথচ তাদের সেগুলো করতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি, যেন খুব স্বাভাবিকভাবে অনায়াসে ক'রে যাচ্ছে। দেহকে অতখানি বশে আনা, দৈহিক রূপান্তরের দিক দিয়ে তাকে অনেকখানি বলতে হবে। অথচ এই সব কসরতী নিত্যন্তই পেশাদার, আধ্যাত্মিকের কোনো ধারই ওরা ধারে না, আর এই সব ভিনিসি শিখতে ওরা আধ্যাত্মিক প্রণালীর কোনো সাহায্যও নেয় নি। শুধু নিজেদের ইচ্ছা ও শিক্ষার হারাই স্থূল উপায়ে এতটা নৈপুণ্য লাভ করেছে। ওর সম্মুখে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ থাকতো তাহ'লে ওর চেয়ে আরো কত অদ্ভুত রকমের অলৌকিক ব্যাপার হতে পারতো।

কিন্তু জগতে একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে বলে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নৈপুণ্য কখনো একসঙ্গে থাকতে দেখা যায় না, যার একটা গুণ আছে তার অন্যটা নেই। কিন্তু দূরকম জিনিসেরই যদি একসঙ্গে অনুশীলন করা হয় তাহ'লে তার ফলে এমন এক ঐক্যমিলিত পাবে যা সাধারণ মনের কল্পনার অতীত।

ঠিক তাই নিয়েই আমরা চেষ্টা করছি।

কিন্তু যেননি তুমি ঐ ধরনের চেষ্টা করতে যাবে, অবনি দেখবে যে নানারকম অঙ্গ সংস্কার থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, ভৌতিক জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে তা এক দুর্লভ্য বিরোধ এনে ফেলছে, তারই বিরুদ্ধে তোমাকে তখন লড়তে হবে। মানুষের

চেতনার মধ্যে আগের থেকে এই বিরোধের ভাবটি এমনি মহুলাগত হয়ে আছে যে তাকে ঘোচাতে পারা খুবই কঠিন, এমন কি যারা শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা বুঝতে পেরেছে বলে মনে করে তাদের পক্ষেও। অনেকের কাছে আধ্যাত্মিক জীবন মানে শুধু ধ্যানই করা। এই নির্মুক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা থেকে অপসারিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো অতিনিদ্রাশক্তির পক্ষে সেই নির্বোধ মনোভাবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন নির্মলতাকে আটু রাখা খুবই কঠিন।

“অতিনিদ্রাশক্তি” থেকে তোমাদের ঐক্য শোনানাম, যাতে তোমরা এই সব হৃদয় সত্যের সমুদ্রীন হও, যাতে তোমরা সেই মানুষী ভাগ-ক'রে-দেখার মূর্ত্তার বিরুদ্ধে আর শাশ্বত সত্যকে তুলবোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়তে পারো।

*

*

*

প্রশ্ন : খেলার মাঠে অনেকে কু মতলব নিয়ে খেলতে আসে। নিজে জেতবার জন্য তারা অন্যকে জখম করে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোটোরাও এই দোষটি শিখছে। এ জিনিস নিবারণ করার উপায় কি?

উত্তর : ছোটোরা অজ্ঞান, মন্দ দৃষ্টান্ত দেখলে তারা তো শিখবেই। সুতরাং ওদের দলের যারা পাণ্ডা কিংবা ক্যাপ্টেন হবে তাদের পক্ষে উচিত, খেলা শুরু হবার আগে প্রত্যেক বারেরই তাদের বুঝিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, শ্রীঅরবিন্দের “অতিনিদ্রাশক্তি” বইখানিতে “আদর্শ খেলোয়াড়ের নীতি” সম্পর্কে ও “আদর্শ ছেলেনেয়েরা কেমন হবে” এই সম্পর্কে যে কথাগুলি লেখা আছে। সেই লেখাগুলি ওদের কাছে পুনঃপুনঃ শোনাতে হবে। আর মন্দ সংসর্গ থেকে, অসং বন্ধুদের সঙ্গে মেলানেশা থেকে ওদের সাবধান ক'রে রাখতে হবে। যেমনটি ওদের হওয়াতে চাইছে তেমনটি আগে নিজে ও তোমাকে হতে হবে। নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য, সংযম, নিজেকে ভুলে থাকা, সকল অবস্থাতেই হাসিমুখে থাকার দৃষ্টান্ত ওদের দেখানো চাই; নিজেরা নিজেদের ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অন্তর্বিধাকে তুচ্ছ করবে, অসন্তোষের ভাবকে আদৌ ঘেঁষতে দেবে না, ক্রিষ্ট কিংবা অহুস্ব বোধ করলেও তাতে বাহ্য বিরক্তি দেখাবে না। সব সময়ে সদয় থাকবে, অন্যের দুঃখ বুঝবে, মেজাজটি এমন ঠাণ্ডা রাখবে যাতে তোমাকে দেখে ছেলেরা ভয় পেয়ে ওটিয়ে না যায়; পাছে শাস্তি পেতে হয় এই ভয়েই তারা কপটতা শেখে, মিথ্যা বলতে শেখে, লুকোতে ও দুষ্টানি করতে শেখে। আর যদি সাহস পেয়ে নির্ভয়ে থাকতে পারে তাহ'লে তোমার কাছে তারা কোনো কথাই লুকোবে না, তুমিও তাদের অন্যায়সে বাধ্য ক'রে তুলতে পারবে।

সব চেয়ে দরকারী জিনিস হলো সং দৃষ্টান্ত। আর সেজন্য দরকার নিজেদেরই নিবৃত্ত হতে পারা, এমন ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ যাতে নিজেদেরও উন্নতির দিকে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া হয়। আর প্রকৃত পরিচালক হবার গুণগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারো,

এমন কি ছেনেদের সামান্য একটি দলের ভার নেবার নত্যাও যদি উপযুক্ত হও, তাহ'লে তার থেকেই যোগের পথে সার্থকতা আনতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাও তোনার অনেকখানি হয়ে যাবে।

সকল সমস্যাকে দেখতে হবে এই দিক দিয়ে, যাতে নিভেই নথো এমন আত্মাধিকার, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা এনে ফেলা যায় যে কোনো কিছুতে তোনার ব্যক্তিগত স্থিরতা ও সমষ্টিগত কর্তব্যের উপর কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া না ঘটতে পারে। নিজেই আগে ভুলতে হবে, এই হলো প্রকৃত নেতা বা পরিচালক হবার পক্ষে এক মূল কথা। নিজের দিকে কোনো নজরই থাকবে না, নিজের তরফে কোনো কিছু চাইবার থাকবে না, কেবল সমষ্টির দিকেই থাকবে দৃষ্টি, যারা তোনার উপর একান্ত নির্ভর ক'রে আছে তাদের যাতে ভালো হয় তাই করবে, সমগ্রভাবে তাদের সব্বক্ষেই ভাববে; ব্যক্তিগত লাভের দিকে না চেয়ে শুধু এই হবে তোনার কাজ।

যে একটা ছোটো দলের ভার নিতে পারে সে একটা বড়ো দলেরও ভার নিতে পারে, সে পরে একটা গোটা জাতিরও ভার নিতে পারবে, সমষ্টিগত মানুষের নেতা হবার জন্য সে প্রস্তুত হতে পারবে। এমন শিক্ষা পাওয়াই একান্ত দরকার, আর আমরা গোড়া থেকে এখানে সেই চেষ্টাই ক'রে এসেছি এবং এখনও করছি: তাই আমরা এখানে যত শীঘ্র পারি প্রত্যেক লোকের উপরে ছোটো বড়ো যাহোক একটা কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিই, যাতে প্রত্যেকেই তার যারা দলপতি হবার কিছু শিক্ষা পেয়ে যায়।

প্রকৃত নেতা হতে গেলে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া চাই, আনিচ্ছের ক্রিয়াগুলির বধাসম্বল বিলোপ করা ও আত্মপরতাকে বর্জন করা চাই। নেতা হতে গেলে অহমিকা দূর করতে হবে, আবার যোগের পথে চলতে গেলেও তাই হলো প্রধান ধাপ। সেই হিসাবে যদি দেখ তাহ'লে এই সব খেলাধুলার ব্যাপারও ভগবানকে উপলব্ধির দিক দিয়ে এক হিসাবে বিশেষ সাহায্যকারী।

কিন্তু খুব কম লোকেই এ কথা বোঝে। খেলাধুলার নত্যা স্থূল ব্যাপারে সাফল্য আনবার জন্য বাহ্য নিয়মগুলিকে পালন করবার যারা বিরোধী হয়, তাদের নথোই দেখা যায় নিজেদের দেহকে শাসনে রাখবার সব্বক্ষে শৈথিল্য। অথচ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের সিদ্ধির জন্য দেহসংযমই হলো তার গোড়াকার এক অপরিহার্য শর্ত। যারা দৈহিক উৎকর্ষের সব্বক্ষে অনন্যযোগী, এ বিষয়ের বিনুশতা না বুচলে তারা পূর্ণযোগের পথে এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না। সব চেয়ে আগে দরকার দেহকে বশে আনা, যোগের অপরিহার্য ভিত্তি স্বরূপে এ কাজটি আগে করা চাই। যে-দেহ তোনাকেই বশে রেখেছে সে তোনার শক্ত, সে হলো যত কিছু বিপৃথ্ব্যনার একটি আধার। আত্মার স্বনস্ত ইচ্ছাপঞ্জিই দেহকে শাসনে রাখবে, আত্মা কখনো দেহের শাসনে চলবে না। যখন জানবো যে এই কাজটা করা খায়াপ তখন কিছুতেই সে কাজ হতে দেব না। যখন একটা কোনো কাজ সম্পাদন করতে মনস্ত

করবে, তখন সে কাজ সম্পাদন করবেই। পদে পদে অক্ষমতা বা বিনুষ্ঠতা বা দেহের তরফের অসহযোগিতা দ্বারা আমার কোনো অতীত কাজই যেন বাহত না হতে পারে। এমন অবস্থাটি এনে ফেলতে হলে দেহকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা দরকার।

ধ্যানের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে উচ্চ স্তর থেকে এখানকার স্থূল জিনিসগুলিকে দেখতে পারলে সে খুবই ভালো কথা ; কিন্তু নিজের ঘরেরই যে মালিক হতে পারলে না সে তো এক দিক দিয়ে ক্রীতদাস হয়ে রইল।

*

*

*

আমাদের উন্নতির পক্ষে খেলাধুলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা কি দরকারী ?

উত্তর নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে তার দরকার আছে বৈকি, কারণ ওতে একটা সমুচিত উৎসাহ নিয়ে তোমরা খেলায় যোগ দাও, আর তাতে নিজের অহমিকাকে খর্ব করবার ও একটা সুযোগ মেলে।

সাধারণভাবে খেললে তাতে কেবল সাধারণ প্রতিক্রিয়াই আসবে, তোমার খেলার নৈপুণ্য তাতে কিছু বাড়বে না, নিজের কোনো অপটুত্ব ও দুর্বলতা থাকলে তো কোনোকালে ঘুচবে না, তাতে খেলার দ্বারা তোমার বেশী কিছু লাভ হবে না। কিন্তু যদি তুমি প্রতিযোগিতার উৎসাহ নিয়ে খেলায় নামো, অর্থাৎ যাতে তোমার নিত্য চেষ্টা থাকবে যে আনাড়ির মতো নিকৃষ্ট ধরনের না খেলা হয়, অথচ তার মধ্যে কোনো ঈর্ষা বা উচ্চাভিলাষ নেই, কেবল আছে সব চেয়ে ভালো ক'রে খেলার উৎসুক মনোভাবটি, অর্থাৎ ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে তোমার খেলা যাতে যথাসাধ্য ভালোভাবে উৎরে যায় সেই চেষ্টা, কিন্তু তবুও হেরে গিয়ে সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাতে কোনো দুঃখবোধ নেই,—এই রকমের খেলা হলে তা বাস্তবিকই উপকারী। ওতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়েই তোমার নিজের উপর একটা জোরালো দখল আসবে, আর ফলের সম্বন্ধে নিস্পৃহ হতে পারলে তাতেই তোমার চরিত্রকে সাধারণের চেয়ে উন্নত করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করবে। প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে তোমাকে সাধারণ সামর্থ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বাধ্য করে। আর তারই সুযোগে তুমি অনেক বিষয়ে এমন কিছু নতুন চেতনা পেয়ে যেতে পারো, যার সম্বন্ধে তুমি ঐক্লপে না না জানলে অচেতনই থেকে যেতে।

এ কথাটি কিন্তু কোনোমতে ভুললে চলবে না যে এই সব প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তোমার কিছু উন্নতি ঘটাবারই উপায় স্বরূপ। প্রতিযোগিতা না থাকলে সেখানে শুধু সময় নষ্ট। সেখানে তুমি যা কিছু করছ তা নিতান্ত মানুসী ভাবেই ক'রে যাচ্ছ। অর্থাৎ কোন কাজটি করবে তার উপরে নয়, কিন্তু কোন মনোভাব নিয়ে করবে তারই উপরে সব কিছু নির্ভর করছে।

তোননা সকলেই যদি যোগী হতে, আর সকল বিষয়েই চূড়ান্ত প্রয়াস করতে অভ্যস্ত হতে, কেবল যতটা সম্ভব তাই করা নয় কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী সাফল্য আনবার দিকে ঝোঁক থাকা, তাহ'লে এই সব প্রতিযোগিতা বা হারজিৎ বা পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতি কোনো কিছুই দরকার হতো না। কিন্তু শ্রীশ্বরবিন্দু যেমন বলেন, ছোটো ছোটো ছেলেরের ভোর করে যোগী হতে বলা যায় না, অথচ যখন তাদের প্রস্তুতির সময় তখন কিছু পুষ্টিকর জিনিস তাদের দেওয়া চাই, যাতে তাদের প্রয়াস চলে উন্নতির দিকে। কখনো কখনো বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও এই শৈশবের অবস্থাটি অনেক কাল পর্যন্ত থাকে।

গড়বারের বুলোঁতিনে যে কথা বলেছি তাই হবে আদর্শ “কোনো উচ্চাভিলাষ করা নয়, বড়ো হতে চাও না, কিন্তু যতটা পর্যন্ত হতে পারা তোনার পক্ষে সাধ্য তার জন্য সারা-ক্ষণই প্রাণপণ চেষ্টায় থাক।”। যে কাজই করতে যাওনা কেন, এই মনোভাব নিয়ে চলাই হলো পূর্ণ জীবনের পক্ষে আদর্শ অবস্থা। এটুকু যদি বুঝতে পেরে থাকো, তাহ'লেই পূণতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেলে। অবশ্য এ আদর্শকে পূর্ণ ঐকান্তিকতার সঙ্গে নেনে চলার পক্ষে কতকটা অভ্যস্তরীণ পরিণতি আগাও দরকার।

ইতিমধ্যে একেই তুমি তোনার কাজের মূত্র হিসাবে গণ্য ক'রে রাখতে পারো।

*

*

*

প্রশ্ন : খেলার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশী, কিন্তু প্রকৃত ব্যায়ামের দিকে খুব কন লোকে ঝোঁকে, এর কারণ কি ?

উত্তর : তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলাতেই প্রাণের তরফের পরিতৃপ্তি নেনে, তাতেই খেলায় অত আগ্রহ আসে। যেখানে খেলার উদ্বেজনা নেই, কেবল ব্যায়াম করার দিকেই আগ্রহ আনতে হবে, সেখানে তার মধ্যে কিছু যুক্তির গমর্ধন এনে ফেলা চাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধিই রয়েছে তার চেতনার শীর্ষস্থানে। সস্তার ভিতরকার সেই যুক্তির অংশটিই অন্য সমস্ত অংশের পরিচালনা করছে, কারণ সেই অংশেই থাকে শৃঙ্খলা-বোধ ও বিচারশক্তি, যা কিছু কাজ সং ও উপকারী নেনে হবে তা ঐ অংশটিই স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, আর অন্যান্য সকল অংশ তার আদেশ শিরোধার্য ক'রে তাকে অনুসরণ করবে।

অপরপক্ষে সস্তার যে প্রাণের অংশ, সে চায় কিছু উদ্বেজনা, সে চায় যত অপ্রত্যাশিত রকমের অ্যাডভেঞ্চার, সেইজন্যই খেলাধুলা এত চিত্তাকর্ষক হয়, কারণ ওতে প্রতিযোগিতা আছে, হারজিৎ আছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেবার একটা স্বপ্ন আছে। এগুলি সবই প্রাণ-গত প্রবৃত্তি, আর প্রাণসত্তাই রয়েছে সকল উৎসাহ এবং উদ্বেজনা এবং তৎপরতার মূলে; তাই যে কাজে কোনো অপ্রত্যাশিতের আকর্ষণ নেই, যাতে কোনো স্বপ্ন আর জয় পরাজয়ের ব্যাপার নেই, তাতে নিযুক্ত হলে প্রাণসত্তাটির অননি নিরুৎসাহের আলস্যে মূন পেয়ে যায়,

তখন যুক্তিবুদ্ধির তাড়না দিয়ে তাকে নিয়মিত 'ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদেশ যেন চলতে অভ্যস্ত করাতে হয়।

দৈহিক শিক্ষা গ্রহণের এক প্রধান উপকারিতা হলো এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ-প্রবৃত্তির বশ থাকার বদলে যুক্তিবুদ্ধির কথা মানতে দেহটি অভ্যস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেহের ক্রিয়াগুলি ভালোভাবে হতে পারবে না। শিক্ষাই তাকে সাবলীন করে দেবে। যেনন মনে করো ডায়েল প্রভৃতি নিয়ে দেহোন্নতির ব্যায়ামের বেনাতে—ওর মধ্যে উত্তেজনার জিনিস কিছুই নেই, স্তব্ধতা; নিয়মিত ও নির্মূল ক্রিয়ার দ্বারা যথার্থীতি তাতে অভ্যস্ত হতে হয়, ইচ্ছা অনিচ্ছার কিংবা ভালো লাগা-না-লাগার কিংবা প্রবৃত্তির ঐক্য আসার কোনো প্রশ্নই সেখানে নেই; সেখানে ঐ স্বাভাবিক সাক্ষ্যের সঙ্গে ক'রে যেতে হলে অগত্যা যুক্তিবুদ্ধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীবনের মধ্যে তোনাকে ঢুকতেই হবে।

সাধারণ রীতি এমন নয়। সাধারণত মানুষের জীবন প্রবৃত্তি ও কামনা ও তার প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে যদি তুমি দৈহিক কোনো কঠিন নিয়ম ধরে স্বশৃঙ্খলভাবে নিরবচ্ছিন্ন একটা কিছু প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকো, তাহ'লে তাতেই তুমি কতকটা যোগীর পর্যায়ে চলে গেলে। যেহেতু সেখানে খেয়ালের বা কামনার কোনো স্থান রইল না কিন্তু যেননি তুমি খেয়ালের বশে অনিয়ম অত্যাচার শুরু করলে, কোনো অসংযমের বা অসংযমকে প্রশ্রয় দিলে, অমনি আর তুমি দেহকে নিজের বশে রাখতে পারবে না, স্বাভাবিক ধারাতে আর কোনো উন্নতি করতে পারবে না। উপরন্তু তোর স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, স্তব্ধতা একটা পরিণতি আনার আদর্শের মূল ভিত্তিটাই লোপ পেয়ে যাবে। অনিশ্চিত ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তুমি কোনো কাজেরই হবে না। এমনভাবে প্রাণগত কামনাকে ও প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে কিংবা অন্যায় রকমের উচ্চাভিলাষ পোষণ করতে থাকলে দেহকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় আর তাতে অস্বস্তিও হতে হয়।

এ ছাড়া অজ্ঞান তো আছেই। জীবনধারণের মৌলিক নিয়মগুলি সর্বদা অনেকেই অজ্ঞ থাকে। সবাই অবশ্য জানছে যে বাঁচতে হলে কি করা চাই, কি কি শেখা চাই, যেনন আঙনে হাত দিতে নেই তাহ'লে পুড়ে যাবে, জলে নামতে নেই তাহ'লে ডুবে যাবে। কিন্তু জীবনের নিম্ন স্তরে যারা রয়ে গেছে, তাদের কামনার আবেগগুলিকে বাদ দিতে বললে তারা জীবনের আর কোনো আনন্দই পায় না, তাই জীবনে যুক্তিবুদ্ধির শাসন থাকা যে নিত্য দরকার এ কথা তারা স্বীকারই করে না, আর কিছুই জানা না হলেও স্বাস্থ্য ভালো রাখবার জন্য তার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এ কথা তারা গ্রাহ্যই করে না।

একজনের কথা স্মরণ হচ্ছে, কোনো সাহায্যকারীর কাছে নিযুক্ত হবার জন্য সে এখানে এসেছিল। লোকটিকে মনোনীত করা হবে কিনা জানবার জন্য আনার কাছে তাকে আনা হলো; সে এখানকার আশ্রম সর্বদা কিছু জানতে চাইলে, কেমন নিয়মে এখানে চলতে হয়, আনি কি ভাবে চলা পছন্দ করি। আমি দেখলাম সে অনবরত সিগারেট টানছে,

আর খুব বেশী পান ক'রে এসেছে, থেকে থেকে কেবলই জানাচ্ছে সে খুব ক্লান্ত, নাথেনা নাথেনা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। তাই দেখে আনি তাকে জবাব দিলেন : “এখানে থাকতে হলো তোমার সিগারেট খোঁকা ও পান করা একেবারে ছাড়তে হবে।” এই কথা শুনে সে অত্যন্ত অবাক হয়ে আবার দিকে চেয়ে বললেন, “সিগারেটও যদি না খাই, আর পানও যদি না করি, তাহ'লে আবার বেঁচে সুখ রইল কি।”

আশ্চর্য মনে হলোও এননিই সাধারণত দেখা যাবে। আনাদের কাছে হয়তো এ কথা খুব আশ্চর্য লাগছে, কারণ সিগারেট খাওয়া আর পান করার চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ভিনিসের সন্ধান আনরা জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কাননা পূরণ করতে পারাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যারা অত্যাচারী হয় আর নন্দ স্বভাব নিয়ে থাকে, তারা তাই দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে তারা খুবই স্বাধীন আছে, যা খুশি তাই করতে পারে, আর পৃথিবীতে অস্তিত্বের সার্বকটাই হলো সেখানে। কিন্তু বাস্তবিক তা ঠিক কথা নয়, ওগুলি হলো মানব-জীবনের ব্যতিক্রম, বিকৃতি, জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণাকে ঘুচিয়ে দেওয়া, ঐহিক জীবনের নাথেনা মনের ও প্রাণের যথেষ্টাচার এনে সেখানে একটা অস্বাভাবিক বিকার ঢুকিয়ে দেওয়া।

এমন বিকার আসা মানুষের রোগবিশেষ। এ রোগ পণ্ডদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না, কেবল যারা মানুষের সংসর্গে এসেছে আর মানুষের জীবনের প্রভাব যারা পেয়েছে তাদের মধ্যেই দেখা যায়। নতুবা পণ্ডরা তাদের সহজাত প্রেরণা থেকেই মানুষের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক ও নিয়মিত।

এ সম্বন্ধে একটা বেশ গল্প আছে। আলজিরিয়াতে কয়েকজন জঙ্গী অফিসার একটা বাদর পুমেছিল। বাদর তাদের সঙ্গেই থাকতো। একদিন খেতে বসে তাদের কি খেয়াল হলো, বাদরকে নন্দ খাওয়াতে হবে। তার সামনে এক গ্লাস নন্দ ঢেলে দেওয়া হলো। সে দেখলে এ ভিনিস সবাই খাচ্ছে, তাই সেও তা বিনা দ্বিধায় খেয়ে নিলে। তারপর টেবিলের তলায় শুয়ে পড়ে পোটের যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, তার অবস্থা প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়ল। সবাই দেখলে যে দেহপ্রকৃতি যার বিকারে অত্যন্ত হয়নি তার পেটে নন্দ ঢুকলে কেমন তার দুর্গতি হয়। বাদর স্বস্থ হয়ে উঠলে আবার একদিন তাকে ডিনারের টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। অফিসারেরা সেদিন আবার তার সামনে এক গ্লাস নন্দ দিলে। তখন সে করলে কি, যে লোকটি তাকে নন্দ দিয়েছিল তার উপর ঝাপসা হয়ে উঠে সেই নন্দের গ্লাস তৎক্ষণাৎ তার মাথায় ছুঁড়ে নারলে। দেখিয়ে দিলে যে ঐ বিষয়ে মানুষের চেয়ে সে বুদ্ধিমান।

ছোটোবেলা থেকেই ভোঁনাদের শিক্ষা দেওয়া ভালো যে দেহগত ব্যাপারে যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে, যদি সার্বক জীবন পেতে চাও আর দেহের কাছ থেকে পুরোপুরি কাছ আদায় ক'রে নিতে চাও। এখানে যোগের কথাও বলছি না আর আধ্যাত্মিক সাধনার কথাও বলছি না, বলছি এনি সাধারণ জীবনের কথা। যে মানুষ কোনো যুক্তি

বেনে চলে না, সে পণ্ডদের চেয়েও বেশী পাষাণ ; কারণ, পণ্ডদের মন ও বুদ্ধি না থাকলেও তবু তারা আপনা থেকেই তাদের জাতিগত সহজাত নিয়মগুলি সর্বদা মেনে চলে, তাদের পক্ষে যা সমুচিত ও রক্ষাকারী সেই ধরনের কাজগুলি তারা কিছু না জেনে স্বাভাবিক প্রেরণাতেই ক'রে যায়। কোনো কারণে যাদের তেমন প্রেরণানতো চলার প্রয়োজন হুচে গেছে—যেমন মনে করো যে সব গৃহপালিত জন্তু মানুষের সংসর্গে থেকে মানুষেরই হুকুমে চলতে শিখেছে—তাদের ঐ সব জাতিগত গুণগুলি নষ্ট হয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে কিছু কিছু বিকার এসে যায়। নতুবা মানুষের প্রভাব থেকে তফাতে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে যারা রয়েছে সেই সব জন্তু তাদের আপন জাতিগত নিয়মের বাইরে এমন কিছুই করে না যা তাদের নিজেদের দিক থেকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও হানিকর।

বিকার আসতে শুরু করে চेतন মনযুক্ত মানুষদের বেনাতেই। আর মানসিক ক্ষমতার অথবা অপব্যবহারের ফলেই তা হয়। মনশেচতনা থাকায় তাদের প্রকৃতির যতটা উন্মুক্তি হবার কথা, অত্যাচারের দ্বারা সেই বিশেষ স্বেযোগটুকু নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব মানব-শিশুর মধ্যে যখন প্রধান চিন্তার কাজ শুরু হবে তখন থেকেই তাকে আগে শেখানো দরকার যে তার যুক্তিকে মেনে চলতে হবে, যুক্তি জিনিসটাকেই খরে নিতে হবে মানুষ জাতির সহজাত অতিপ্রেরণার মতো। এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রশ্ন নয়, এ হলো সাধারণ জীবনের প্রশ্ন, মানুষের জীবনের গোড়ার কথা। প্রত্যেকের শিশুকাল থেকে জেনে রাখা চাই যে মনযুক্ত জীব হয়েই যখন সে জন্মেছে, তখন আপন প্রকৃতিকে অভিব্যক্ত করতে হলে জীবনকে তার যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে, প্রাণের বেয়ানের ঝোঁক অনুযায়ী নয়। এই প্রাথমিক শিক্ষাটি সকলকে সর্বত্রই দেওয়া উচিত।

আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকে প্রাধান্য ততক্ষণ পর্যন্তই দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দিবা-ইচ্ছা-নির্দেশক দিবা-চৈতন্যের রাজ্য না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

*

*

প্রশ্ন : “অতিমানস অভিব্যক্তি”তে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন,—“এমনও নিশ্চয় সম্ভব,—বহুকাল যাবৎ অভুক্ত থেকে আস্তার, মনের, জীবনের ও এমন কি দেহেরও শক্তিকে, তার ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখা, যোগের মধ্যে নিবিষ্ট কিন্তু সজাগ থাকা, দিবাগাত্রি গভীর চিন্তা করতে ও লেখাপড়া করতে সক্ষম হওয়া, যখন একেবারে পরিত্যাগ করা, দৈনিক নিবসিত আট ঘন্টা চলাফেরা করা ; অভুক্ত থেকেও এই সমস্ত রকমের শক্তিকেই পৃথকভাবে কিংবা এককালীন বজায় রাখা যায়, অথচ তবুও শরীরে কোনো দুর্বলতা আসবে না, ক্লান্তি আসবে না, কিংবা কোনোরকম ব্যতিক্রম বা বৈকল্য হবে না।” উপরোক্ত যদি এমন সম্ভব হয়, তাহ'লে কি আমরাও উপবাসের দ্বারা লাভবান হতে পারি না ?

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এখানে বিশিষ্টভাবে যে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, তা কেবল

সত্তাবা হিসাবেই বলা নয়, তিনি নিজে ঐরকম কাজ ক'রে দেখেছেন আর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই ওগুলি বলেছেন। কিন্তু কেবল সাহায্যে ওর অনুকরণ করতে থাকলে তুমিও যে অমনি ফল পাবে, এ কথা যদি মনে করো তাহ'লে খুবই ভুল হবে। এমন কি যদিও তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে অতটা পর্যন্ত সম্পাদন করতে সক্ষম হও, তবু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তাতে কিছু কাজ হবে না, যদি আগেই থেকে তোমার চেতনার রূপান্তর ও মুক্তিলাভ না হয়ে থাকে।

কেবল ঋগ্‌য়া ছেড়ে দিলেই আধ্যাত্মিক উন্মুক্তি হয় না। আগে মুক্ত হতে পারা চাই, কেবল ঋগ্‌য়ের উপর আসক্তি থেকে ও সকল রকম লোভ এবং আহাৰ্য্য সম্বন্ধে চিন্তার হাত থেকে মুক্তি নয়, মুক্তি ঋগ্‌য়া নিয়ে দেহের সকল দাবি থেকে পর্যন্ত। এমন অবস্থা এলে তোমার চেতনার কাছে এই সকল জিনিষ অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, চেতনার মধ্যে ওর কোনো স্থানই থাকবে না। কেবল তখনই উপবাস করা সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারবে, আর তার দ্বারা কাজও হবে।

এ কথা বলা চলে যে তখন সমস্ত ভুলে যেতে হবে; ভুলে যাবে এই কারণে যে তখন সমস্ত সমস্ত শক্তি একাগ্রভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবে একমাত্র আভ্যন্তরীণ উপনদ্ধির দিকে, আর তা হলো একেবারে পরিপূর্ণ অবস্থা, তার চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই। সম্পূর্ণ শক্তি সমস্ত সমগ্র সত্তা, এমন কি দেহের কোষগুলি পর্যন্ত সর্বক্ষণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে দিব্য-শক্তির স্পন্দনের সঙ্গে নিজেকে নিরিয়ে দেবার দিকে, যে অতিমানস শক্তি অভিযুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে বিশেষ যাবার দিকে। তেমনিভাবে বাঁচাই তখন হবে সত্যিকার বাঁচা, কেবল জীবনের অস্তিত্বের হেতু অর্থে নয়, কিন্তু তাই হবে জীবনের সকল সারের সার। কেবল জীবনের সার্থকতা মাত্রই নয় কিন্তু তার পূর্ণ আনন্দস্বরূপের পূর্ণ বিকাশ।

এ উপনদ্ধি যখন তোমার আসবে তখন ঋগ্‌য়া কিংবা না ঋগ্‌য়া, ঘুনোনা কিংবা না ঘুনোনা এর কোনো মূল্যই থাকবে না। তখন সব কিছুই হবে সমগ্র বিশ্বশক্তির নীলার সঙ্গে, এবং তারই অভিব্যক্তি স্বরূপ সকল প্রকার ঘটনাবলির সঙ্গে ও সকল মানুষদের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য রেখে চলা; যে দেহ আভ্যন্তরীণ সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে তার সামর্থ্য ও সাবলীনতা এমন আসবে যে সব কিছুর সঙ্গেই তা নিজা ঋগ্‌য়া খেয়ে যাবে। ঋগ্‌য়া পেল সে দেহ তা খেয়ে নেবে, কিন্তু না পেল সে বিষয়ে কোনো গ্রাহ্যই করবে না। ঘুনোতে পেল সে ঘুমিয়ে নেবে, না পেলো তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। সকল বিষয়েই এমনি হয়ে দাঁড়াবে।

কারণ ঐগুলোই তো প্রকৃত জীবন নয়। ঋগ্‌য়া ঘুনোনা প্রভৃতি হলো জীবনের কতকগুলি প্রণালী মাত্র, বিনা চিন্তায় ওতে তুমি অভ্যস্ত হয়ে গেছ। কতকটা যেমন গাছে ফুল ফোটান মতো ব্যাপার। আপনিই হয়ে যায়, ওর জন্যে কোনো ইচ্ছার প্রয়োগ লাগে না। চারিপাশে যেরন ঘটে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলিও আপনা থেকেই চলতে

থাকে। যে ঘটনাধারার মধ্যে অবস্থান করছি তারই তালে তাল মিলিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের এই ধারা আনরা চানিয়ে যাই, সে ছাড়া ওর নিজস্ব কিছু গুরুত্ব নেই।

কিন্তু এমন একটা সময় আসতে পারে যখন এর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই, অথচ এগুলো সমস্তই তুমি ক'রে যাচ্ছে, তোমার চেতনা তার দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত নয়। তেননি অবস্থা আগাই হলো আসল কথা। উচ্চতর জীবন লাভ করতে ইচ্ছুক মনের চেতনা থেকে উদ্ধৃত বাহ্য কোনো ক্রিয়াকলাপ কিংবা বেচ্ছাকৃত কোনো সংকল্পের দ্বারা চেষ্টায় নেগে থাকলে হয়তো তার কিছু ফল কোনো মানুষ পেতে পারে, যদিও তা আশানুরূপ নয়, কেবল এইটুকু তার মনে হতে থাকবে যে আবার পশুর কাটিয়ে উঠে এটা কিছু আনি হতে চাই—কিন্তু তবু এ তো সেই আসল জিনিসটি হলো না। আভ্যন্তরীণ আত্মহার মধ্যে এমনই ভূবে যেতে হবে যে এ সব বাহ্য জিনিসের বিষয়ে কিছু হ'স্ট থাকবে না, এ সব কোনো কিছু গ্রাহ্যের মধ্যেই আসবে না, মাননে কিছু এসে পড়লো তো খেয়ে নিলে আর না এলো তো খেলেই না—এমন যার হবে সেই ঐ বাধ্য হ'লে নিগ্রহের পাথে যাত্রা কৃচ্ছ-সাধকটির চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে যাবে, যদিও তার ধারণা ঐ কৃচ্ছসাধন তাকে দেবে সিক্তি।

আসলে চেতনার পরিবর্তন, অতিমানস শক্তির স্পন্দনের সঙ্গে নিরন্তরের জন্য নিশে থেকে আভ্যন্তরীণ মুক্তির অবস্থাতে চলে যাওয়া, এই হলো একমাত্র সত্যিকার সাফল্যদায়ক জিনিস। তখন তোমার প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, তোমার সত্তার প্রতি অংশের ইচ্ছা, তোমার সকল অংশের ও এমন কি প্রতিটি কোষের পর্যন্ত আত্মহার ফলে অতিমানস বা দিব্যশক্তির সঙ্গে এই মিলন সাধক হয়ে উঠবে। কোনটার দ্বারা কি ফল হচ্ছে সে কথা তোমাকে ভাবতেই হবে না। বিশ্বশক্তির ক্রিয়াতে ও তার অভিব্যক্তিতে যা হবার তা আপনা থেকেই অনায়াসে হয়ে যাবে; তাই নিয়ে কারো ভাববারই দরকার হবে না। একমাত্র করবার জিনিস থাকবে কেবল সেই দিব্যশক্তির সঙ্গে, সেই জ্যোতির সঙ্গে সেই সত্যের সঙ্গে, অতিমানস চেতনার সেই অব্যক্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ও সব দিক দিয়ে নিরন্তরের জন্য—হাঁ, নিরন্তরেরই জন্য—মিলনটি বজায় রাখা।

এরই নাম ঐকান্তিকতা। আর যা কিছু করো তা হবে কেবল অনুকরণ, কেবল একটা বাহ্যসাদৃশ্য, নিজেকে নিয়ে প্রহসন অভিনয় করা। ঝাঁটি জিনিস হলো উত্তরোত্তর পূর্ণ থেকে পূর্ণতর সত্ত্বতি, ক্রমে ক্রমে সত্যিকার হতে হতে যাওয়া। এখানে কোনো চালাকি চলবে না; বাস্তবিকই আপনাতে আপনি হয়ে উঠতে হবে।

একেই বলবো ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা।

*

*

*

প্রশ্ন : দেহরক্ষা সম্বন্ধে ওষুধের কি ক্রিয়া আর চেতনার কি ক্রিয়া ?

উত্তর : এ প্রশ্ন প্রায়ই আমাকে করা হয়, দেহরক্ষা সম্বন্ধে আনন্দের যখন আদর্শ

এইরকম,—সব কিছু করতে হবে এই জ্ঞান থেকে যে দেহটি হলো বিশেষ চরম সত্যকে ও সত্যের প্রকৃত রহস্যকে অভিব্যক্ত করবার যন্ত্রস্বরূপ, আর যখন এখানে এই শিক্ষাই দেওয়া হয় যে দেহের ভিতর দিয়ে ঐ সত্যকেই উপলব্ধি করা চাই, তখন এ আশ্রমে ডাক্তার এবং ডাক্তারখানা প্রভৃতিরই বা ব্যবস্থা কেন, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এখানে দেহচর্চাই বা শেখানো হয় কেন? পানীয় জলের ফিল্টার করা, ফলমূল প্রভৃতি জিনিসকে রীতিমত শোধন করে নেওয়া, এ সকল ব্যবস্থাই বা কেন?

এখানকার পক্ষে এই সকল ব্যবস্থা দেখলে বিপরীত ব্যাপার মনে হয় বটে, কিন্তু তা কেবল বাইরের থেকে। আমি তোমাদের অনেক বারই বলেছি যে যখনই মনে হবে দুটি আদর্শ বা দুটি পরিকল্পনা পরস্পরবিরোধী, তখনই চিন্তার উচ্চ স্তরে উঠে দেখবার চেষ্টা করবে কোথায় দুটির মিল হতে পারে, কোথায় তার ব্যাপকতর সমন্বয় ঘটতে পারে। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবটা খুবই সহজ হয়ে যায়, যদি তুমি মনরপ রাখো যে দেহপালন ও দেহ-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করবে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে তোমার চেতনা কেনন স্তরে আছে তারই উপর। দেহটি তো চেতনারই যন্ত্র নাকি, চেতনাই তার উপর সরাসরি ক্রিয়ার দ্বারা যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে।

সুতরাং তুমি যখন স্থূল দৈহিক চেতনাতেই রয়েছ, আর সেই স্তর থেকেই সব কিছু দেখছ, সেই চেতনা থেকেই সব কিছু ভাবছ, সে স্থলে দেহের উপর কাজ করবার জন্য স্থূল উপায়কেই গ্রহণ করতে হবে। সেই সকল স্থূল উপায়ের আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান, মানুষের হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে জড়ো করে; সে বিজ্ঞান যথেষ্টই জটিল, তার কার্য-প্রণালীও অসংখ্য রকমের, অনেক সময় তা পরস্পরবিরোধী ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, আর তা নিতাই পরিবর্তনীয় ও প্রগতিশীল।

তবে ওর দ্বারা নিশ্চিত সাফল্যও নেবে। মানুষ তার ঐকান্তিক অনুশীলনের দ্বারা, নিখুঁত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার এই বিজ্ঞানকে গড়ে তুলেছে। ওর দ্বারা জীবনের সংগঠন সম্বন্ধে—এবং দৈহিক ক্রিয়া ও দেহ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এমন অসামান্য তত্ত্বনিরূপণ নির্ণয় করেছে যে, যাত্রা তার নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে, তারা কেবল তাদের স্বাস্থ্যকেই অটুট রাখবে না, কিন্তু দেহের মধ্যে কোনো ক্রটি থাকলে তাও শুধরে নিতে পারবে, আর সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যোন্নতির দ্বারা কখনো কখনো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাও লাভ করবে।

আরো কথা এই যে মানুষের বুদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞান তার একাগ্র সত্যানুসন্ধিস্থার দ্বারা এমন অবদান এসে পৌঁছেছে যাতে সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মার্গের দৃষ্টিকোণেরও খুব কাছাকাছি সে গিয়ে পড়েছে। কিছুই অসম্ভব নয় যে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন দুই পক্ষই পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে একত্রেই মূল সত্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছেবে।

এখানে বক্তব্য এই যে স্থূল চেতনা নিয়ে দ্বারা স্থূলের স্তরে রয়েছে তাদের পক্ষে দেহ-

রক্ষা ও দেহ-চর্চায় জন্য স্থূল নিয়মে স্থূল উপায়গুলিরই সম্ভাব্যতার কথা উচিত। আর যেহেতু অধিকাংশ লোকই, এমন কি আশ্রমের মধ্যেও, এমন চেতনাত্তে অবস্থান করছে যাকে সম্পূর্ণ-রকমে না হলেও মোটামুটি স্থূল চেতনাই বলতে হয়, সেই হেতু এটাই স্বাভাবিক যে তারা সবাই দেহসংক্রান্ত ব্যাপারে বর্তমান স্থূল বিজ্ঞানকে সর্বতোভাবে মেনে চলবে।

অবশ্য তাকেই আমাদের চরম আদর্শ মনে করবো না, কিংবা ঐ আদর্শ ধরেই আমরা বরাবর অগ্রসর হতে থাকবো না। ওর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে, যেখানে চেতনা তার ক্রিয়া সম্পর্কে প্রধানত ক্রিয়া অংশত মানসিক হলেও তা খুলে রয়েছে উর্বরতর লোকের দিকে, আশ্রুহাভরে এক আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে, অতিমানস প্রভাবের দিকে।

যেমন সেইরূপ উন্নীতন ঘটবে অমন বর্তমান স্থূল জীবনের পর্যায় থেকে তুমি উপরে উঠে যাবে অর্থাৎ স্থূল জীবন অর্ধে আমি বলছি মানুষের পাখির কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা যতটাই হয়ে থাক তাই নিয়ে পুরোপুরি মনোগত ও বুদ্ধিগত যে জীবন; এই স্থূল জীবনের তরফের উন্নতি মানুষের সামর্থ্যের চরম শীর্ষে গিয়ে পৌঁছেছে, এই পাখির ও বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে মানুষ তার সর্বোচ্চ মানসিক ও বুদ্ধিগত প্রতিভাকে বিকাশ করতে পেরেছে; কিন্তু এর চেয়ে আরো উপরে উঠতে পারলে তুমি এমন এক মধ্যবর্তী স্থলে গিয়ে পৌঁছাবে যেখানে উপর নীচ দুই দিকেরই প্রভাব একত্রে মিশে ওতপ্রোত হয়ে যাবে। সেখানকার স্তরের ক্রিয়াগুলি যদিও তখনও মন ও বুদ্ধির মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে, কিন্তু তার মধ্যে অতিমানসের শক্তি ও তেজ এতটাই এসে পড়বে যে তখন তুমি স্থূলকে ছাড়িয়ে উচ্চতর সত্যের প্রকৃত যন্ত্ররূপ হবার উপযোগী হতে পারবে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে তারাই এই স্তরের চেতনাকে নিভেদের মধ্যে অনুভব করবে, যারা সদ্য বিকাশোন্মুখ অতিমানস শক্তিকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছে। তেমন চেতনা এসে পড়লে তখন দেহ ও তার আবেগের নামূলী অবস্থার চেয়ে উচ্চতর এক অবস্থায় যাবার সুযোগ পাবে। সত্যের মূল সত্যের সঙ্গে তখন সে এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবে যে, প্রতি মুহূর্তে সহজাত প্রেরণা ও বোধের দ্বারা সে আপনা থেকেই জানবে তার কখন কি করা দরকার, আর সেইরূপ করবার শক্তিও আপনা থেকে নিলে যাবে। আমি আবারও বলছি, যে ব্যক্তিই এখন অতিমানস শক্তি গ্রহণের উপযোগী ক'রে নিজেকে প্রস্তুত করবে, আর তাকে সমর্থন ক'রে তারই নির্দেশনাত্তে চলবে, সে নিশ্চয়ই ঐ উচ্চতর অবস্থার বিশেষ সুবিধাগুলি পেয়ে যাবে। নিতান্ত স্থূলের অধীন তাকে থাকতে হবে না।

তবে ওর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে; সেই হলো আদর্শ নক্ষা, সেই পর্যন্ত পৌঁছবার কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন; সে হলো দিব্য দেহে দিব্যজীবন লাভ করা। কিন্তু তার যথেষ্ট বিলম্ব আছে, সে কথাও তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন। তার জন্য সকল দিক দিয়ে পূর্ণ রূপান্তর আসা দরকার, আর সে কাজ এক মুহূর্তে হয় না; তাতে আরো অনেক সময়

নাগবে । কিন্তু একবার যখন সে অবস্থা এসে যাবে অর্থাৎ এখনকার চেতনা অতিনানস চেতনায় রূপান্তরিত হবে, তখন আর তার কোনো কাজ মনের ইচ্ছা কিংবা দৈহিক গামদ্যের উপর নির্ভর করবে না ; সমগ্র দেহসজ্জা অনায়াসে আপনা থেকেই তার আভ্যন্তরীণ সত্যকে অনিশ্র ও পুরোপুরিভাবে ব্যক্ত করতে থাকবে । ঐরূপ আদর্শের দিকে ও সেই আদর্শকে সার্থক করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন থেকে তোমাকে চনতে হবে ; তবে এমন নিখ্যা আশাকে যেন মনে স্থান দিও না যে বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, হঠাৎ একটা ম্যাজিকের মতো কোনো অলৌকিক উপায়ে সে রূপান্তর এমনি এসে পড়বে ।

তবুও তা সম্ভাবনা মাত্রই নয়, আর স্বপ্নের কোনো ভবিষ্যতের সম্বন্ধে স্তোকবাক্যও নয় । বাস্তবিক ভাই হয়ে আসছে, এমন কি এখনই তুমি তার কিছু চিহ্ন পেতে পারো । তেমনি কোনো মুহূর্তের কথা তুমি এখনই অনুভব করতে পারো—যখন আত্মার মতো তোমার দেহও আধ্যাত্মিক সত্তার স্পর্শ পেয়ে এবং চেতনার মধ্যে পরম পুরুষের সঙ্গুর্ভীন হয়ে সর্বতোভাবে কোষগুলি সমেত নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিয়ে তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলবে :

“আমাকে নাও তোমার ক'রে, আমি যেন সব দিক দিয়ে একেবারেই তুমি হয়ে যাই—অমুরন্ত, অসীম, শাশ্বতভাবে—বিনা বাধায় আর অতি সহজে ।”*

• অনুবাদক—ঈশতপতি ভট্টাচার্য

কর্ষত্যাগ অর্থাৎ ক্রূপ, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ । শরীরের নিবৃত্তি নিবৃত্তি নহে, নির্দিষ্টতাই প্রকৃত নিবৃত্তি ।

(ধর্ম ও জাতীয়তা)

শ্রী অরবিন্দ

১৫ই আগস্টের তাৎপর্য

ত্রিমা

গত ১৪ই আগষ্ট ১৯৫৭, বুধবার, আশ্রমের খেলার মাঠের সান্ধ্যবেলায় শ্রীমা বললেন :

আজ এই সন্ধ্যায়, কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, আনার ইচ্ছা, আননা শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যস্মৃতির ধ্যান করব। কি ভাবে আননা তাঁকে আনাদের অন্তরে জীবন্ত রাখতে পারি, আর তাঁর চিরন্তন উজ্জ্বল, প্রাণবান এবং সক্রিয় চেতনায় তিনি আনাদের জন্যে যা কিছু করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, যে স্নানহান সিন্ধির কথা তিনি শুধু পৃথিবীতে ঘোষণা করবার জন্যেই নয়, স্বয়ং তাঁকে বাস্তবে সিন্ধু করে তোলবার জন্যেও এসেছিলেন এবং এখনও করে চলেছেন, সে জন্যে তাঁর প্রতি কি ভাবেই বা আনরা যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

আগামী কাল তাঁর জন্ম-বাধিকী—বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর জন্ম এক চিরন্তনজন্ম।

★

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যায়, শ্রীমা আবার বললেন :

আজ আনাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। গত ১৪ই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের ঠিক আগের রাতে, আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, তারই একটি কথা সযত্নে প্রশ্ন। প্রশ্নটি আমার বেশ ভাল লেগেছে, তার কারণ আমার ও কথাটি ছিল কিছুটা পরিমাণে সাংকেতিক, অতি সাধারণ ভাষায় ব্যবহারের দরুন তা প্রায় ব্যর্থক হয়ে উঠেছে, এবং ইচ্ছা করেই অননটা করা হয়েছিল, যাতে প্রত্যেকে যে যেমন চেতনায় বাস করছে সেই অনুসারে ওটির অর্থ বুঝতে পারে। ইতিপূর্বে অনেকবার আমি তোমাদের এ সযত্নে বলেছি যে, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চেতনায় থেকে লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, এবং এই যাত্রা বললাম যে, এ কথাগুলি ইচ্ছা করেই সরল করে ব্যবহার করা হয়েছে, ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে অর্ধের যে জটিলতা এগুলির রাস্তা প্রকাশ করতে চাই, তারই উপযুক্ত বাহন এরা হতে পারে।

এই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তবে সেগুলি পরস্পরের পরিপূরক,

এবং যদি সকল স্তরের অর্থ একই সঙ্গে বুঝতে পারা যায়, তাহলেই তা পূর্ণাঙ্গ হবে। ঠিক ঠিক বুঝতে পারা হল বহুর যুগপৎ ধারণা, যেখানে সকল অর্থই হৃদয়ঙ্গম করা হয়, বোঝা হয়, একই সঙ্গে। কিন্তু তা প্রকাশ করবার সময় আমরা বাধ্য হই একটির পর আর একটি করে বলতে, অনেক শব্দ যোজন্য করতে এবং বহু ব্যাখ্যা দিতে, যেহেতু আমাদের ভাষা অতি দরিদ্র। এখনও ঠিক সেই কাজই আমি করতে যাচ্ছি।

সেদিন যেখানটায় আমি শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন সম্বন্ধে বলেছি “চিরন্তন জন্মদিন,” প্রশ্ন করা হয়েছে, “চিরন্তন” অর্থে আমি কি বলতে চেয়েছি।

অবশ্যই যদি অক্ষর ধরে কথাগুলির অর্থ করতে যাও, তাহলে “চিরন্তন জন্মদিন” বলতে এমন বিশেষ কিছুই বোঝায় না। কিন্তু তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি কি ভাবে বাক্যটির একটি স্থূল অর্থ হতে পারে, একটি মানসিক অর্থ হতে পারে, একটি চৈতন্যিক অর্থ হতে পারে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ হতে পারে,—এবং যথার্থই সে সব অর্থ সক্রিয় ভাবে যুগপৎ বর্তমান।

স্থূলভাবে, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যতদিন এই জগতের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এই জন্মের ফল স্থায়ী হবে। শ্রীঅরবিন্দের জন্মের ফল অনিদিষ্ট কাল ধরে উপলব্ধ হবে। তাই আমি “চিরন্তন” শব্দটি ব্যবহার করেছি, কাব্যের ধরণে।

মানসিকভাবে, এই জন্মের স্মৃতি অনন্তকাল স্থায়ী হবে। যুগ যুগ ধরে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম এবং তার দরুণ যা কিছু ঘটছে তা মানুষ মনে রাখবে।

অন্তঃপুরুষের দিক থেকে, এই জন্ম অনন্তকাল ধরে, যুগের পর যুগ, এই বিশৃঙ্খল ইতিহাসে ফিরে ফিরে ঘটবে। শ্রীঅরবিন্দের এই যে জন্ম, এ হল এক অভিব্যক্তি, যা যুগে যুগে একবার করে ঘটে থাকে; অর্থাৎ এই জন্ম প্রতি বারেই অধিকন্তু কিছু, আরও অর্থও কিছু, আরও পূর্ণাঙ্গ কিছু সঙ্গে করে আনে, কিন্তু তা পাখিব একটি দেহে ওই একই অবতরণের, একই প্রকাশের এবং একই নবজন্মের নীলা।

অবশেষে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে বলা যায় যে, এ হল এই পৃথিবীতে অনন্তের জন্ম। কারণ প্রতিবারেই যখন অবতার এক মানবদেহ গ্রহণ করেন, তখন স্বয়ং অনন্তই এই পৃথিবীতে বৃত্ত হন।

এতগুলি অর্থ ওই দুটি শব্দের মধ্যে বিধৃত: “চিরন্তন জন্ম”।

যাক, শেষ করার আগে তোমাদের একটি কথা বলি। যখন তোমাদের মনে হবে “তাইত, এর মানেটা কী, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না, এটা ভাল করে প্রকাশ করা হয় নি,” তখন সে কথা বলার আগে, মনে মনে নিজেদের বোলো যে, হয়ত, চেতনার যে স্তরে থাকলে এটা বুঝতে পারা যায়, আমি সে স্তরে নেই, এবং চেষ্টা করো, শব্দগুলির পিছনে নিহক শব্দ ছাড়া অন্য কিছু আবিষ্কার করতে।

শিশুসঙ্গে শ্রীমা

প্রশ্ন—না, “যোগসনন্য” বইটিতে রয়েছে, “অন্তরের চৈতন্যপুরুষের এক হোমাগিকে তুলতে হবে মানিয়ে। সব-কিছুর উপর দিব্য-নাম লিখে দিয়ে তারই মধ্যে আচ্ছাদিত দিতে হবে সে সবকে।” এর মানে কি তাহলে যে, চৈতন্যপুরুষের আশ্রয় সর্বদাই অনলছে না ?

শ্রীমা—না, অনুক্ষণ সে অনলছে না।

প্রশ্ন—তাহলে তাকে কি করে আনাতে হয় ?

শ্রীমা—চাই অতীপা, চাই উন্মত্তির জন্যে ঐকান্তিক ইচ্ছা, চাই পূর্ণতার জন্যে জীবন্ত প্রেরণা। বিশেষ করে, উন্মত্তিলাভের জন্যে এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই অধিকে প্রবলিত করে তোলে। যাদের প্রচণ্ড মনের জোর তারা যদি সত্যিকার তাদের আধ্যাত্মিক উন্মত্তির এবং আত্ম-শুদ্ধির দিকে ঝুরিয়ে দেয়, তাহলে আপনা-আপনিই তাদের তিতরকার এই আশ্রয় অনল ওঠে ; এবং প্রত্যেকটি দোষ যা তারা সংশোধন করতে চায়, প্রত্যেকটি উন্মত্তি যা তারা লাভ করতে চায়, সে সবকে যদি তারা এই আশ্রয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে অগ্নিময় হয়ে ওঠে। এটা কান্দনিক চিত্রনাম নয়। সুক্ষ্মদেহের স্তরে এ হল একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। সেখানে মানুষ এই শিখার উদ্ভাপকে অনুভব করতে পারে, তার ভ্যোতিক দেখতে পর্যন্ত পায়। আর যদি কখন মানুষের প্রকৃতিতে কিছু একটা তার উন্মত্তির পথ আগলে ধাঁড়ায়, তখন সেটাকে এই আশ্রয়ের মধ্যে ফেলে দিলে তা অনলতে আরম্ভ করে, আর তখন তার শিখাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—মানুষ যখন বাধাবিঘ্নের মাঝখানে পড়ে যায়, তখন কি ভাবে সে আনন্দ অনুভব করতে পারে ?

শ্রীমা—ঠিক ওই ভাবেই। বাধাটা যদি হয় ব্যক্তিগত কিছু একটা, এবং মানুষ যদি তা উৎসর্গ করে, অর্থাৎ এই শুদ্ধির হোনকুণ্ডে তাকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করে, তাহলে অবিলম্বে তার মধ্যে উন্মত্তিলাভের আনন্দ জেগে ওঠে। অকপটে যদি উৎসর্গ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ আনন্দের ঝলক তার মনে ঠেলে ওঠে। আর ঠিক সেইটাই ত করা দরকার। হতাশাস না হয়ে কিংবা বিলাপ না করে, যদি অকপটে উৎসর্গ কর, যদি শুদ্ধির এবং রূপান্তরের জন্যে ঐকান্তিক প্রার্থনা কর, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করবে হৃদয়ের মধ্যে এক আনন্দ জেগে উঠছে। বাধাটা যখন প্রচণ্ড দুঃখের আকারে দেখা দিয়েছে, তখনও এটি করলে প্রচুর সুফল লাভ হয়। তখন দেখতে পাবে যে, তীব্র বেদনার পিছনেও রয়েছে এক দিব্য আনন্দ।

প্রশ্ন—অলৌকিক-শক্তি সম্বন্ধে যে লোক সচেতন নয়, সে কি বহু দূরের কোন বিপন্ন লোককে সাহায্য করতে বা তাকে রক্ষা করতে পারে ? যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তা করার উপায় কি ? চিন্তার কি কোন কাজ আছে এ ক্ষেত্রে ?

শ্রীমা—বেশ, তাহলে আমরা কোন অলৌকিক পদ্ধতির কথা বলব না। যদিও, সত্যি

কথা বলতে গেলেন, যা কিছুই দুটির অগোচরে ঘটে গেলিই, সংজ্ঞার দিক থেকে, হল অনৌকিকের এলাকাভূত। তবে কার্যত দুটি পদ্ধতি আছে, এবং তারা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। তবে তাদের পৃথক ভাবেও প্রয়োগ করতে পার, যদি একটির চেয়ে আর একটির প্রতি তোমার চিন্তা বেশী হয়।

এ কথা গতি যে, চিন্তা হল এই পদ্ধতি দুটির অন্যতম, এবং খুবই মূল্যবান। আমি তোমাদের আগে অনেকবার বলেছি যে, কেউ যদি খুব পরিকার করে এবং খুব জোর দিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার দ্বারা সে একটি মানসিক রূপকে গড়ে তোলে, এবং এইভাবে গঠিত প্রত্যেকটি মানসিক রূপই হল এক একটি জীবন্ত সত্তা। সে মোটেই আর তার শৃঙ্খল ইচ্ছা-ধীন থাকে না তার থাকে নিজস্ব জীবন, এবং সে মনোজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। আমি বলছি না যে, তুমি তোমার মন দিয়ে গড়া রূপকে এই চোখ দিয়ে দেখতে পাবে, কিন্তু মনের জগতে সে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, এবং তার সে অস্তিত্ব হল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন।

যদি তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মন দিয়ে একটি রূপ গড়ে তোল, তাহলে সেটার সমগ্র জীবন উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই নিযুক্ত হবে। সুতরাং তুমি যদি দূরের কোন লোককে সাহায্য করতে চাও, তাহলে খুব পরিকার করে, সুনির্দিষ্টভাবে এবং সজোরে, যে ধরণের সাহায্য তুমি করতে চাও এবং যে সব ফল তুমি লাভ করতে চাও, শুধু তার একটি রূপ মনে মনে গড়ে তোল। দেখবে তার ফল হবেই। বলতে পারি না যে তা সর্বদাই ঘোল আনা ফল দেবে, কারণ মনোজগতে এই ধরণের অসংখ্য জীবন্ত সত্তা ভিড় করে আছে, এবং স্বভাবতই তারা পরস্পর ঠোকাঠুকি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেই। কাজেই, যার জোর সব চেয়ে বেশী এবং যে সব চেয়ে বেশী নাছোড়বান্দা, তারই হবে জিৎ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কে তাহলে এদের, অর্থাৎ মনের এই সব আকৃতিদের, শক্তি দান করে, এবং নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকতে প্রেরণা দেয়? তার উত্তর হচ্ছে, মানুষের অন্তরের হৃদয়-আবেগ এবং তার একাগ্র ইচ্ছাশক্তিই দেয় ওই শক্তি এবং প্রেরণা। যদি তোমার জানা থাকে, কি ভাবে তোমার মন দিয়ে গড়া 'ওই ভাব-রূপের সঙ্গে বেশ ঋনিকতা আবেগ, স্নেহ, কোমলতা, প্রেম, একাগ্র ইচ্ছা-শক্তি এবং জীবন্ত কর্তব্য-শক্তিকে যোগ করে দিতে হয়, তাহলে সেটির সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই হল প্রথম পদ্ধতি। যারাই চিন্তা করতে পারে, এটি তাদেরই হাতের নুঠোর মধ্যে রয়েছে, আবার যারা ভালবাসতে জানে তাদের হাতের নুঠায় ত এটি আরও বেশী করে রয়েছে। তবে ওই যে বললাম, এর শক্তি হল সীমাবদ্ধ, এবং পৃথিবীময় প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা বর্তমান।

ধরো এমন যদি হয় যে, তোমার এসব বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই, কিন্তু যদি দিব্য-করণার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, যদি এ প্রত্যয় থাকে যে দিব্য-করণা বলে এই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু আছে যার সাড়া পাওয়া যায় প্রাণীর দ্বারা, অন্তরের আকৃতির দ্বারা, প্রাণের আধা-

হনের দ্বারা, তাহলেই ত হল। তোমার মন দিয়ে তুমি যা চাও তার রূপটি গড়ে তুলে, যদি সোচ্চারে সেই দিব্য-করুণার কাছে উৎসর্গ কর, এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে তা জানাও, এবং তাঁকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বল, এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেনই, তাহলে তোমার সাফল্যের খুবই সম্ভাবনা।

চেষ্টা কর, তাহলেই দেখতে পাবে ফলটা কি হয়।

প্রশ্ন—কিন্তু না, দিব্য-করুণার সাহায্যের জন্যে যখন কেউ অকপটে প্রার্থনা করে, তখন সে বিশেষ একটা ফলের আশা করেই তা করে, নয় কি?

শ্রীমা—না, সব সময়ে নয়। সেটা নির্ভর করে প্রার্থনার অভিপ্রায়ের উপর। যদি কেউ কেবল করুণাকে বা ভগবানকে আরাধন করে এবং তাঁর উপর নিঃস্বার্থে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয়, তার মানে, সে কোন বিশেষ ফলের আশা করে না। বিশেষ কোন ফলের আশা থাকলে, প্রার্থনাটিকে সেইভাবে ব্যক্ত করতে হবে। নির্দিষ্ট কিছু একটা চাইতে হবে। দিব্য করুণার উদ্দেশ্যে তোমার যদি শুধুই থাকে এক নিরাট অভীপ্সা, তুমি যদি তাঁকে আরাধন কর, তাঁর কাছে অনুরণন কর, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু না চাও, তাহলে সেই করুণাই তোমার জন্যে কি করা উচিত বা অনুচিত তা স্থির করবেন, তুমি করবে না।

প্রশ্ন—সেই ত সবচেয়ে ভাল, নয় কি?

শ্রীমা—ওটা ত হল আর এক প্রশ্ন। অবশ্যই সেটা হয় সব চেয়ে ভাল। কিন্তু সত্যিই কেউ যদি বিশেষ করে কিছু পেতে চায়, তাহলে তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করাই ভাল। যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে দিব্যকরুণাকে আরাধন করার, তাহলে সেটাকে স্পষ্ট করে এবং পরিষ্কার করে ব্যক্ত করাই উচিত। কিন্তু কারণ যদি হয় পূর্ণসমর্পণের অবস্থা, সে যদি নিঃস্বার্থে অথবাভাবে দান করতে চায়, নিঃস্বার্থে শুধু সে করুণার হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত,—“তিনি যা চান তাই করুন,” এই যদি হয় তার অন্তরের ভাব, সে ত খুবই ভাল কথা। তারপর কিন্তু দিব্য-করুণা যা করলেন তাই নিয়ে তর্ক করা চলবে না। আমি 'ওটা করেছিলাম, এটা পাব বলে, এ কথা তাঁকে বললে চলবে না। কারণ, সত্যিই যদি তোমার মনে মনে কিছু একটা পাবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তা অকপটে, সরলভাবে এবং যে-ভাবে তুমি বস্তুটিকে দেখছ সেই ভাবে, ভাষায় প্রকাশ করে বলাই উচিত। তারপরের ব্যাপার ছেড়ে দাও দিব্যকরুণার হাতে, তিনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন কি না, সে তার তাঁর উপর। তুমি যেটা চেয়েছিলে তা পরিষ্কার করে প্রকাশ করেছ, এবং তা মোটেই কোন দোষের ব্যাপার নয়।

ব্যাপারটা তখনই দোষের হয়ে পড়ায়, যখন, তুমি যা চেয়েছিলে তা তোমাকে দেওয়া হল না বলে তুমি বিদ্রোহী হয়ে ওঠ। সত্যিই সেটা করা উচিত নয়। বরং সেই ত হল সময় যখন বোঝা উচিত যে, তোমার কামনা বা অভীপ্সা খুব পরিষ্কার করে ফুটে ওঠেনি, কিংবা হয়ত তুমি এমন কিছু চেয়েছ যা ঠিক তোমার পক্ষে উপকারী নয়। আর ঠিক সেই সময়েই বুদ্ধিমানের মতন কেবল বলা উচিত, “বেশ, প্রভু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক”।

কিন্তু যদি তুমি অন্তর দিয়ে অনুভব করে থাক, এবং অন্তর দিয়ে স্থির করে থাক, তাহলে তা প্রকাশ করায় কোনই দোষ নেই। বরং সেটাই ত স্বাভাবিক।

উদাহরণস্বরূপ ধরো, তুমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছ, কিংবা একটা ভুল করেছ, এবং সত্যি সত্যিই, অকপটে তুমি আর সেটা করতে চাও না, সে ক্ষেত্রে সে কথা গোচর করায় আমি ত দোষের কিছু দেখছি না। বরং আন্তরিক ভাবে, যথার্থ অকপট হয়ে, দিব্য-করুণার কাছে যদি প্রার্থনা করে সে কথা বল, তাহলে তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনাই সব চেয়ে বেশী।

এ কথা কখন ভেব না যে, ভগবান তোমার কথায় কর্ণপাত না করতেই ভালবাসেন। তিনি মোটেই তা করেন না। কোনটা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক তা তিনি তোমার চেয়ে ঢের ভাল করেই বুঝতে পারেন। ব্যাপারটা যখন একেবারেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখনই কেবল তিনি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। নইলে, যে যা চায় তা দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?

(এবার মা তাঁর নিজের কাছের কাগজে লেখা প্রশ্নগুলি হাতে নিয়ে দেখে বললেন :)

এখানে আমার কথার তিনটি উদ্ধৃত অংশ রয়েছে, যেগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য অথবা ব্যাখ্যা করতে আমি অনুরক্ত হয়েছি। শেষেরটি, আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করলাম, ঠিক যেন তারই ভের। তাই সেইটি দিয়েই আরম্ভ করি।

পাঠ্য্যংশটি এই রকম :

“মানুষ যদি দিব্য-করুণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যদি সর্বভূতে, সর্বত্র তাঁকে চর্চন করে, তাহলে আনন্দের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দময়, শক্তির পুত্র, অনন্ত সৌভাগ্যের আকর। আর সেটাই হবে দিব্য-কর্মের শ্রেষ্ঠ সহযোগিতা করা।”

বোধ করি, প্রশ্নকর্তা শেষের লাইনটিরই ব্যাখ্যা চায়।

প্রথমটি উপলব্ধি করা সোজা ব্যাপার নয়। ও হল অনুক্ষণ বেড়ে ওঠার, অনন্যমন্য হয়ে অবিরাম পর্যবেক্ষণের, এবং নিরন্তর অভিজ্ঞতার ফল।

আমি তোমাদের এ কথাটা বহুবার বলেছি : যখন নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে তুমি চলেছ, তখন নাঝে নাঝে প্রায়ই এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে, যেগুলি তুমি যা চেয়েছিলে ঠিক তার উল্টো, তোমার মতে যেটা সবচেয়ে ভাল তার একেবারে বিপরীত ; এবং সে জন্যো প্রায়ই তখন তুমি অনুভাপ করে মনে মনে বলো, “এ রকমটা না হয়ে যদি ও রকমটা হোত, বা সে রকমটা হোত, তা হলে কতই না ভাল হোত !” যেমন ছোটখাট ব্যাপারে, তেমনই বড় বড় ব্যাপারে—ওই একই কথা। তারপর অনেক বছর কেটে যায়, ইতিমধ্যে কত কি ব্যাপারই না ঘটে যায়, ততদিনে তোমারও উন্নতি হয়েছে, তুমি আগের চেয়েও বেশী সচেতন হয়ে উঠেছ, আরও ভাল করে সব বুঝতে শিখেছ, তখন তুমি পিছন

ফিরে তাকাও এবং দেখতে পাও, প্রাথমিক সৰ্বিস্ময়ে, আরও অনেক পরে, খুশি হয়ে দেখ যে, সেই সব অদ্ভুত যত ঘটনাচক্র, যেগুলো তখন তোমার কাছে সম্পূর্ণ অসদৃশ্যকর এবং প্রতিকূল বলে ঠেকেছিল, সেগুলো আসলে তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো যা হবার তাই হয়েছিল, কারণ যে উন্মুক্তি তোমার লাভ করা দরকার ছিল তারই দিকে তোমাকে এগিয়ে দিতে সেগুলি এসেছিল। আর সত্যিই যদি তুমি এতটুকুও বুদ্ধিমান হও, তাহলে তুমি মনে মনে বলবে, “সত্যিই, অসীম তাঁর করুণার বিস্তার”। তারপর যখন এই অভিজ্ঞতাটি তোমার বেশ কিছু বার হবে, তখন তুমি বুঝতে আরম্ভ করবে যে, মানুষ যতই অন্ধ হোক, আর দূশ্যত বাহ্য ব্যাপারগুলো যতই জটিলজনক হোক, ভগবৎ-করুণাই সর্বত্র কর্মরত, এবং তার ফলে, প্রতিটি মুহূর্তে, পৃথিবী সেই মুহূর্তে যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায়, সবচেয়ে ভাল যা হওয়া সম্ভব তাই হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে বা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ আমাদের অন্ধ করে রেখেছে বলে, আমরা এটা বুঝতে পারি না। কিন্তু একবার এটা দেখতে আরম্ভ করলে এমনই এক অপূর্ব অবস্থা লাভ হয়, যার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ, সকল বাহ্য রূপের পিছনে মানুষ তখন এই সীমাহীন, অপূর্ব, সর্বশক্তিমান দিব্য-করুণাকেই দেখে, যিনি সব কিছু জানেন, সব কিছুকে সংগঠন করেন, সব কিছুকে সুব্যবস্থিত করেন এবং আমাদের পরিচালিত করছেন সেই উর্ধ্বতন লোকের দিকে, আমরা তা চাই বা না চাই, আমরা তা জানি বা না জানি; তিনি আমাদের পরিচালিত করছেন ভগবানের সঙ্গে মিলনের দিকে, সেই দিব্য সত্তার চেতনা লাভ করার দিকে এবং তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবার দিকে।

এইভাবেই মানুষ তখন বাস করে দিব্যকরুণার মধ্যে এবং তাঁর সান্নিধ্যে, পরিপূর্ণ আনন্দে, মুগ্ধ বিস্ময়ে, অদ্ভুত শক্তির অনুভূতি লাভ করে; এবং সেই সঙ্গে থাকে তার এক বিশ্বাস, যা এতই শান্তিপূর্ণ, এতই সমগ্র যে, কোন কিছুই তাকে টনাতে পারে না।

আমার মনে হয় শেষের বাক্যটির ব্যাখ্যা বাক্যটির মধ্যেই রয়েছে। তার কারণ, মানুষের গ্রহণসামর্থ্য এবং আনুগত্য যখন এই রকম উচ্চ অবস্থায় থাকে, তখন সেটা দিব্য-কর্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বাহ্য দেবার শক্তিকেও অতুখানি কনিয়ে দেয়। সুতরাং দিব্য-কর্মের সহযোগিতা করার দিক থেকে এই হল সবচেয়ে ভাল সহযোগিতা যা মানুষ করতে পারে। কারণ সে তখন বুঝতে পারে তাঁর কি ইচ্ছা, এবং সমগ্র চেতনা দিয়ে সেই ইচ্ছারই অনুগমন করে।

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

৩

জীবনের ত্রিপুরা

দেখতে পাচ্ছি, জীবনের অভিব্যক্তির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বের আশ্রয় হল দেহ, দ্বিতীয় পর্বের মন, আর তৃতীয় পর্বের চিৎশক্তি। পর-পর তিনটি পর্বের অভিব্যক্তি ঘটনেও বস্তুত তারা ওতপ্রোত। নিত্যন্ত দেহনির্ভর যে-জীবন, তারও একটা মনোময় দিক আছে, অধ্যাত্ম-বোধের একটা আভাস তাতে আছে। আবার অধ্যাত্মজীবনও দেহ-মনের পার্থক্যে একেবারে অস্বীকার করে চলতে পারে না। অবশ্য উৎকর্ষের দিক দিয়ে চিৎশক্তিই বড়। কিন্তু সেই শক্তি সবিধৃত হবে দেখে এবং মনকে করবে তার ঐশ্বর্যের বাহন, এই হল প্রকৃতি-পরিণামের ধ্রুব নিয়তি।

দৈহ্যজীবন মনোজীবন আর অধ্যাত্মজীবন—এই তিনের মাঝে প্রাণের বিকাশ হচ্ছে যথাক্রমে জড়শক্তি মনঃশক্তি আর চিৎশক্তিকে আশ্রয় করে। তিনটি শক্তির পরিণামে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা বলাই বাহুল্য।

দৈহ্যজীবনের বিনিয়োগ হল জড়শক্তি। সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে, তার চলনের স্বাভাবিকতায় রয়েছে তনোবৃত্তির প্রভাব। তনোবৃত্তির বিশিষ্ট ধর্ম হল অপরিবর্তনীয়তা আর পৌনঃপুনিকতা। সে যাকে আঁকড়ে ধরে তাকে ছাড়তে বা তার রদবদল করতে চায় না। তার মাঝে যে-গতি আছে, তা হল আবর্তগতি। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তিতে সে অভ্যস্ত। আনন্দের অধিকাংশ শারীর-ক্রিয়ায় এই ধরন। এটা যখন মনে সংক্রান্ত হয়, তখন মনও জড়ধর্মী হয়ে যায়। নতুন কোন ভাব গ্রহণ করতে না পারা, দিনের পর দিন একই ভাবনার জ্বার কেটে চলা, অভ্যস্ত আচারের মাঝে একটা নুতন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা—এই হল তানসিক মনের লক্ষণ।

দৈহ্যজীবনের দর্শন হল জড়বাদ। সমাজের অধিকাংশ মানুষই জড়বাদী। তারা মুখ্যত চায় দেহের স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাণবাসনার পরিতৃপ্তি। মনের শিক্ষাও তাদের চাই, জীবনে আধ্যাত্মিকতার ঋণিকতা বরাদ্দ থাকাও দরকার—কিন্তু সে-সমস্তই তাদের পক্ষে গতানুগতিক। যা চিরকাল চলে এসেছে তা-ই চলুক, তারা একটি কথাও বলবে না। কিন্তু নতুন-কিছুর আনন্দানী করতে গেলেই তারা কোলাহল শুরু করবে। তাদের মনের সজীবতার লক্ষণ কেবল ঐখানেই। গুরু-পুরোহিতের নারফতে আধ্যাত্মিকতার যেটুকু

বারোয়ারি ব্যবস্থা আছে, তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তুমি তার চাইতে বেশী যদি কিছু করতে চাও, তাহলে গন্যাসী হয়ে সনাত্ত থেকে বেরিয়ে যাও, কিন্তু সনাত্তের বুকে বসে ধর্ম নিয়ে বাড়িবাড়ি করা চলেবে না—এই তাদের রায়।

জড়শ্রিত দৈহ্যজীবনের এই হল রূপ। তবে মন আর চিৎশক্তি একেও যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে না, তা নয়। গতানুগতিক সনাত্তজীবনে মনের জড়তা ভাঙবার চেষ্টা করেছে পাশ্চাত্য জগৎ, আর প্রাচ্য জগৎ চেয়েছে চেতনার জড়তা ভাঙতে। পাশ্চাত্য-প্রভাবে মানুষ মনশীল হয়ে উঠেছে, তার বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা শাণিত হচ্ছে দিন-দিন, স্বাপুঙ্খের বদলে জীবনের নানাদিকে এসেছে প্রগতির জোয়ার। তাতে বাইরের জীবনের জৌলুস বাড়ছে সত্যি, কিন্তু অন্তর হয়ে যাচ্ছে দেউলিয়া। ফলে ভ্রমবেশী বর্ষরতাই দিন-দিন সনাত্তে কায়ম হতে চলেছে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য জগতে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন চেতনার জড়তা ভাঙতে গিয়ে সনাত্তের মাঝে ইহবিন্দুধীনতার যে-আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে সনাত্তজীবনকে করেছে পদ্ধ এবং দুর্বল। অতি দুদিনেও সেখানে দেবমানবের আবির্ভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মন 'ও চেতনা জড়তা এবং গতানুগতিকতার মোহকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মোটের উপর বলা যেতে পারে, জীবনের জড়তা ভাঙতে গিয়ে মনঃশক্তি বা চিৎশক্তি কোথাও পুরাপুরি সফল হতে পারেনি আজও, তিনের মাঝে একটা সার্বভৌম সামঞ্জস্যও ঘটেনি। মনঃশক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, চিৎশক্তি সেখানে পিছিয়ে রয়েছে; আবার চিৎশক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, মনঃশক্তি সেখানে রয়েছে পিছিয়ে। এই হল বর্তমান জগতের হাল।

এখনও মানুষের জীবন অপরাপ্রকৃতির শাসনকেই মেনে চলে। পরাপ্রকৃতির প্রেরণা অনুভব করে মুষ্টিমেয় লোক; আর পরাপ্রকৃতিকে লাভ করে যারা স্বরাট্ হন, তাঁরা 'কোটিকে গোটিক'। তবে কিনা অপরা-প্রকৃতির গভীরেও পরা- এবং পরমা-প্রকৃতির আকৃতি নিগূঢ় হয়ে আছে। তাইতে মানুষ স্বাপুঙ্খের চাপ ঠেলে ফেলতে চায়, তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে আসে প্রগতির তাগিদ। প্রগতিকেই আমরা বলতে পারি সার্থক মনোবর্ধন। জড়প্রবী জীবনেও প্রগতির প্রেরণা আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য সূদূরপ্রসারী নয়। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সে থেমে যায়, তারপর জীবনটা গতানুগতিকতার আবর্তে কেবল পাক খেয়ে চলে। সনাত্তের অধিকাংশ মানুষেরই এই দশা। তারা বস্তুনির্ভর, তাই বদ্ধ; তাদের মুক্তি তাদের অজানা। এই মুক্তির আশ্বাস যারা পেয়েছেন, তাঁরা মনশী। বস্তুর চাইতে ভাব তাঁদের কাছে বড়। উপনিষদের ভাষায় তাঁরা 'স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ত তৈজসঃ'। বাস্তব-জগতের প্রাত্যহিক ত্রুচ্ছতার উৎসর্গে একটা ভাবময় স্বপ্নজগতের উজ্জ্বলতায় তাঁরা বিচরণ করেন, বাইরের বস্তুকে উপলক্ষ্য করে অন্তরে ভাবের সূদূরপ্রসারী দিগন্তই তাঁদের

কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জড়াশ্রমী জীবনের ইন্দ্রিয়তর্পণকেই তাঁরা পুরুষার্ধ বলে ভাবতে পাবেন না, তাঁদের পুরুষার্ধ হল 'সত্যঃ শিবঃ সুন্দরম্'। জ্ঞানে কল্যাণে এবং শ্রীতে জীবন উচ্চল সার্থক এবং সুন্দর হয়ে উঠবে, এই তাঁদের কাম্য।

কিন্তু মনোজীবনের এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সবসময় সহজ হয় না। উৎকর্ষের দিক দিয়ে জড়শক্তির চাইতে মনঃশক্তি বড়। মন তা বোঝেও, কিন্তু জড়ের বাধাকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সত্য বলতে মন রয়েছে একটা তটস্থভূমিতে—তার সামনে আলো, পিছনে অঁধার। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পিছনের সংস্কার পদে-পদে তার বাদী হয়ে দাঁড়ায়। আলোর আভাসই সে পেয়েছে, কিন্তু তার উৎসে তো এখনও পৌঁছতে পারেনি। তাই তার শক্তি হয় বন্ধা, তার সাধ যতটুকু থাকে সাধা ততটুকু থাকে না। জ্ঞান কল্যাণ আর সৌন্দর্যের সাধনায় তাই আমরা গত্যোর পরিপূর্ণ এবং বিস্কন্ধ রূপটি বড় একটা দেবতে পাই না। মনস্বীর দর্শনে বিজ্ঞানে বিশুদ্ধিত্বের সাহিত্যে নিষেধ এই মনের প্রগতির যুগেও দেখি ভেজালের ছড়াছড়ি। মনস্বিতা আচকাল মানুষের মনকে বাতায় কিন্তু তাতায় না, অধুনক জ্যোতির পিথার তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে না। সমস্ত অগং জুড়ে মনস্বিতার সাধনায় একটা অবকাশের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আবার মনস্বিতাকে বিস্কন্ধ রাখতে গিয়ে গুহাঙ্কিত থাকলেও চলবে না। ভাব অস্তরের সম্পদ, তার জন্য অতর্কীয়তা একান্ত প্রয়োজন—একথা সত্য। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে ভাব যদি তার উপর জয়ী না হতে পারে, তাহলে সে নীরক্ত ও নির্বীৰ্য হয়ে জীবনের বিচিত্র এবং পরিপূর্ণ বিকাশে বাধাই হয়ে দাঁড়ায়। আলোর উৎস আকাশে, কিন্তু সেই আলোই আবার মাটিতে নেমে এসে তার বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল হয়ে ফোটে। তাতে যেমন মাটির সাধকতা, তেমনি আলোরও সাধকতা। পৃথিবী আর দুলোক দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড যুগলক সত্য। বৈদিক ঋষির ভাষায় পৃথিবী মাতা, দুলোক পিতা। দুয়ের সামরসায় দিব্যজীবন-সাধনার মূল সূত্র।

এই সামরসায় জীবনে সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র অধ্যাত্তাবনায়। মনোময়-জীবনের উর্ধ্ব রয়েছে অধ্যাত্তজীবন। কিন্তু উর্ধ্ব থেকেও দেহ-প্রাণ-মনের জীবনকে সে আলো হয়ে জড়িয়ে থাকবে, সঞ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত করবে—এইখানেই তার সাধকতা। দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে যদি হয় পাণ্ডিত্যজীবন, তবে মানসোত্তর দিব্যজীবন তার প্রতিষেধক নয়, পরিপূরক। অথচ সে আছে দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে। এই ছাপিয়ে থাকাকে আগেই বলেছি স্বোত্তরণ (self-exceeding)। আর জীবনের মাঝে বে-গতিধর্ম রয়েছে, স্বোত্তরণই হল তার প্রচোদক। বে-জড় প্রাণের আধার, তার স্বাণুকের মাঝেও স্বোত্তরণের প্রবেগেই আবার্তের সৃষ্টি হয়। নিজের চারদিকে পাক খেতে-খেতে একসময় সে ছিটকে

পড়ে। নিজেকে তখন সে ছাপিয়ে গিয়ে ফোটে প্রাণরূপে। প্রাণ জড়াত্মীয়, আবার জড়াতীতও। প্রাণের মাঝেও একটা আবর্তগতির সৃষ্টি হয়, একই প্রাণনীনার আনন্দ দেখি অন্তরীণ পুনরাবৃত্তি। সেটা হল তার জড়ধর্মের বাঁধুনি। কিন্তু তারই মাঝে ফোটে বৈচিত্র্য, আবার তাকে ছাপিয়ে ফোটে স্বতন্ত্র মন। স্বোত্তরগণের এইখানেই শেষ হয় না। বস্তুর মোহ কাটলে মন পায় ভাবের সন্ধান, পায় মানসোত্তরের আভাস। এইখানেই অধ্যাত্মজীবনের শুরু।

মনোজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রথম সফুরণ হয় ইষ্টাধর্মের (values) বিবিধ বোধ থেকে—যা হতে জাগে আবার আদর্শের (ideal) বোধ। আদর্শবোধ গতানুগতিকতার বন্ধন হতে মানুষকে মুক্তি দেয়। সে বলে, যা আছে তা-ই নিয়ে খুশী থাকতে পারছি না, তার চাইতেও ভাল একটা-কিছু চাই। এর মূলে রয়েছে সেই স্বোত্তরগণের প্রবেশ। প্রাণের বুড়কা মনের মাঝে এসে ধরল ভাবময় প্রগতির রূপ। জীবনের 'অর্ধ'র একটা উৎকর্ষণ ঘটল তাতে। কিন্তু চাওয়ায় পূর্ণ তৃপ্তি তো এতেও হল না। অর্ধ পেলান বটে, কিন্তু পরমার্ধ কোথায়—এ-জিজ্ঞাসা মনের মাঝে থেকেই গেল।

পরমার্ধ কি? না যে-পাওয়াতে সব চাওয়া নিটে যায়। দেহের চাওয়া, প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া—সব। নক্স করে দেবেছি, যার চাওয়া, সে নিজে তা মেটাতে পারে না, তার চাইতে উর্ধ্বতন কোনও শক্তির কাছে তার হাত পাততে হয়। দেহের চাওয়া মেটায় প্রাণ, প্রাণের চাওয়া মেটায় মন। তর্পণের এই ধারা ধরে যদি চলি, তবেই জীবন সার্থক হয়। প্রাণকে তৃপ্ত করতে গিয়ে যদি মনের দিকে না তাকাই, তাহলে যা পাই তা হল প্রেয়—শ্রেয় নয়। প্রেয়ের সম্বোধনে বাধা আছে, অবসাদ আছে, বেশীদিন তাকে টিকিয়ে রাখতে পারা যায় না। প্রকৃতি যেন বলে, প্রগতির মান করে তুনি ঢুকে পড়েছ কানাগলিতে, এবার ফিরতে হবে। কিন্তু প্রেয়কে যদি শ্রেয়ের অধীন করি, তাহলে এ-বিপত্তি ঘটে না। প্রাণের চাওয়াকে যদি মনের অধীন করি, তাহলে তার ভোগ শুরু হয়। ইন্দ্রিয়ের তর্পণের চাইতে মানসতর্পণ এইজন্য বড়। কিন্তু মানসতর্পণও তো চরম নয়। কেন নয়?

নয় দুটি কারণে। প্রথমত মনের দর্শন সঙ্কীর্ণ। সে দেখে ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, তাই তার সৃষ্টি দিগন্তের গাছপালায় ঠেকে যায়। যদি সে আরও উর্ধ্বে উঠতে পারত, তাহলে আরও বেশী দেখতে পেত। তখন সে জীবন-সমস্যার সমাধানও করতে পারত আরও সুশৃঙ্খলভাবে। দ্বিতীয় কারণ, মন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়—তার অহঙ্কা আছে, মনতা আছে, যেগুলি প্রাণ-বুড়কারই রকমকের। নিরাসক্ত না হতে পারলে উর্ধ্বশক্তির সঙ্গে যোগ সহজ হয় না। শক্তি আসে বটে। কিন্তু তার ক্রিয়া হয় ব্যানিশ। তাইতে জীবন-সমস্যার স্বর্ধ্ব সমাধান সম্ভব হয় না।

ব্যাগ্ধিবোধ আর নিরাসক্তি—এই দুটি হল অধ্যাত্মজীবনের বনিয়াদ। শুদ্ধ-চেতন্যের এদুটি স্বভাবধর্ম। এরা যেন সূর্যকিরণের মত। সূর্যের কিরণ অবাধে সব জায়গায় ছড়িয়ে

প'ড়ে সব-কিছুকে অভিযুক্ত এবং সন্তোষিত করে—কিন্তু তবুও সব-ছাপিয়ে তার একটা স্ব-তন্ত্র গভা আছে। এই পরিব্যাপ্ত স্বাতন্ত্র্যই তার শক্তির উৎস।

মনো-চেতনাকে ছাপিয়েও তেননি আছে এক বিরাট ও স্রাট অধ্যাক্ষেপেচেনা। প্রাকৃত-মনের সদরমহলে আনরা তার দেখা পাই না, কিন্তু তবুও সে আছে। আছে ব্রহ্মা হয়ে, প্রশান্ত হয়ে। আনাকে আনি দেখি না যতক্ষণ, ততক্ষণ প্রাকৃত-শক্তির অন্ধতাড়নায় আনি জীবনের পথ অতিবাহন করি। আনার ব্যবহার তখন যান্ত্রিক, স্বধনুঃখের স্বন্দে আন্দোলিত। যান্ত্রিকতার চরম পরিণাম অবগাদ, চেতনার আচ্ছন্নতা। সেই আচ্ছন্নতার নাখে দেখা দেয় অপূর্ণ বিকার। চেতনার আচ্ছন্নতা আর নৃত্য একই কথা। তাইতে প্রাণের পরাভব। আর এই স্বপুর্বিকারে দেখি মনের অসিস্তির সূচনা। প্রাণ আর মন অঙ্গপ্রবৃত্তির তাড়নায় নিধুঁতির গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, এই হল অপরা-প্রকৃতির শাসিত জীবনের পরিণাম। এ-সর্বনাশ হতে বাঁচাতে পারে ঐ বৃহৎ ও স্রাট আনোর চেতনা। স্বরাভের চেতনা প্রাণকে নৃত্যের পাশ হতে মুক্ত করে, এক লোকোত্তর অঙ্গর অমৃত জ্যোতিঃ-সত্তার বোধে জীবনকে নির্ভয় করে। নৃত্যকে তখন দেখি এক শাস্তপুরুষের অপরা-প্রকৃতির ছায়ায় নান্য নাত্র। দিনরাত্রির আবর্তনের নত জন্মনৃত্যের আবর্তন আছে এই পাথিব পরিমণ্ডলেই; কিন্তু উর্ধে সৌরমণ্ডলে শুধুই আনো। তেননি আবার বৃহত্তের চেতনায় মনকে করে বিকারমুক্ত। ঐচ্ছীর্ঘ মনে বাসনার সংঘাত থেকে বিকার দেখা দেয়। যে বিকার-গ্রস্ত, সত্যকে সে পুরাপুরি দেখতে পায় না, দেখে তার একদেশ নাত্র। একদেশকে একান্ত করে তুললে ভিত্তর-বাইরে সংঘাত অনিবার্য। তাইতে সমাজে আনরা একটা গোটা মানুষ প্রায়ই দেখতে পাই না, দেখি শুধু ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি আর ঠোকাঠুকি। নিজেকে পুরাপুরি পেতে হলে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উর্ধে নিজেকে তুলতে হবে, নিকিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন গান্ধব চেতনার পেছনে আবিষ্কার করতে হবে আকাশের নত উদার স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্ত এক পরচৈতন্যের পটভূমিকা। সেই বৃহত্তের নাখে ক্ষুদ্রের বিন্যাস তখন হবে স্খলন ও স্বয়মংস, জীবনের অনুভবে ঘটবে ঋতচ্ছন্দের আবির্ভাব। একটা বৃহৎ ভাবনার শাসনে চারদিকটা যখন গুচ্ছিয়ে আসে, কর্মশক্তিকে তখনই গিচ্ছির দিকে পরিচালিত করা চলে। একনাত্র বৃহত্তের আবেশেই সর্বাঙ্গীণ গিচ্ছি আসতে পারে এবং তা-ই অধ্যায়সাধনারও লক্ষ্য।

নিরাসক্ত বৃহত্তের চেতনায় আবিষ্ট অধ্যায়জীবন হবে মনোজীবন এবং দৈহাজীবনেরও নিয়ন্ত্রা—এই হল আনাদের জীবনাদর্শ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বাবহারিক জীবনের সঙ্গে অধ্যায়জীবনের একটা বিরোধ দেখা দেয়। গতানুগতিক দৈহাজীবনকে ছাপিয়ে যেমন প্রগতিধর্মী মনোজীবন, তেননি তাকে ছাপিয়েও হল পূর্ণতাসিদ্ধ অধ্যায়জীবন। এ-জীবনসাধনার দুটি প্রধান অঙ্গ হল অস্তর্ভূখীনতা এবং নিঃসঙ্গতা। নিজের ভিত্তরে না ছুবে গিয়ে বিরাটের সত্যকে কখনও আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করা যায় না। তাই প্রত্যেক

অধ্যায়সাধকের জীবনেই আসে গুহাহিত হবার একটা পর্ব। প্রাকৃত-জীবনেও যেমন দেখি, যে-কোনও শিকাননিশির সময় মানুষকে কতকটা বিবিক্ত হয়ে থাকতে হয়, এক্ষেত্রেও তা-ই। বরং অধ্যায়সাধনায় সিদ্ধি অত্যন্ত দূর হলে তার শিকাননিশির পর্বটা দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন বাইরের জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কাও আছে।

এদেশে হয়েছেও তা-ই। মানুষ গুহাহিত হতে গিয়ে নিজেকে অগৎ ও জীবন হতে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়েছে। স্বদুর্দর্শের আকর্ষণ যে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে-না-কাউকে এমনিতর দেওয়ানা করে তুলবে, সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু একে সর্বসাধারণের অনুকরণযোগ্য আদর্শ বলে প্রচার করা চলে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অনধিকারীর অনুকরণের ফলে আনাদের দেশে ক্রমে আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মাঝে একটা দস্তুর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার পরিণাম কারও পক্ষে শুভ হয়নি। এতে একদিকে আধ্যাত্মিকতায় যেমন ভেজান টুকেছে প্রচুর, অন্যদিক দিয়ে তেমনি ব্যাবহারিক জীবনও হয়ে গিয়েছে দেউলিয়া। এই অসামঞ্জস্য দূর না করতে পারলে যে আনাদের কল্যাণ নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সব বিভ্রান্তিরই একটা ফলিত দিক থাকে, স্মৃতির; অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও তা থাকবে। অন্তরে যা পেয়েছি তাকে বাইরেও রূপ দেব, একা হয়ে যা পেয়েছি তাকে সবার করে তুলব—এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির ফলিত দিক। এর মধ্যে শেষের প্রচেষ্টাই আনাদের দেশে চলে, প্রথমটা চলে না। অধ্যাত্মসিদ্ধি একটা লোকোত্তর কিছু, আমাদের অধ্যাত্মগুরুরা এই ভাবনাতেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চান। কিন্তু সে যে সব মানুষের জীবনের সব-কিছুকেই জারিত করতে পারে, সে যে আকাশ-বাতাস-আলোর মত সহজ ও সঙ্গীভবন হতে পারে, এদিকটার উপর তারা ততটা জোর দেন না। ফলে বাস্তবের যে কুরুক্ষেত্রেই আমাদের জীবন-বত্থের সার্থি—একথা আমরা ভুলে গিয়েছি। গীতায় একদিন যে-যোগসমন্বয়ের অনুশাসন উচ্চারিত হয়েছিল, তা আমাদের সমাজে আজও ফলপ্রসূ হয়নি।

এইজন্যই সমন্বয়ের কথা আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। লোকোত্তরের পথে এতদিন নিঃসঙ্গ হয়ে চলে আমরা যা লাভ করেছি তা বর্জন করতে চাই না, কিন্তু তাকে সর্বজনীন এবং জীবনের সর্বত্র সহজে পরিব্যাপ্ত করতে চাই। আমরা জানি, চিৎপ্রকাশই বিশ্বের পরমার্থ। কিন্তু এও আমাদের স্বীকার করতে হবে, সে-প্রকাশের আধার হল এই জড়, আর আমাদের মন হল দূয়ের মাঝে সেতু। চিত্তের ঐশ্বর্যকে যদি দেখে-প্রাণে-মনে নানিয়ে আনতে পারি, এবং সে-সিদ্ধিকে কেবল ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে সহজের ছন্দে সবার মাঝে যদি ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলেই আমাদের সাধনার সত্যক চরিতার্থতা ঘটবে। হয়তো তার জন্য পুরাতনের ভিত্তিতেই একটা নতুনতর কৌশলের আবিকার করতে হবে। কিন্তু তার আগে একবার দেখা যাক আমাদের পুরাতন সিদ্ধির পুঁজি কি এবং কতটুকু।

৪

নানা পথ

যোগের কতকগুলি সার্বভৌম অভ্যুপগম আছে, তাদের কথা আগে বলে নিই।

যোগশক্তি বস্ত্ত বহাপ্রকৃতিরই স্বরূপশক্তি। প্রকৃতির মাঝে উত্তরায়ণের একটা প্রবেগ আছে, অচেতন এবং অর্ধচেতন অবস্থায় তা নহয়। পূর্ণচেতন হয়ে সেই বেগকে কিপ্র করে তোলাই হল যোগের লক্ষ্য। আর এই যোগের অধিকারী মুখ্যত হল ব্যক্তি। ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই প্রকৃতি তার যোগশক্তিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। যোগ প্রকৃতির শক্তি হলেও পুরুষই তার সাধক। আবার এই পুরুষ পুরুষোত্তমেরই আশ্রিত। সূত্রাং যোগের সমস্ত প্রস্থানে তিনিই যোগেশ্বর। একদিকে প্রকৃতি, আরেকদিকে যোগেশ্বর—যোগের সাধক রয়েছে নাট্যখানে। যোগেশ্বরের প্রসাদেই প্রকৃতিকে মোহন করে সে যোগশক্তিকে আবিষ্কৃত এবং আয়ত্ত করে মুন্যায়ী প্রকৃতিকে চিন্ময়ী করে তুলছে—এই হল বিশ্বযোগের ছক। যোগেশ্বর যোগী আর প্রকৃতি, যোগের সাধনায় এ-তিনের অদ্বাদ্বিসম্বন্ধ অপরিহার্য। প্রকৃতি যোগের ক্ষেত্র, যোগেশ্বর তার অধিষ্ঠাতা এবং রূপান্তরকৃৎ ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যোগী তার নিমিত্ত—এই বুদ্ধিতে যোগের সাধনা করতে হবে। আবার আনাদের আরপ্রকৃতির রয়েছে তিনটি বিভাব—ভাবনা, বেদনা (feeling) এবং সঙ্কল্প। যোগে এই তিনটি বিভাবেরই রূপান্তর ঘটবে। একেকটি বিভাবের উপর জোর দেওয়াতে একেকটি বিশিষ্ট যোগপন্থার উদ্ভব হতে পারে। আনন্ডা সাধারণত তাদের যথাক্রমে বলি জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ। হঠযোগ এবং রাজযোগকে কর্মযোগের মধ্যেই ধরা হয়। আধারের একেকটি বৃত্তিকে ভিত্তি করে একেকটি যোগের অনুশীলন চলতে পারে। এককালে আনন্ডা তা ই করে এসেছি। তাছাড়া প্রাচীন সমস্ত যোগেরই লক্ষ্য ছিল চেতনার একটা লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু পূর্ণযোগ সমস্ত যোগেরই সাধনা এবং সিদ্ধিকে আংশিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের মাঝে একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়ে লোকোত্তর সিদ্ধিকে লোকায়ত করতে চায়—এই তার বৈশিষ্ট্য।

এই গেল গোড়ার কথা। এখন সংক্ষেপে একেকটি যোগপন্থা নিয়ে আনোচনা করা যাক্।

প্রকৃতিই যোগের ক্ষেত্র। আনাদের আরপ্রকৃতিতে আনন্ডা এই ক'টি স্তর দেখতে পাই—মেহ, নাড়ীতন্ত্র (যা প্রাণশক্তির বাহন), নন এবং ভাব। মেহ এবং নাড়ীতন্ত্রকে ভিত্তি করে যে-যোগ, তার নাম হঠযোগ। ননকে ভিত্তি করে রাজযোগ। আর ভাবকে ভিত্তি করে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও গীতোক্ত কর্মযোগ।

হঠযোগ আর রাজযোগে অঙ্গাদ্বী সম্পর্ক। কথা আছে, রাজযোগ করবার সানধ্য যার নাই, সে-ই হঠযোগের অধিকারী। দুটি যোগেরই লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, একেবারে শূন্য হয়ে যাওয়া। হঠযোগীরা বলেন, শ্বাসের সঙ্গে মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। শ্বাস যতক্ষণ চকল থাকবে, ততক্ষণ মনও চকল থাকবে। যদি শ্বাসকে আমরা রুদ্ধ করতে পারি, তাহলে মন নিষ্পন্দ হয়ে যাবে, শরীরও জড়বৎ হয়ে যাবে। এই জড়-সমাধিকেই তাঁরা পুরুষার্ধ বলে ধরে নিলেন। তার জন্য তাঁরা কতকগুলি বাহ্যিক কৌশল অবলম্বন করলেন—আসন বন্ধ মুদ্রা ঘট্টকর্ষের দ্বারা নাড়ীশোধন এবং প্রাণায়াম। বন্ধ এবং মুদ্রার সাধনা করতে গিয়ে দেহের মাঝে কুণ্ডলিনী-শক্তি আবিষ্কৃত হল এবং তাকে অবলম্বন করে হঠযোগের আরেকটা শাখা বেরিয়ে এল—নাড়ীতন্ত্রাপ্রিত ঘট্টচক্রভেদ। কুণ্ডলিনী-যোগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায়ই একে নিজেদের সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে।

যোগের মূল লক্ষ্য লোকোত্তর চেতনায় প্রতিষ্ঠা হলেও সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি সিদ্ধি বা বিভূতিরও আবির্ভাব হয়—কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে, চিৎ এবং শক্তিকে স্বতন্ত্র করণও একাত্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতির ভাটার ধারাকে উত্তান বওয়াতে গেলেই স্বোত্তরণের নিয়মে তার মধ্যে কতকগুলি উর্ধ্বশক্তির বিকাশ ঘটবেই। এইজন্যই আধারের যে-শক্তিকে ভিত্তি করেই আমরা যোগ করি না কেন, তারই মধ্যে কতকগুলি অনৌকিক বিভূতির স্ফুরণ অবশ্যস্বাভাবী। সাধনার শেষে হঠযোগীরও কতকগুলি কায়িক সিদ্ধি আয়ত্ত হয়, যার ফলে দেহ এবং নাড়ীতন্ত্রের উপর তিনি অদ্ভুতভাবে কর্তৃত্ব করতে পারেন।

কিন্তু হঠযোগের প্রধান ক্রটি হল, এর কৃচ্ছ্রসাধ্যতা। দেহ নিয়ে এতখানি কসরত করবার সময় স্নযোগ আর সানধ্য সবার নাই। স্নতরাং একে সর্বজনীন করে তোলবারও কোনও উপায় নাই। তাছাড়া এতে দেহের উপর বেশী ঝোক পড়ায় সাধককে অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্টও করে দেয়। প্রাণসংযম হতে মনঃসংযম এবং তার ফলে তত্ত্বজ্ঞান—হঠযোগের এই যে লক্ষ্য, তা এর চাইতে সহজ ও সুকৃষ্ণ সাধনায়ও সিদ্ধ হতে পারে। স্নতরাং এত কৃচ্ছ্রসাধনা করবারই-বা দরকার কি? তবে দেহ ও নাড়ীতন্ত্রকে শক্ত-সমর্থ করবার জন্য হঠযোগের আবিষ্কৃত-কতকগুলি সহজ কৌশলকে সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে পারলে লাভ আছে—একথাও বলে রাখা ভাল।

হঠযোগের মত রাজযোগেরও লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে স্বরূপে অবস্থান করা। কিন্তু তার জন্য রাজযোগী জোর দেন মনের উপর। মনকে মন দিয়েই বশ করা হল তাঁর লক্ষ্য। রাজযোগের আটটি অঙ্গ আছে। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম আর প্রত্যাহার—এই পাঁচটি হল বহিরঙ্গ, আর ধারণা ধ্যান সন্যাস—এই তিনটি হল অন্তরঙ্গ। হঠযোগের কতকগুলি মূল সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আসন ও প্রাণায়াম এই বহিরঙ্গের মধ্যেই পড়ে। তবে

রাজযোগের আগম প্রাণায়াম হঠযোগের নত অত কৃচ্ছ্রাধ্যায় নয়, আর তার সাধনাও করতে হয় ননোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে। নাড়ীশোধনের জন্য হঠযোগের ষট্কার্ণের অনুরূপ কিছু রাজযোগে নাই। রাজযোগী ভাবনাময় সূক্ষ্ম প্রাণায়ামের দ্বারা নাড়ীকে শুদ্ধ করে নেন। দেহ ও প্রাণ নিয়ে যেটুকু সাধনা, রাজযোগী তাও করেন ননোবিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে। বহিরঙ্গ সাধনের শেষ অঙ্গ যে-প্রত্যাহার, তাই হল রাজযোগের গোড়ার সাধন। প্রত্যাহার হল বাইর থেকে ননের নোড় ভিতরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। অস্ত্র-মুখানতা সব যোগেরই ভিত্তি। অস্ত্রমুখানতার ফলে চিত্ত একাগ্র হয় এবং একাগ্রতার ফলে অবশেষে শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতায় বিষয়ের বা স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এই হল রাজযোগের সাধনরীতির মূল কথা। অগ্নিমুখানতা তন্নয়তা আর শূন্যতা—আগা-গোড়া এটা হল নিবৃত্তি বা নিরোধের পথ। যে-কোনও যোগীকে এই পথ ধরে যে চলতেই হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। নিরোধের চরনে হল পুরুষের অনুভব, রাজযোগী তাকে বলেন কৈবল্য। কিন্তু কৈবল্যের দিকে চলতে গিয়ে নিরোধের চাপে প্রকৃতির মাঝে ঐশ্বর্য বা বিভূতির আবির্ভাব হয়—রাজযোগে তার বিদ্যুত বর্ণনা আছে। তলে রাজযোগী এগুলোকে আনল দেন না। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে নিরোধসমাধির দ্বারা কৈবল্য-লাভ।

রাজযোগের মূল নীতিগুলি যোগের সর্বগত নীতি বটে, কিন্তু ঐ নিরোধ-সমাধির দিকে একান্ত ঝোঁকটাই আবার রাজযোগের একটা বস্তু জটিল। রাজযোগী বলেছেন বটে, সমাধি লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র—চিত্তের যে-কোনও ভূমিতে মানুষের সমাধি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাতেই যে সে যোগী হল তা নয়; কিন্তু অনেক সময় উপায়টাকেই যে মানুষ লক্ষ্য বলে ভুল করে বসে। এ-যোগেও হয়েছে তাই। যোগ বলেই আমরা বুঝি সমাধি, আর সমাধি বলতেই বুঝি নিরোধ-সমাধি। কিন্তু নিরোধ-সমাধি ছাড়াও সমাধি আছে—যেনন গাতোক্ত দ্বিত্বপ্রজ্ঞের সমাধি। স্বরূপে অবস্থান বা ব্রাহ্মীস্থিতি তাতেও হয়, অথচ বৃত্তি-নিরোধের তাতে দরকার হয় না। সেই অস্ত্রমুখানতা একাগ্রতা শূন্যতা এখানেও ফোটে—কিন্তু ফোটে উপরের আবেশে, নীচের ঠেলায় নয়। এইটাই হল সহজের পথ—স্বভাবের ছন্দে ফুল ফোটার নত ফুটে ওঠা। এটা প্রকৃতির বলাৎকার নয়, আপায়ন। সুতরাং একেই সত্যকার রাজযোগ বলা যায়, নইলে প্রচলিত রাজযোগে মানিকটা হঠের ভাব আছে বই কি।

তবে পতঞ্জলি তাঁর অষ্টাঙ্গ-যোগে এই সত্যাবনার দিকেও একটা ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন ক্রিয়াযোগের কথা—যার নামে হল চলতে-ফিরতে যোগ। এইটাই সর্বজনীন যোগের পথ। তার অঙ্গ হল তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রশিধান। তার মধ্যে আবার ঈশ্বর-প্রশিধানই হল মূর্ত্য। পতঞ্জলি বলেছেন, এতেই চিত্তের ত্রিষ্টবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে সমাধি এসে যেতে পারে।

এই ক্রিয়াযোগের সম্বন্ধে ধরেই আমরা যোগের রাজপথে এসে পড়তে পারি, যে-পথে সবার সঙ্গে চলতে কোনও বাধা নাই। এখানে সাধনার ভিত্তি হল ভাব বা আন্তর অনুভব।

আগেই বলেছি আমাদের অন্তঃচেতনার তিনটি বৃত্তি আছে—ভাবনা বেদনা আর সঙ্কল্প। এই তিনটি বৃত্তির অনুশীলনে তিনটি যোগপথ দেখা দিয়েছে—জ্ঞানযোগ ভক্তিয়োগ আর কর্মযোগ। জীবনের সঙ্গে এই তিনটি যোগেরই সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তবে এরা যে-আকার আমাদের মাঝে এখন প্রচলিত, তার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, সে-কথা আগেই বলে রাখি। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে এদের লক্ষ্যে একটা ইহবিশ্ববীণতা। জ্ঞানযোগের সাধ্য যে ব্রহ্ম বা আত্মা, তিনি বিশেষ্যস্তীর্ণ; ভক্তের ভগবানও তা-ই; কর্মযোগী কর্ম করেন কর্মকয়ের জন্য, সৃষ্টির উন্নতিতে নয়। এ-জগৎ নানানয় অভাব হয়—এই নেতিবাদ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তিনটির মধ্যেই অনুসৃত হয়ে আছে। দ্বিতীয় ত্রুটি হল দেহ-প্রাণ-মন বা প্রাকৃতজীবনের প্রতি একটা উপেক্ষা, যা ঐ নেতিবাদেরই ফল। তৃতীয় ত্রুটি হল তিনটি যোগপথের মধ্যে অন্যান্যবিরোধ। জিনের সান্নিধ্যসে যে আধারের সর্বাদ্বীপ পুষ্টি হতে পারে এবং তা-ই যে মানুষের পরম পুরুষাৰ্থ, এ-চেতনা আমাদের মাঝে বড় স্বীণ।

জ্ঞানযোগের পথ হল বুদ্ধির পথ। বিচার আর বিবেক তার সাধন। আগে বিচার, তার পর বিবেক। যার মধ্যে বিচার নাই, সে মূঢ়। প্রবৃত্তির তাড়নায় অবশ হয়ে সে বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ফলে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব আর অশান্তি। যে বিচারশীল, সে নিভেছে সামলতে জানে। প্রের থেকে শ্রেয়কে সে বেছে নেয়। এই হতেই তার বিবেকের শুরু। বিবেক হতে আসে বৈরাগ্য, বিষয়ভোগ তখন আনুনি লাগে। বাইরে ছেড়ে বন তখন ভিতরে চুকে পড়ে। বাইরে মায়া বা প্রকৃতির গুণের খেলা, ওখানে শান্তি নাই। শান্তি গৃহস্থহিত চেতনার নিস্তরঙ্গতায়। তা-ই আত্মা বা ব্রহ্ম বা শূন্য। এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এই মানুষের পরমপুরুষাৰ্থ।

ভক্তিয়োগের পথ হল হৃদয়ের পথ। ভক্তের সাধনা রসের সাধনা। বিচার বিবেক নৈরাগ্য তাঁরও আছে, তিনিও প্রকৃতি বা নারীর বাইরে চলে যেতে চান। কিন্তু তাঁর অপ্রাকৃত-ধাম শুধু নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি নয়। ওটা তার বাইরের আবরণ, ভিতরে আছে রসের হিম্মল। সেখানে আনন্দদোলায় দুলছেন অখিলরসাসুতমুতি পুরুষোত্তম। তাঁকে মানুষের মত করে ভালবাসা যায়। এই ভালবাসাই মানুষের পরম পুরুষাৰ্থ। হৃদয়ে ভালবাসা উঠলে ওঠে বলেই তক্ত জগৎকে মিথ্যা বলেন না, বলেন সেই পুরুষোত্তমেরই আনন্দলীলা।

কর্মযোগকে সাধারণত জ্ঞানযোগ আর ভক্তিয়োগের প্রাথমিক সাধন বলে ধরা হয়। বলা হয়, কর্মই জীবের জন্মের কারণ, কর্ম হতেই জগতের সৃষ্টি, সূত্রাং কর্ম আত্মার একটা বন্ধন; এ-বন্ধন কাটাতে হবে; তাই কর্ম যদি আমাদের করতে হয় তো কর্মকয়ের জন্যই করব। জ্ঞানযোগী সোচ্চারিত নৈকর্ম্য বা কর্মত্যাগের উপদেশ দেন, তক্ত তাকে রূপান্তরিত করেন অর্চায়। গতায় কর্মযোগের একটা তৃতীয় ধারার কথা আছে বটে, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম-চেতনায় তার বিশেষ কোনও ছাপ পড়েনি—লোকোক্তরের দিকেই চিন্তের ঝোঁকটা বরাবর প্রবল রয়েছে বলে।

এই চল প্রচলিত যোগপন্থাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন গমন্যের কথায় আসা যাক।

৫

সমন্বয়

দেখলাম, যোগের প্রত্যেকটি পদ্ধতি মানুষের আধারের একেকটি বৃত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৃত্তিগুলি অবশ্য মানুষের মাঝে আলাপ-আলাপ হয়ে থাকে না, থাকে একসঙ্গে নিলে-নিশেই। সুতরাং একসঙ্গে সমস্ত বৃত্তির যোগিক উৎকর্ষসাধন বা যোগসমন্বয় বস্তুত একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, বরং তা-ই মহাপ্রকৃতির অভিপ্রেত। কিন্তু কি করে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে, সে-ই হল সমস্যা।

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মাঝে চলতি যেসব সাধনপদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন পন্থার ধানিক-ধানিক নিয়ে একটা বিশৃঙ্খল দাঁড় করাবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু বস্তুত সমন্বয় এমন-একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার হতে পারে না। আবার একটার পর একটা পদ্ধতি ধরে ক্রমে-ক্রমে সবগুলিতে সিদ্ধ হওয়ার ফলে একধরনের সমন্বয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেটা সকলের পক্ষে যেমন সাধ্যও নয়, তেমনি তাকে যোগচেতনার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির স্বাভাবিক রীতিও বলা চলে না। যোগশক্তির স্বাভাবিক স্ফূরণের রীতি হল প্রাণের রীতি। প্রাণশক্তি প্রাণকে যখন শিশুতে বিকশিত করে তোলে, তখন সর্বাঙ্গীণভাবেই তা করে। তার মধ্যে যেমন জোড়াতাড়ার ব্যাপার নাই, তেমনি পর্যায়ক্রমে একেকটা অঙ্গকে চরম পুষ্টির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টাও নাই। ক্রম বা পর্বভেদ সেখানেও আছে, কিন্তু তা সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিরই ক্রম।

যোগসমন্বয় এই রীতিতেই হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন যোগ-পন্থার মূলে আছে যোগশক্তির একটা সর্বগত প্রেরণা (urge), যা জীবনকে অথও স্বয়মায় ফুটিয়ে তুলতে চায়। যোগের এই বোল শক্তিটি আমাদের প্রথম আবিষ্কার করা দরকার। জীবনে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ঐক্যেরও এমন-একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, যা থেকে বৈচিত্র্যের স্বয়ম বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রানুগ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে, কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির মধ্যে ছন্দ আনা যায় না। ছন্দ যেখানে নাই, সেখানে সমন্বয়ও নাই। সত্যকার যোগজীবন ছন্দের জীবন, সৌম্যের জীবন। অধ্যায়সাধনায় ছন্দের অভাবটাই সবচাইতে বেশী চোখে পড়ে। সেটা যে প্রকৃতি নয়, বিকৃতি—সেকথা বলাই বাহুল্য।

যোগসমন্বয়ের ধানিকটা আভাস পাই আমরা তাত্ত্বিক যোগপদ্ধতিতে। এতক্ষণ আমরা যতগুলি পদ্ধতির কথা বলেছি, তাদের সবারই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। একমাত্র উদ্দেশ্যই

মুক্তির সঙ্গে ভুক্তিকেও সমানভাবে লক্ষ্যের মর্গদ্বারা দিয়েছে। তন্ত্রের এই স্বীকৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের যেমন একটা লোকোত্তর দিক আছে, তেমনি লোকায়ত দিকও আছে। দুয়ের একটিকে বর্জন করলে জীবনের অত্ৰহানি অবশ্যজ্ঞাবী। সব যোগেরই যোগেশ্বর হলেন পুরুষ; কেবল তন্ত্রেই প্রকৃতিকে বা শক্তিকেও বলা হয়েছে যোগেশ্বরী। তন্ত্রের প্রভাবেই প্রাচীন ভক্তিব্যোগ রূপান্তরিত হয়েছে গোড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে, যার মধ্যে ভক্তন-পদ্ধতিতে পুরুষকে ছাপিয়ে প্রকৃতির প্রাধান্য—যদিও লোকোত্তর স্থিতির দিকেই সেখানে ঝোঁক বেশী। প্রচলিত কর্মযোগেরও যে এইদিকেই ঝোঁক, সে কথা আগেই বলেছি। এই ইহবিশ্ববীনতার বিরুদ্ধে সবলকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে একমাত্র তন্ত্রই। বলতে গেলে তন্ত্রই ভারতবর্ষের গণধর্ম। সাধারণ মানুষ জগৎটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারে না, একে নিয়েই তার অপ্রহরের কারবার। এই পাণ্ডিত্যজীবনকেও একটা মর্গদ্বারা দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনভুক্তি আর অধ্যাত্মজ্ঞান নাথাকে তন্ত্র যে একটা সমন্বয়ের সন্ধান দিতে পেরেছে, এইটাই তার বড় কীর্তি। তবে সমন্বয়ের পথে তন্ত্রও সত্যিকার সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি—কতকটা নিজের অতিচারে, কতকটা নেতিবাচী অভিজ্ঞতা-ধর্মের বিরুদ্ধতায়।

যেমন পুরুষকে মানবো, তেমনি তাঁর শক্তিকেও মানবো। শক্তি আর শক্তিদান অতেন। পুরুষ জড়ে নিগুঢ় থেকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিজেকে চৈতন্যে প্রস্ফুরিত কবে চলেছেন। সবই তিনি; কিন্তু প্রস্ফুরণের কথা উঠছে যখন, তখন বুঝতে হবে তার শক্তির দুটি বিভাগ। একটি অধর (lower), আরেকটি পর (higher)। প্রকৃতির অবনতি থেকে পরভূমিতে উত্তীর্ণ হবার যে সচেতন ক্ষিপ্ত সংবেগ, তা-ই হল যোগের শক্তি। আবার পরভূমিতে উত্তরণের লক্ষ্য অবনতিতে বর্জন নয়, তার রূপান্তর-সাধন। দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে যা পেয়েছি, তার আলো আর ভেজ দিয়ে এই দেহ-প্রাণ-মনকেই জারিত করতে হবে—এই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

উত্তরণ সব যোগেরই সাধ্য। আধারের একেকটি বৃত্তিকে ধরে যোগপন্থা প্রবর্তিত হয়েছে, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে আধারশক্তির স্ফুরণ যখন হয়, তখন তা ভাগে-ভাগে হয় না, হয় সমগ্রভাবেই। এই সামগ্রিক অভঙ্গ (integral) স্ফুরণই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। আধারের কোনও শক্তিকে উপেক্ষা করলে চলবে না, জীবনের কোনও অংশ বাদ দিলে চলবে না, আমার যা-কিছু আছে সবখানি তুলে ধরতে হবে সেই সর্বময়ের পানে। তিনি যেমন সব-কিছুকে ছাপিয়ে থেকেও সব-কিছুকে নিয়েই পূর্ণ, আনাকেও তেমনি পূর্ণ হতে হবে।

অথচ হতে হবে সহজভাবে। প্রাকৃতভূমিতেও দেখি, আনাদের জাগ্রত জীবনই সহজ পূর্ণতার জীবন। বতর্কণ জেগে আছে, ততর্কণই পুরাপুরি বাঁচছি। স্বপ্ন এবং

স্বষ্টিও চেতনার ধর্ম বলে, কিন্তু তবুও তাঁর গত্যাকার গাধকতা জাগ্রতেই। স্বপ্ন আনন্দের নিয়ে যান সূক্ষ্ম, স্বষ্টি নিয়ে যায় কারণে; সেখানে শক্তির উৎস। কিন্তু সেই শক্তিকে জাগ্রতে যদি সঞ্চারিত করতে না পারি, তাহলে শুধু স্বপ্ন আর স্বষ্টির ঘোরে জীবন কাটানোমিলেই কি বলব পুরুষার্থ?

মুদ্রাভাবে বিচার করলে দেখি, জ্ঞানযোগের চরম লক্ষ্য যে-পরিনির্মাণ তা স্বষ্টিধর্মী, আর তজ্জিগোগের তাবোদ্ধাস স্বপ্নধর্মী। কেবল কর্মযোগেরই ভিত্তি হল জাগ্রতের ভূমি। কিন্তু সাধনার প্রচলিত আদর্শে কর্মযোগের স্থান গোণ; শেষপর্গন্ত ভক্তের বাইরে কোনও কর্ম থাকে না, আর জ্ঞানীর অন্তরে-বাইরে সব কর্মই বন্ধ হয়ে যায়। একেই আমরা সাধারণত পরম-পুরুষার্থ বলে মনে করি। কিন্তু জ্ঞানের পরমপ্রশান্তি আর তক্তির তাবোদ্ধাস কি জাগ্রতের কর্মেও সঞ্চারিত করা যায় না? যিনি যোগেশ্বর, তিনি কি স্বষ্টিতে নীল, না শুধু স্বপ্নে বিভোর? এই বিরাট বিস্ময় কি তাঁর জাগ্রতের লীলা নয়? সেই লীলার মাঝে স্বষ্টির আনন্দ আর স্বপ্নের বিজ্ঞান কি অন্তর্গত ও সক্রিয় হয়ে নাই? তাঁর জাগ্রত স্বপ্ন আর স্বষ্টিতে নিশ্চয়ই বিরোধ নাই। তাহলে আনন্দেরই-না তা থাকবে কেন?

প্রাকৃত-জীবন জাগ্রতেরই জীবন। চেতনা সেখানে স্বচ্ছ, বোধ তীক্ষ্ণ, ঐশ্বর্য বিচিত্র। এই স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণতা আর ঐশ্বর্যকে আমরা হারাতে চাই না। কিন্তু প্রাকৃত জাগ্রতের একটা দোষ—সে বহির্মুখ, তাইতে তার চরম উপরভাগা এবং গতানুগতিক। যখন সে অন্তর্মুখ হতে চায়, তখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি ঘুমের মাঝেও সে জেগে থাকতে পারত, তাহলে সেটা হত ধ্যান। ধ্যানে অন্তঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বিজ্ঞান আর আনন্দের সাক্ষাৎ মেলে। ধ্যান বন্ধন ভাঙে, তখন তাদের ঋনিকটা জাগ্রতেও সঞ্চারিত হয়। পুরাপুরি হয় না বলে সাধক আবার ধ্যানের মাঝে ডুবে যেতে চায়। এমনি করে বহিনিরপেক্ষ অন্তর্মুখ জীবনাদেশের সৃষ্টি হয়, যা অন্তরনিরপেক্ষ বহির্মুখ জীবনের বিপরীত। কিন্তু এতে জীবনের অর্থও পরিচয় মেলে না। বাইরের জীবনে যদি অন্তর্জীবনের সবটুকু আলো আর আনন্দ সঞ্চারিত হত, তাবগনাধির উদ্ভাস আর নিরোধসনাধির প্রশান্তি যদি সিন্ধুস্কার (will to create) বীর্ঘ নিয়ে জাগ্রৎসনাধিতে রূপান্তরিত হত, তাহলেই জীবন পূর্ণ হত।

সাধক-জীবনে এই পূর্ণতার অভাব যে আসে না, তা নয়। তাহলে জীবনুজ্জি কথাতার সৃষ্টি হত না। কিন্তু সাধারণত করুণা করা হয়, জীবনুজ্জি নির্বাণুজ্জিরই ফাট; লক্ষ্য আনন্দের নির্বাণুজ্জিই, কিন্তু প্রারম্ভিক অনেক সময় হয় না বলেই জীবনুজ্জি মানতে হয়। ওটা সিদ্ধির পরিশেষ।

কিন্তু এ-করুণা কি আবশ্যিক? জীবনুজ্জিকে শেষে না রেখে কি গোড়ায় আনা যায় না? একেবারে শিশুর নত মুক্ত হয়েই কি জীবনটা শুরু করা যায় না? যায়, যদি শিশু যেমন মাকে জানে, তেমনি করে তাঁকে জানি। কিন্তু মাকে শিশু জানে বুদ্ধি দিয়ে নয়,

বোধ দিয়ে—তার সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁকে তার সর্বস্ব বলে জানে। জানে, তার মুক্তি চেতনা আনন্দ ঐশ্বর্য—সবই ঐ না।

এমনি করে সহজ বোধে-বিরটকে জানা দিয়েই পূর্ণযোগের শুরু। এ যেন এক মুহূর্তেই প্রভাসের সূর্যের কাছে কমলের মত জীবনের সবগুলি দল নোলে ধরা, পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে চাওয়া-পাওয়ার সব প্রশ্নকে ক্লিরে দেওয়া।

সবাই এমন করে পায় না, তা জানি। তাই পূর্ণযোগও সবার জন্য নয়। কিন্তু তবুও বলা চলে, একজনও যদি এ অধিকার পায়, তবে সবাই একদিন তা পাবে না কেন? যোগেশ্বরের নষ্টির তপস্যাও তো সেইজন্যই।

ভরসার কথা এই, যে সত্যের সাধক, তার কাছে সাধনার গোড়াতে সূর্যের নতই এমনি করে তিনি প্রকাশিত হন। অধ্যাত্মজগতের এটা একটা আইন। উপনিষদের ঋষি বললেন, তিনি বিদ্যাতের মত স্বলক দিয়ে আবার নিলিয়ে যান। জানিয়ে দেন, আমি আছি, এই-বার আনয় হুঁজে বার কর। অতীপসার আগুন তখন তিনিই জানিয়ে দেন আধারে। তার তেজে ভিলে-ভিলে সব-কিছু আগুন হয়ে যায়, নৃনয়ী প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় চিন্ময়ীতে।

বৃহত্তের সহজবোধ এবং তাঁরই আদেশে তাঁর কাছে অকূর্ণ আত্মসমর্পণ এই হল তাঁর পূর্ণযোগের প্রথম শর্ত। এ যেন সেই কিশোর নটিকের মত বিনয়ান্ মুড়ান বুকে ঝাঁপ দেওয়া। এ মুক্ত হওয়ার জন্য সাধনা নয়, মুক্ত হয়েই সাধনা করা কুল ফোটার মত।

বস্তুত সাধনা মানুষের করে না, সাধনা করে চলেছেন সেই পরমা-শক্তিই। এই যে দেখে প্রাণে মনে প্রাকৃতশক্তির ক্রিয়া চলছে, এ কি আবার ইচ্ছায়? তবে অপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াটা আবার ইচ্ছায় হবে—এই কথাই-না ভাবি কেন? এটাই অবিন্দ্য। অবিন্দ্য যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমিই সাধনা করি কসরত করি হাঁপিয়ে মরি। হৃদয়ের বাধা ভাঙবার জন্য এটুকুর দরকার আছে। কিন্তু এই হাঁসফাঁস যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধনা হয় না। অবশেষে আমিটা একদিন শান্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি এসে তার জয়গান বলেন। ‘আমি হাল ছাড়লে পরে, ভূমি হাল ধরবে জানি।’ সত্যাকার সাধনা তখনই শুরু হয়—তাঁর শক্তিপাতে।

সে শক্তির ক্রিয়া তখন হয় কোনও বুদ্ধির ছক অনুযায়ী নয়। সূত্রাং যার যেমন প্রকৃতি, তার তেমন যোগ। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি যে-ভূমিতেই থাকি না কেন, সেখানেই এই যোগশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। সূর্য যখন ওঠে, তখন কোনও কলি ভূমিয়ে আছে, কোনওটি-বা একটুখানি মুখ খুলেছে। সূর্যের আলো তো বেছে-বেছে তাদের উপর পড়ে না। তৃতীয় কথা, এই শক্তির কাছে সবসময় জীবনটাই যখন যোগ, তখন জীবনের ভালমন্দ সব-কিছুকেই সে সিক্তির অনুকূলে ব্যবহার করে, তার মধ্যে কোনও বাছবিচার করে না।

পরমা-শক্তির ক্রিয়ার এই রীতি। বুঝে নিতে পারলে চলা সহজ হয়। অনেক সংশয় বেদনা ও অশান্তির হাত হতে বাঁচা যায়।

যেমন অখণ্ড সাধনা, তেমনি অখণ্ড সিদ্ধি। প্রথম সিদ্ধি সন্যাস জ্ঞান। তাঁকে জ্ঞানহিঁ যেমন একরূপে, তেমনি বহুরূপে। যেমন আত্মাতে, তেমনি বিশ্বে। ব্রহ্ম স্বীকৃত আর ভগৎ, লোক আর লোকোত্তর, শূন্য আর পূর্ণ, শিব আর শক্তি কোথাও কোনও তেজ নাই, বিরোধ নাই।

এই জ্ঞান হতেই মুক্তি। শুধু সায়ুজ্যমুক্তিতে তাঁর সঙ্গে একাত্মতারই অনুভব নয়, অপর সাংলোক্যমুক্তিতে সমস্ত সত্তার সচিৎমানন্দভূমিতেই স্থিতি নয়। আসে সাধনামুক্তি—যাতে অপর-প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় পরমা-প্রকৃতিতে, আসে নির্বাণমুক্তি—যাতে অহস্তার পরিনির্বাণে চেতনা উপশান্ত হয় মহাশূন্যে, বিচ্ছুরিত হয় বিশ্ব-জ্যোতিতে।

এই প্রমুক্তির চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভাবনার বেদনায় এবং কর্মেও। তিনে তখন আর বিরোধ থাকে না। অহং দূর হয়ে গিয়ে ভাবনার তখন আমরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাই, আর সেই অবৈতত্বনিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই হৃদয়ে দেখি রসের কোয়ারা উথলে উঠছে, তাঁর প্রেমের নিচির নীলাবিনাস জীবনকে করছে নহনয়, আর নিত্যযুক্ত চেতনায় তাঁরই শক্তির আবেশে ভাগছে অবদান দিব্যকর্মের প্রেরণা, বিশ্বটির উদগার।

এমনি করে সিন্ধুজীবনে ফোটে শুধু মুক্তির আচ্ছন্নাই নয়, ফোটে শুদ্ধস্বের একটা সাক্ষাৎ-সচ্ছতা। যাতে তাঁর আলোকে আমরা আধারের কোথাও এতটুকু আড়াল না রেখে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি, আর সেই আলোর হোঁয়ায় প্রবৃত্ত অন্তরের সত্যধর্মকে অন্য-মানে বিচ্ছুরিত করতে পারি বিশ্বের উপর। তখন ওখানে যা, তা-ই ফোটে এখানে। জগতের সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত বৈচিত্র্যে নিরন্তর হয়ে উপচে পড়ছে তার যে-আনন্দ, সেই আনন্দ আমাদের নাথকেও হিম্মোলিত হয়ে ওঠে। আমরা তখন হই রূপে-রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। সিদ্ধি তখন সহজ হয় জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে বিশ্বচেতনার উচ্ছল উৎসারণে।

এ-সিদ্ধি শুধু জ্ঞানের সিদ্ধিই নয়—এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনেরও রূপান্তরের ফলে সমগ্র আধারশক্তিরই সন্যাস সিদ্ধি। হঠযোগ আর রাজযোগের কৃচ্ছসাধনায় যে একাক্ষীণ পরিণাম, তা-ই এখানে সর্বাঙ্গীণ হয়ে দেখা দিতে পারে মানসোত্তর শক্তির আবেশে।

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বযোগই পূর্ণযোগের আদ্য। সবাইকে নিয়ে তাঁর যে-যোগ, আমাদের ব্যক্তিগত যোগও অনুসরণ করছে সেই ধারাকেই। তাই আরসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-চেতনাও এ-যোগের একটা ভিত্তি। আনতে আনি যেমন গুটিয়ে আছি, তেমনি আবার আনার জগতে ছড়িয়ে পড়ছি—প্রাকৃতজীবনের এই স্বাভাবিক রীতিই পূর্ণযোগে উৎসাহিত হবে। আমার সাধনা আমার একার জন্য নয়—সবার জন্য, অথবা সবার জন্য তাঁর যে-সাধনা তারই অভিব্যক্তি আমার সাধনায়—এই উদার বুদ্ধিই গোড়া হতে এ-যোগের নিয়ামক। ব্যক্তিতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে এখানে কোনও ভাগাভাগি নাই। যা-কিছু ঘটছে তা মুখ্যত ব্যক্তিতে ঘটলেও ঘটছে বিশ্বের জন্য এবং বিশ্বাতীতেরই আবেশে—এই সম্যক দৃষ্টি নিয়েই পূর্ণযোগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

এইগুলি হল গোড়ার কথা। এখন সাধনার কথায় আসা যাক।

পূর্ণযোগের চারটি অঙ্গ—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তির্যোগ এবং সিক্তির্যোগ। এই অঙ্গবিভাগ শুধু বোঝবার সুবিধার জন্য। এর মাঝে পৌরীপর্ষের কথাটা প্রধান নয়। জানতে হবে—যেমন অশ্বও সাধনা, তেমনই অশ্বও সিক্তি। সবস্তু ব্যাপারটা হল সহজের ছন্দে চিন্তন প্রাণের উদয়ন। তার মাঝে ষড়তার কথা ওঠেই না। তবুও ষড়বুদ্ধির সংস্কার আনাদের অভ্যস্ত বলে অশ্বওকে ষড়ও-ষড়ও ভাগ করে দেখানো হচ্ছে, যাতে নুশ্বতে সুবিধা হয়।

পৃথক কর্মযোগ দিয়েই শুরু করা যাক।

[ক্রমঃ]

যেমন সাংঘিক-কর্ম ধর্ম, তেমনই রাজসিক-কর্মও ধর্ম। যেমন জীবের উপর দয়া করা ধর্ম, তেমনই ধর্মবৃক্ষে দেশের শত্রুকে হনন করাও ধর্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ পর্যন্ত জগাজলি দেওয়া ধর্ম, তেমনই ধর্মের সাধন শরীরকে উচিত-ভাবে রক্ষা করাও ধর্ম। রাজনীতিও ধর্ম, কাব্য-রচনাও ধর্ম, চিত্রলিখনও ধর্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্ম। বাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্ম, সেই কর্ম বড় হউক, ছোট হউক।

ঐঅরবিন্দ